কুটুম বাড়ি

কুটুম বাড়ি

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক, ১৩৭২

প্রকাশক :
ফজলে রাব্বি
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা—২

মুদ্রাকর :
আবদুর রশিদ খান
আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
গ্রেটার রোড কাজিরগঞ্জ,
রাজশাহী।

প্রচ্ছদ : আলী মনোয়ার

গল্পক্রম

সোনার আংটি

দাশুকে মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বাসটা যখন গন্তব্যে রওনা দিল বেলেপাড়ার বুকে তখন সন্ধ্যা নামছে। যতদূর নজর চলে শেষ মাঘের ফসল কাটা মাঠের উপর কুয়াশার ঘন আস্তরণ। তারই ভেতর একটু একটু করে সেঁধোচ্ছে সাঁঝের আঁধার।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাশু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল অপসৃয়মান বাসটার গমনপথে এবং এক সময় চোখের আড়াল হতেই আবিষ্কার করে নির্জন প্রান্তরে সে একা। একেবারেই একা। আর তখনই একাকিত্ববোধের ত্রাসে সা-জোয়ান দাশুর বুকেও পায়রা কাঁপন ওঠে। তবে সে বারেকের তরে। গা ঝাড়া দিয়ে জেঁকে আসা ভয়টাকে তাড়াতে চলতি ফিল্মি গানের হিন্দি কলি গুনগুন করে।

এমন ঘটনা দাশুর জীবনে নতুন কিছু নয়। উচিত ভাড়া দিতে পারেনি বলে একরকম ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কন্ডাকটর নামিয়ে দিয়েছে। কাছে পয়সা নেই এমনও নয়, তবে আন্ডারওয়্যারের স্বনির্মিত গোপন পকেটের সঞ্চয়ে হাত দিতে সে নারাজ। দেব, দিচ্ছি করেই সময় কাটাচ্ছিল এবং ভেবেছিল পার পেয়ে যাবে। কিন্তু বিধি বাম। যাক, নামিয়ে দিয়েছে তো দিয়েছে। এখন যদি লোকালয়ে যেতে দীর্ঘপথ হাঁটতেও হয় পরোয়া নেই। তবে আক্ষেপটা এই, তীরে এসে তরী ডুবল। আর কয়েক কিলোমিটার মেরে দিতে পারলেই কামারপুকুর। দাশুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে যেমন ধরমশালা অর্থাৎ পুণ্যার্থীদের জন্য বিনি পয়সায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে কামারপুকুর চটিতেও কোথাও না কোথাও রাত্রের মতো থাকা খাওয়ার নিশ্চিত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এমন ভাবনায় টইটম্বুর ছিল সে। কিন্তু ক্যাচাল বাঁধালো 'শালা ঐ হারামি কন্ডাকটরটা...।' রাগে নিজেকে সামলাতে পারে না দাশু, অজান্তেই মুখ ফসকে গালাগাল বেরিয়ে আসে।

অগত্যা পায়চারি করতে করতে দাশু এদিক ওদিক তাকায়। আশেপাশে লোকালয় আছে কি নেই বোঝা যায় না। থাকলেও অন্ধকার অথবা ঘন গাছগাছালি থাকার জন্য নজরে আসে না। তবে, এখন প্রথম এবং প্রধান কাজ রাত কাটাবার জন্য একটা আস্তানা যোগাড় করা। তারপর বরাতে থাকলে খাবার ঠিকই জুটে যাবে। এই ভেবে অন্ধকারে চোখদুটোকে একটু সইয়ে নিয়ে কয়েক পা এগোতেই ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা সরু পথের চিহ্ন নজরে আসতেই দাশুর বুকে বোধনের বাজনা বাজতে শুরু করে। নিশ্চিন্ত হয়, সে জলে পড়েনি।

সদ্য সন্ধান পাওয়া পথে চলতে চলতে দাশু অনেক দূর থেকে ভেসে আসা শাঁখের আওয়াজ শোনে। শাঁখের শব্দ তাকে উন্মনা করে তোলে। সে কল্পনায় দেখতে পায় গ্রাম্যবধূ গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসিতলায় প্রদীপ দেখাচ্ছে। দৃশ্যটা তার কাছে আরও

প্রকট হয়, এটা তার খুব পরিচিত বলে। এক বছর আগেও সুমিতা—দাশুর বউ শাঁখে ফু দিয়ে ঘরে সন্ধ্যা দেখাত। ভাবতে গিয়ে মনটা বিকল হলেও, মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে মনোবৈকল্য দূর করে সে এগিয়ে চলে। একটু পরেই খুব কাছে না হলেও গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ইতিউতি আলো নজরে আসে। সন্দেহ নেই, সামনে লোকালয়। দাশু আলো লক্ষ্য করে হাঁটে।

কদিন আগেও দাশু অনিকেত ছিল না। বলা যায় বহাল তবিয়তেই ছিল। কিন্তু ঐ যে, 'অতি লোভে গলায় দড়ি।' একটা পেট চালাতে আর এমন কি লাগে। তবুও পয়সার লোভ করতে গিয়ে চাকরিটা খোয়াতে হল। শুধু তাই নয়, আক্ষরিক অর্থেই একেবারে পথে বসতে হল।

অশোকনগরে একটা সাইকেল গ্যারেজের দোকানে কাজ করত দাশু। মালিকের বাড়িতে দুবেলা খাওয়া আর সাইকেলের দোকানে রাত কাটানো। কাজের মধ্যে যারা দূরদূরান্ত থেকে সাইকেলে ট্রেন ধরতে আসত, তাদের সাইকেলগুলি জমা রাখা এবং সন্ধ্যার পর বাবুরা ফিরলে টোকেন মিলিয়ে যার যার সাইকেল বুঝিয়ে দেওয়া।

ভালোই চলছিল। কিন্তু কু-মতলবটা দিয়েছিল চায়ের দোকানের বঙ্কা এবং বখরার লোভে সে লোকও জোগাড় করে দিয়েছিল। সাইকেল রেখে যাবা কলকাতা বা অন্য কোথাও নিত্য অফিস করতে যায় তারা কেউই সাড়ে ছটা-সাতটাব আগে ফেরে না। এই ফাঁকে সাইকেল ভাড়া দিয়ে যদি কিছু উপরি হয় মন্দ কি! মালিক তো আর দেখতে আসছে না। প্রথমে মন সায় না দিলেও বঙ্কার পীড়াপীড়ি আর নগদ পয়সার হাতছানিতে দাশু নিমরাজি হয়। আর তা করতে গিয়েই কাজটাকে খোয়ায়।

বাইরে থেকে এখানে চাকরি করতে আসা চতুর্থ শ্রেণির এক স্কুল-কর্মচারীকে সাইকেল ভাড়া দিয়েছিল। রোজ সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে চারটা। চলছিল কিছুদিন। কপাল মন্দ হলে যা হয়। একদিন, যার সাইকেল ভাড়া দিয়েছিল কোনো কারণে সে দুপুরে ফিরে আসে এবং সাইকেল না পেয়ে তুলকালাম করে। লোক জানাজানি হতেই ব্যবসার ক্ষতি হবে ভেবে মালিক সেইদিনই দাশুকে বরখাস্ত করে। মাসের যে পাওনাটা তাও দাশু সাহস করে চাইতে পারেনি। যে হারে পাবলিক তেতে ছিল পয়সা আনতে গেলে তাকে নির্ঘাত হাসপাতালের দরজা দেখিয়ে দিত। পয়সা না পাওয়ায় দুঃখ হয়েছিল ঠিকই। তবে কি আর কবা! পুবনো কথা মনে পড়তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'যাকগে' বলে দাশু হাঁটার গতি বাড়ায়।

খানিক পরে যেখানে এসে দাশু দাঁড়ায় সেটা একটা হাট। তবে আজ হাটবার নয় বলে জনবিরল। যে-কটি স্থায়ী দোকান রয়েছে তার লোকজন আর সন্ধ্যাব পর নিষ্কর্মা কিছু মানুষ নিজেদের মধ্যে হাসি মশকরায় মেতে উঠেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে একটা দশকর্মা দোকানের সামনে থমকায়। দোকানের মালিক তুলসিমালা গলায় খোল বাজিয়ে আপন মনে নামগান করছে। দাশু দেখেছে সেই কোন ছোটবেলায় বাবা-কাকাবা গ্রামের বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় খোল-করতাল বাজিয়ে নাম গাইত। শুধু বাবা-কাকারা কেন গ্রামের

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই এই চল ছিল। বিলুপ্ত হয়ে আসা সেই রেওয়াজ এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এখনো চালু আছে দেখে সত্যিই অবাক হয় সে। খানিকটা শোনার পর একটা মিষ্টির দোকানের সামনে হুকিং করা বাল্বের আলোয় টুয়েন্টি নাইন খেলতে থাকা দলটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

রাত বাড়ে, চিন্তাও বাড়ে। রাত কাটানোর একটা গতিও সে এখনো পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। মরিয়া দাশু মনে মনে ফন্দি আঁটে। খেলতে থাকা লোকগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছে করেই একজনের অর্ধসমাপ্ত বাক্য লুফে নিয়ে বলে, 'ঠিকই তো বলেছে কাকা, তোমার তখন ইস্কাবনের গোলামটা ধরে রাখা ঠিক হয়নি। তুরুক করার আগেই পাসিং করা দরকার ছিল।'

আচমকা অপরিচিত কণ্ঠস্বরে একযোগে অনেকগুলি চোখ দাশুর উপর হামলে পড়ে। জরিপে আন্দাজ না পেয়ে বয়সে বড়, যাকে সবাই কাকা সম্বোধন করছিল তিনি জিগ্যেস করেন, 'বিদেশী মনে হচ্ছে বটে। কুথা থেকে আসা হচ্ছে হে ছকরা। তুমার নাম কি হে।'

তাচ্ছিল্যে মনে মনে রেগে গেলেও এতগুলি প্রশ্ন একযোগে, স্বরে সন্দেহের আভাস—অচেনা জায়গায় দাশুকে ভিতরে ভিতরে শুইয়ে দিলেও এ সময় বেফাঁস কিছু বলে ফ্যাসাদে পড়লে দুর্গতির সীমা থাকবে না। তাছাড়া এদের খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না। খবরের কাগজে তো হামেশাই লিখছে হয় ডাকাত নয়তো জঙ্গি, ছদ্মবেশে আকছার ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং লোকের সর্বনাশও করছে।

নিজেকে সামলে দৃপ্তস্বরে দাশু বলে, 'কোত্থেকে আবার। আসছি কলকাতা থেকে।'

—কলকাতা! প্রশ্নকর্তা এবং বাকিদের গলা থেকে সমস্বরে বেরিয়ে আসে কথাটা। কুঞ্চিত চোখগুলি বিস্ফারিত। আবারও জিজ্ঞাসা 'কলকাতা। তা বাবু, এখেনে কি উদ্দেশ্যে।'

দাশু আশ্বস্ত হয় ওদের পাল্টে যাওয়া স্বরে। এবং বুঝতে পারে ছকরা থেকে নিমেষে বাবু সম্বোধন, মানে ওষুধ ধরেছে। এবার শুধু হিসেব কষে এগোতে হবে।

গায়ের আলোয়ানটাকে ভাল করে জড়িয়ে নেয়। প্রান্তরের মধ্যিখানে হাট, হাড়ে দাঁত ফোটাতে চায় হিমেল হাওয়া। সময় নিয়ে কেটে কেটে দাশু বলে, 'দ্বারিক ঘোষের নাম শুনেছ? কলকাতার দ্বারিক ঘোষ। যার রসগোল্লা কৌটায় প্যাকিং হয়ে এরোপেলেনে বিলেতে যায়। শুনেছ নাম?'

লোকগুলি নিজেদের মধ্যে অসহায় ভঙ্গিতে তাকায়।

দাশু ফের শুরু করে, 'তা সে দ্বারিক ঘোষ নামকরা ময়রা। এককালে আমাদের আত্মীয় ছিল বটে এখন সে-সব চুকেবুকে গেছে। এখন আমি দোকানের গোমস্তা। ঘোষ মশায়ের ছেলে আমাকে পাঠালো কামারপুকুর থেকে একজন ভাল মতিচুর তৈরির কারিগর নিয়ে যেতে।' এটুকু বলে হাওয়া বুঝতে সে একটু থামে। জমায়েতের মুখগুলির দিকে চোরা দৃষ্টি হেনে প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করে। সময় অতিবাহিত করতে পকেট থেকে বের করে বিড়ি ধরায়, ওদেরও দেয়। বিড়িতে সুখটান দিয়ে প্রস্তাবটিকে লোভনীয় এবং

গ্রহণীয় করতে আবার বলতে শুরু করে, তো 'থাকা-খাওয়া তো আছেই, ভালো মাইনের সঙ্গে মাসে একবার করে বাড়ি আসার যাতায়াতের ভাড়াও দেবে। তা যাচ্ছিলাম, বাসের কন্ডাকটরটা বলল, অতদূর যেতে হবে না, এই হাটেই একজন ভালো কারিগর আছে। তুমি এখানেই নেমে যাও। কি যেন নামটা বলল।' দাশু মাথা চুলকে নাম মনে করার ভান করে।

মেঘ না চাইতেই জল। স্লিপের ফিল্ডারের মতো মিষ্টির দোকান থেকে একরকম ঝাঁপ দিয়ে একটি বছর তিরিশের লোক দাশুর কাছে এসে বলে, 'নামটা কি জগবন্ধু দলুই বলেছে?'

দাশু লোকটিকে ভালো করে দেখে। তার চোখে প্রত্যাশার আলো। ল্যাজে খেলাতে বলে, 'ঐরকমই কি একটা নাম বলেছিল মনে নেই, তবে টাইটেলটা ঠিক মিলে গেছে।'

—কন্ডাকটর ঠিকই বলেছে গো। ও নিশ্চয়-ই জগা হবে। ওর হাতের মতিচূর খুব ভালো। জগবন্ধুর সমর্থনে কয়েকজন এগিয়ে আসে।

কথাবার্তা আর বেশিদূর গড়ায় না। জগবন্ধুই পাঁচ কান করতে বারণ করে। তার খুব ইচ্ছা কলকাতার দোকানের কারিগর হতে। পাছে কেউ বাগড়া দেয় সেই ভয়ে মালিককে বলে সকাল সকাল দাশুকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। ইচ্ছে, রাতে কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে হবে। যদিও দাশু লোক দেখানো 'না না বাড়িতে যাব কেন, যা বলার এখানেই হোক।' কিন্তু জগবন্ধু ছাড়ে না।

কেউ যেন মুসুর ডালে ফোড়ন দিল। আওয়াজের সঙ্গে গন্ধটা বাতাসবাহিত হয়ে নাকে এসে লাগতেই ঘুমিয়ে থাকা খিদেটা এই মুহূর্তে চাগাড় দিয়ে ওঠে। সেই কোন দুপুরে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে ঘুগনি-মুড়ি জলযোগ করেছিল। এতটা সময় পেরিয়ে গেছে। দুটো ভাতের জন্য দাশুর মনটা আঁকুপাঁকু করে।

লুঙ্গি পরিহিত জগবন্ধু দাশুর কাছে এসে বসে। সঙ্গী পাঁচ বছরের ছেলে রতন। এখানেই জল-জায়গা দেওয়া হয়েছে। খেতে খেতে কথা হয়। জগবন্ধুর কবে বিয়ে হয়েছে, কোথায় হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি স্বচ্ছল কিনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয় দাশু।

রাতের জন্য জগবন্ধু তার শোয়ার ঘরখানাকেই ছেড়ে দেয় দাশুকে। তার পক্ষে যতটা সম্ভব অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটি রাখতে চায় না। কলকাতার চাকরিটা তার চাই-ই। অন্তত জাতে ওঠার জন্য! এখানে সে যত ভালো কারিগরই হোক, ঐ যে কথায় আছে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না', তেমনি তার যোগ্য মর্যাদা এ পাড়াগাঁয়ে কেউ দেয় না। সে বউ-বাচ্চা নিয়ে রাতের মতো বিধবা মায়ের ঘরে সেঁধিয়ে যায়।

বিছানায় গা এলিয়েও চোখে ঘুম নেই দাশুর। আজ রাতেই যেমন করে হোক এখান থেকে সটকাতে হবে। নাহলে যদি চালিয়াতি ধরা পড়ে, সকালে গণ-মার একটাও মাটিতে পড়বে না।

মশারির ভেতর থেকে, কমিয়ে রাখা লম্ফর আলোয় দাশু ঘরের এদিক-ওদিক দেখে। মাটির দেয়ালের একদিকের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পট। পাশের আলনায় ব্যবহার্য

জামাকাপড়। দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো জগবন্ধুর একটা নতুন জামা। চটজলদি সিদ্ধান্তে দাশু জগবন্ধুর জামাটা নিজের গায়ে গলিয়ে, লক্ষ্মীর ঝাঁপির সমস্তটাই পকেটে পুরে নিঃশব্দে দরজা খুলে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

হাতে মিষ্টির হাড়ি ঝুলিয়ে দাশু যখন দেউলা বাজারে নেমে একে-তাকে জিগ্যেস করে জগবন্ধুর শ্বশুর বাড়ি এসে পৌছায়, তখন গেরস্থ বাড়ির দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে। দোরগোড়ায় একজন অচেনা লোককে দেখে বাড়ির কর্তা ষাটোর্ধ অবনী সাঁতরা এগিয়ে আসে। তাকে কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়ে দাশু পা ছুঁয়ে প্রণাম করে জিগ্যেস করে, 'কেমন আছেন মেসোমশাই।'

—তমাকে ত চিনতে পারলাম না বাবা।

—আমি দীনু। দীনবন্ধু দলুই। আপনার জামাই জগবন্ধুর জ্যেঠতুতো ভাই। সেই কবে বিয়েতে দেখেছিলেন। সেকি আর মনে আছে। তাছাড়া আমি তো বেশি সময় বম্বেতেই থাকি। ওখানে সোনার দোকানে কাজ করি। এদিকটা আসা হয় না বললেই চলে। তা এবার কটা দিন হাতে নিয়ে এসেছি। জগা বলল, যা না আমার শ্বশুরবাড়িটা ঘুরে আয়। বেড়ানোও হবে, আবার খবরাখবরটাও পাওয়া যাবে। আপনার নাতি রতন সঙ্গে আসার জন্য খুব বায়না ধরেছিল। তো আপনার মেয়ে বলল একেবারে ছোট বোনের বিয়েতেই আসবে।

কথার মাঝখানে বর্ষীয়সী ঘোমটা মাথায় একজন কর্তার পেছনে এসে দাঁড়াতেই অনুমানে বুঝে নিয়ে দাশু তাকেও প্রণাম করে। জগবন্ধুর শাশুড়ি।

—থাক বাবা থাক। এমনিতেই বেঁচে থাক। সুখী হও। যাও ভেতরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম কর। পরে নেয়ে এসে একসঙ্গে খেতে বসবে।

অপরিচয়ের একটা দেওয়াল এতক্ষণ জগবন্ধুর শ্বশুর শাশুড়ির মনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও দাশুর আন্তরিক ব্যবহারে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

জামাই-আদরে দুপুরে খাওয়ার পরিমাণটা বেশি হওয়ায় দিবানিদ্রাটা এমন গাঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, ঘুম ভাঙে জগবন্ধুর ছোট শালী অনিমার ঠেলায়। 'ও মশাই, সন্ধ্যা যে হতে চলল, এবার উঠুন। চা খাবেন তো!'

দাশু উঠে বসে। ঘর গোছাতে গিয়ে আলনায় ঝোলানো জামাটা দেখে অনিমা বলে, 'এটা কি আপনার জামা?'

বুকটা ধরাস করে ওঠে। গত রাতের ঘটনা মনে পড়তেই তীব্র শীতেও কপালে বিন বিন ঘাম জমে। সতর্ক হয়ে দাশু জিগ্যেস করে, 'কেন বল তো?'

—না, জামাইবাবুরও এরকম একটা জামা আছে। আমরা পুজোতে দিয়েছিলাম।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। মনে মনে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ধূর্ত দাশু বলে, 'আসলে আমি আর জগা ছোটবেলা থেকেই জামা পাল্টাপাল্টি করে পরতাম। সেই অভ্যেসটা এখনও রয়ে গেছে। ঠিকই ধরেছ, এটা জগারই জামা।'

—তাই বলুন।

ফাঁড়া কাটল। বেশি ঘাঁটানো ভাল নয়। যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা—জগবন্ধুর শ্বশুরের কাছ থেকে নগদ কিছু ধাপ্পা দেওয়া। হয়ে গেলে কাল ভোরেই কেটে পড়বে। এমনটাই মনে মনে ভাবে দাশু।

রাত বেশি হয়নি। তবে শীতকাল বলে পাড়াগাঁয়ে যেন দশটাতেই রাতদুপুর। খাওয়া দাওয়া সেরে বরাদ্দ চৌকিটাতে শুয়ে দাশু যখন মনে মনে পরবর্তী পরিকল্পনা ছকছিলো ঠিক তখনই যেন শুনতে পায় চাপা কান্নার আওয়াজ। কান্নাটা মনে হল পাশের ঘর থেকেই আসছে। দাশু উৎকর্ণ হয় এবং পরমুহূর্তেই শোনে ধুপধাপ শব্দ। এবার আর চাপা নয়, 'মেরে ফেললো গো' বলে কেউ ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। ততক্ষণে সবাই ঘর থেকে বারান্দায় এসে জড়ো হয়েছে। দাশুও। ঘটনাটা ঘটেছে অবনীবাবুর বড় মেয়ের ঘরে। নেশা করে বউ ঠেঙাচ্ছে গুণধর জামাই। একসময় নেশার ঘোরে টলতে টলতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়।

কুটুমের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা যায় সকলের। দাশু নিজের ঘরে ফিরে এলে পেছন পেছন ঢোকেন জগবন্ধুর শাশুড়ি। তিনি কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, 'তুমি কিছু মনে করনি বাবা, আমার জামাইটাই ঐরকম।'

অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানো অভদ্রতা, তবুও অদম্য জিজ্ঞাসা এবং স্বাভাবিক কৌতূহলে দাশু জানতে চায়, 'মারছিল কেন?'

উত্তর দিতে কিছুটা সময় নেন মহিলা। আঁচলে চোখের কোণ মুছে বলেন, 'কি বলব বাবা। সবই আমার কপাল। ভালো ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দিলাম, আমাদের নিজেদের ছেলে নেই বলে থাকার জায়গাও দিলাম। তখন কি জানতাম অন্য মেয়েব সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা আছে! এখন রাত হলেই সেখেনে চলে যায়। মেয়ে বারণ করলে মারধর করে। সে ত নিজের চখেই দেখলে।'

দাশুর মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, 'আপনারা তবু এই মাতাল চরিত্রহীনটাকে ঠাঁই দিয়েছেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'ও কথা বলনি বাবা, পুরুষ মানুষের চরিত্তির নিয়ে ভাবলে কি চলে? ছেলেরা হল গে সোনার আংটি। বেঁকা হলেও সোনা।'

মাথায় ছাদ ভেঙে পড়লেও দাশু এতটা চমকাতো না, যতটা চমকালো জগবন্ধুর শাশুড়ির কথায়। তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া বাস্তব আর জগবন্ধুর শাশুড়ির লম্পট জামাই সম্বন্ধে উক্তি দাশুকে বোবা করে দেয়। এই মুহূর্তে বাস্তব আর কল্পনার ফারাক ঘুচে গিয়ে যে সত্যটি তার কাছে প্রকট হয়ে ওঠে, তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে সে থই হারিয়ে ফেলে। নতুন করে যেন তার চোখ ফুটতে থাকে। মনে হয় একথা শুধু সর্বংসহা নারীজাতির মুখেই শোভা পায়। যে নারী শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে সহ্য করে শুধু সংসারটাকে টিকিয়ে রাখবে বলে, স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে ঘর করবে বলে।

বেশিদিন নয়, বছরখানেক আগের ঘটনা। তিনজনের সংসারে নতুন বউ সঙ্গী অভাবে কথা বলার লোক পায় না। শাশুড়ি সারাদিন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। স্বামী তার কর্মস্থলে এবং ছুটির পর পাড়ার ক্লাবে যাত্রার রিহার্সাল সেরে ঘরে ফেরে। নিঃসঙ্গতা কাটাতে বউটি কখনও পাড়া বেড়াতে, কখনও পাড়াকেই ঘরে ডেকে এনে কথা বলে। সন্দেহপ্রবণ শাশুড়ির চোখে নতুন বৌয়ের আচরণ ভালো ঠেকে না। বলতে গেলে আটাত্তর বছরের শীতগ্রস্থ মন আঠারো বছরের বসন্ত মনের হদিশ পায় না। অন্যদিকে বউটির স্বামীও তবলার বায়া হয়ে মায়ের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করতে গিয়ে স্ত্রীর উপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতনের মাত্রা বাড়লে বউটি কেঁদে কেঁদে বলে, 'মা যা মনে করে করুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি কোনো দোষ করিনি।'

দাশু বিয়ে করেছিল ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তার যে কর্তব্য থাকতে পারে, দায়বদ্ধতা আছে, সে নিজে মাতৃনির্ভর বলে এ বোধটাই তার ছিল না। ফলে বৌয়ের চোখের জল তার কাছে ন্যাকামি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি এবং মা যা করবে তাই ঠিক ভেবে চুপ করে থাকত।

আজ একবছর বৌটি বাপের বাড়ি কল্যাণীতে স্বামী-ছাড়া হয়ে রয়েছে। বিবেকের দংশনে দাশু ভাবতে বাধ্য হয়, একজন লম্পট চরিত্রহীন পুরুষ যদি সোনার আংটি হয়, তবে শুধু সন্দেহের বশে একজন নারী বিনা দোষে শাস্তি ভোগ করবে কেন? একথা ভাবতে গিয়ে দাশু দিশাহারা হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে এক অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খায়। মনে হয় শরীরের সমস্ত রক্ত যেন একযোগে হৃৎপিণ্ডে ঢুকে পড়তে চাইছে। তার বুকটা উথাল পাথাল করে।

ভোর হতে খুব বাকি নেই। পরিচিত মানুষের চোখ এড়াতে, দু কিলোমিটার উজান ঠেলে দাশু চলে এসেছে বাসস্টপে, কল্যাণী যাবার প্রথম বাসটা ধরবে বলে। বাস আসতে দেরি আছে, কিন্তু আগাম হিসেব করে পুরো ভাড়াটাই বুক পকেটে রাখে দাশু। এবার আর মাঝরাস্তায় নামতে সে রাজি নয়।

সীমানা

ভোরের আবছা আলোয় গণেশ যখন নিজেকে ছাতার আড়ালে রেখে প্রাকৃতিক কাজ সারবে বলে মাঠে গিয়েছিল তখনই চোখে পড়েছিল—খাল টৈ-টম্বুর। গ্রামের শেষ সীমানায় যেখানে খাল আর শ্মশান মিলেমিশে, তার গায়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আট-দশটি পরিবারের মালোপাড়া। গণেশ নিজেকে ভারমুক্ত করার সুযোগ পুরোপুরি পায় না। আকাশ কালো করে ঝড় সঙ্গে নিয়ে জাঁকিয়ে বৃষ্টি নামে। কদিন ধরেই চলছে। এখন আরো বাড়ে। গণেশ জোরে জোরে পা চালিয়ে ঘরে ফেরে।

ঝড়ের ধাক্কায় গণেশের জংধরা টিনের একচালা কঁকিয়ে ওঠে। ভয়ে সংস্কারবশে গণেশের বউ শাঁখে ফুঁ দেয়। শঙ্খের আওয়াজ ছড়িয়ে যেতেই দেখাদেখি পাড়ার বউ-ঝিরাও একই পথ অনুসরণ করে। ঝড়ে কোথাও গাছ ভাঙে, কোথাও বিধ্বস্ত হয় ঘর।

বেশ কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালানোর পর ঝড় থামে। কিন্তু অবিরাম বৃষ্টিতে খাল ছাপিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে জল উঠোনে ঢোকে। একসময় তা ঘরে ঢুকে যখন তক্তপোষ ধরে নাড়া দেয় তখন গণেশ বিপদের গন্ধ পায়। চিন্তিত মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে আরো দূরে ছড়িয়ে দেয়। নজর যতদূর চলে, জল আর জল।

মুক্তো স্বামীর গা ঘেষে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'অখন তাইলে কি করবা?'

কি করবে গণেশ নিজেও জানে না। এমন হবে ধারণাও করেনি। বিব্রত সুরে বলে, 'ঠাকুর ভরসা। দেখি কি করন যায়।'

উপায় খুঁজে বের করার আগেই গণেশ জলভাঙার শব্দ শোনে। তাকিয়ে দেখে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে ভরত, নন্দ, ছিদাম, জগদীশ এবং আরো অনেকে। দলটি গণেশের উঠোনে এসে দাঁড়ায়। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন, গলায় ভয়ের রেশ নিয়ে আড়াই কুড়ির বেশি বয়স পেরনো জগদীশ গণেশের উদ্দেশ্যে বলে, 'আমার তো রকমসকম ভালো ঠেকতাছে নারে গণশা। জল যেই রকম বাড়তাছে তাতে তো ডুবাইয়া মারব মনে হয়। বেলাবেলি কিছু একটা ব্যবস্থা করনের দরকার। আন্ধার হইয়া আসলে তো অসুবিধায় পড়বি। কিছু ঠিক করছস কি করবি!'

উদ্বিগ্ন গণেশ উত্তর দেয়, 'না কাকা কিছু ঠিক করি নাই। আপনে আমাগো গারজেনের মতন। আপনে কি করতে কন।'

—আমি কইকি যে কয়দিন জল না নামে কাছাকাছি কোনো উঁচা জায়গায় গিয়া ঠাঁই লই। সকলেই আছস, যুক্তি কইরা দ্যাখ কি করবি।

ছিদাম জিগ্যেস করে, 'আপনে কই যাইতে কন কাকা।'

—ইঁটখোলায় চল। এই তল্লাটে এত উঁচা জায়গা আর নাই। তোগো মত আছে তো?

হ্যাঁ বা না কিছু বলার আগেই ঘর থেকে মুক্তো চেঁচায়, 'একবার ঘরের মধ্যে আসো গো। বেবাক যে ভাসাইয়া লইয়া যায়।'

বাইরের জলের সঙ্গে তাল রেখে ঘরে জল বেড়ে সিলভারের বাসনকোসন, কাঠের জিনিসপত্র ভাসতে শুরু করে। গণেশের পিসি বিলাপ করে, 'আমার পুঁই মাচাডা যে ভাইস্যা গেল রে, অখন কি হইব।'

বিস্মিত জগদীশ বলে, 'তাই তো কই, হালায় বুড়ি গেল কই?'

নন্দ বাপকে তাড়া দেয়, 'কথা বাড়াইয়া কাম নাই। যা করনের তাড়াতাড়ি করেন।'

জগদীশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। 'গণশা যা যা নেওনের লইয়া রওনা দে। আমরাও আসতাছি। মনে রাখিস ইঁটখোলা।'

বছরের এই সময়টায় ভজন সিং-এর ইঁটখোলায় কাজ বন্ধ থাকে। ঠিকা মজুররা আবার পুজোর পরে এলে উৎপাদন শুরু হবে। ইঁট তৈরির জন্য সঞ্চিত মাটি দীর্ঘদিন জমে জমে প্রায় পাহাড় সমান উঁচু। আপাতত বন্যার হাত থেকে রেহাই পেতে বিকেলের আগেই সবকটি মালো পরিবার এখানে আশ্রয় নেয়। জগদীশ ঘুরে ঘুরে উচ্চৈস্বরে তদারকি করে, 'বিপিন ঠিক আছস তো? ভরত জিনিসপত্র সামলাইয়া রাখ। গণশারে, পোলা-মাইয়াগুলির উপর নজর রাখিস যেন জলে গিয়া না পড়ে।'

বৃষ্টি সমানে চলছে। নিজেদের জন্য ভাবনা নেই, মুশকিল বাচ্চাদের নিয়ে। সকলে মিলে বাঁশ, পলিথিন দিয়ে একটা আচ্ছাদন বানিয়ে নেয়। বেলা ফুরিয়ে এলে সঙ্গে আনা শুকনো খাবার খেয়ে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগে অপেক্ষা করে। চরাচর আঁধার করে রাত নামে।

কোথাও তিন, কোথাও বা চার মাথা এক ছাতার নিচে গাদাগাদি করে বসে রাত কাটায়। নামেই ছাতা—ভারি বৃষ্টিতে জল চুঁইয়ে মাথা ভেজে, ছাঁটে সর্বাঙ্গ। বেশি কষ্ট মায়েদের। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বুকের আড়ালে রেখে উবু হয়ে রাত কাটায়।

ভোরের দিকে বৃষ্টি একটু ধরে এলে, দিনের আলোয় নন্দরা দেখে জল আরো বেড়েছে। অনেক দূরে নিজেদের ঘরের চালগুলিকে দেখলে মনে হয় যেন জলে ডোবা মোষের মতো নাক উঁচিয়ে রয়েছে। কাছাকাছি ইঁট শ্রমিকদের চালাগুলি জলের নিচে। স্রোতে গাছের ভাঙা ডাল, খড়ের চাল, দু একটা মরা কুকুর-বেড়াল ভেসে যায়। সেদিকে তাকিয়ে নন্দ বলে, 'বাবা আমার মনে হইতাছে কোনোখানে নদীর বান্ধন ফান্দন ভাইঙ্গা গ্যাছে, নাইলে তো এমুন হওনের কথা না।'

—হইতে পারে। জগদীশের সংক্ষিপ্ত উত্তর। তার কপালে ভাঁজ। তাদের দিন আনা দিন খাওয়ার জীবন। বৃষ্টিতে কদিন কাজে বেরোতে পারেনি। বন্যার জল যা বেড়েছে শিগগিরই বেরোতে পারবে সে সম্ভাবনাও নেই। না পারলে পেটের জোগাড় হবে না, এই ভাবনা তাকে উতলা করে তোলে। বড় অসুবিধা পানীয় জলের। সঙ্গে যেটুকু আছে টেনেটুনে আর একদিন চলবে। তারপর...

পরিস্থিতি যাই হোক, পেট মানে না। সামাল দিতে দুটো ভাতে ভাত ফোটাতেই হয়। ভাগ্যিস স্টোভটা সঙ্গে এনেছিল। তবে কদিন? দানা তো কারো কাছে আর নেই। জগদীশকে আবার ভাবনায় পেয়ে বসে।

দুপুরের পর আবার ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে। খাওয়ার পর জুত করে বিড়ি ধরাতে গিয়ে ন্যাতানো বিড়ি দেশলাইয়ের সঙ্গে খানিকটা ধস্তাধস্তি করে বিরক্ত বিপিন, 'ভগমানের মতো ম্যাচবাত্তিটাও হালায় দুশমনী করত্যাছে। যা মর গিয়া।' ছুঁড়ে দেওয়া দেশলাই নিঃশব্দে জলে পড়ে। জলে আগের উদ্দাম স্রোত নেই, থম মেরে আছে। আরেকটা কষ্টের দিন শেষ হয়। অন্ধকার রাতে বৃষ্টির ঝমঝম আর ব্যাঙের ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মনের মধ্যে পরিত্রাণের ব্যাকুলতা নিয়ে বিনিদ্র চোখে মানুষগুলি নিঃশব্দে বসে থাকে। জগদীশের পা সুড়সুড় করে। অনুমানে বোঝে পায়ের ওপর কেঁচো। এই হয়েছে এক জ্বালা, কেঁচোর উৎপাত। দিনের বেলা সাপও চোখে পড়েছে। তবে ওরাও বিপন্ন, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। পা ঝাড়া দিয়ে কেঁচোটাকে ফেলে জগদীশ বলে, 'গণশা, ঘুমাইলি নাকি রে।'

—না। সাড়া দেয় গণেশ।

—কি করন যায় ক দেখি। জলে আটকা পইড়া কয়দিন থাকুম। না খাইয়া মরুম নাকি?

নন্দ অল্পবিস্তর বাইরের খোঁজখবর রাখে। গঞ্জে গিয়ে টি ভি, সিনেমাও দেখে। সে বলে, 'বাবা, বন্যা হইলে তো সরকার সাহায্য করে। উদ্ধার কইরা লইয়া যায়।'

খিক খিক হেসে বিপিন বলে, 'ভালো কথা কইছস্। সরকার খবর পাইলে তো আইব।'

চার অক্ষরের খিস্তির ভিয়েনে চুবিয়ে ভরত কথা ছাড়ে, 'এইখানে আসবার জন্য তো... সরকারের ঘুম আসতাছে না।'

সান্ত্বনা দিতে জগদীশ বলে, 'ঐ কথা কইস না। সরকার তো নিজে যায় না, লোক পাঠাইয়া কাম সারে। হয়তো দেখবি কালকাই আমাগো নিতে লোক আসব।'

কান খাড়া রেখে গণেশের পিসি এতক্ষণ শুনছিল। টান টান হয়ে জিগ্যেস করে, 'কখন আসব জগা ভাই?'

—আসলেই দেখতে পাইবা।

নীরবে সময় কাটে। কেউ কথা খুঁজে পায় না। অথচ এখন সময় কাটাতে কথাই একমাত্র অবলম্বন। তাই গলা খাঁকারি দিয়ে জগদীশই আবার শুরু করে। 'বুঝলি নি তরা, একবার গঞ্জে যাওনের দরকার।'

বিপিনের চোখ কপালে, 'সেকি! এত জলে যাইবেন ক্যামনে?'

—সেই ভাবনা তর ভাবতে হইব না। যামু যখন কইছি তো যামুই। না খাইয়া পইচ্যা মরণের আগে একবার চেষ্টা করুম না?'

গোঁয়ার বলে জগদীশের বদনাম আছে। এই বয়সেও সে যা করে কম বয়সেও

অনেকেরই তা করার সাহস থাকে না। এ নিয়ে কেউ আর কথা বাড়ায় না। কথা না বাড়ালেও আপন গতিতে রাত বাড়ে।

সকাল থেকে এক প্রহর বেলা গড়াল, বলতে গেলে কারো পেটে কিছু পড়েনি। বেরোবার সময় ঘর থেকে যে যেটুকু এনেছিল সব শেষ। গণেশের ছ বছরের ছেলেটা ক্ষিদেয় কাঁদে। মার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে। সহ্য করতে না পেরে বিরক্ত মুক্তো ঠাস ঠাস করে ছেলের গালে চড় কষিয়ে বলে, 'পেটে কি রাইক্ষস ঢুকছে অ্যাঁ? সকাল থিক্যা খালি খাওন খাওন বাই।'

গণেশের বুকে মোচড় দেয়। মুক্তোকে বলে, অরে মাইরো না। মাইরা কি করবা! পোলাপান কি আপদ বিপদ বোঝে? আমি কই কি, 'ইট্টু আটা আছে না, সেই দিয়া অরে দুইখান গোলারুটি কইরা দ্যাও।'

ঝামটা দিয়ে মুক্তো বলে, 'ইসটোব কি জল ভইরা জ্বালামু?'

গণেশের পিসির জ্বর। গায়ে দেবার মতো শুকনো কাপড়ও নেই। শুকোবার অবস্থাও নয়। জল নিংড়ে আবার তা গায়ে দিয়েই বুড়ি বসে বসে কাতরায়।

হঠাৎ যান্ত্রিক শব্দে সচকিত হয়ে সকলে আকাশের দিকে তাকায়। নন্দ বলে, 'বাবা, হেলিপ্টার। কোঁনো মন্ত্রিটন্ত্রি বান দেখতে আইছে মনে হয়।'

অসহিষ্ণু ছিদাম বলে, 'হ আমাগো কিতাত্থ করছে। দেখিস কাইল খবরের কাগজে বক্তিমে দিয়া বানের জলের ছবি বাইর করব।'

—হালাগো কামই তো ঐ। বিপিনের নিস্পৃহ গলা।

সব দেখে, সব শোনে। তবু জগদীশ নিশ্চুপ। দেখলেই বোঝা যায় গভীর কিছু ভাবছে। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে বলে, 'গণশা, হাত দাওটা লইয়া আমার সঙ্গে আয় তো।'

পেটের আগুন মানুষকে কখনও অমানুষ, কখনও অতি মানুষ করে তোলে। সে তখন দুমুঠো ভাতের জন্য সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত কাজ করতেই এগিয়ে যায়, কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। জগদীশও গামছা দিয়ে কোমরে দা বেঁধে গণেশকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দেয়। গোটা তিনেক কলাগাছ কেটে এনে তা দিয়ে ভেলা বানায়। জলের কলসি, কেরোসিনের জার, সকলের থেকে কিছু কিছু পয়সা নিয়ে দুজনে গঞ্জের উদ্দেশ্যে ভেলা ভাসায়।

ঘণ্টা দুই ভেলা বেয়ে যখন গঞ্জে পৌছয়, দুপুর হব হব করছে। রাস্তার ধারে বাঁশ পুঁতে ভেলা আটকে জগদীশ বলে, 'চল'।

গণেশের গলায় সন্দেহ, 'দুইজনে একসঙ্গে গেলে মান্দাস চুরি হইয়া যায় যদি। তার চে আপনে যান, আমি থাকি।'

কথাটা জগদীশের মাথায় খেলেনি। যুক্তিটা ফেলতে পারে না। বলে, 'থাকবি? তাইলে থাক।'

হাঁটতে হাঁটতে জগদীশ লোকমুখে অনেক খবর পায়। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে নদীর বাঁধ ভেঙে আশেপাশের অনেকগুলি গ্রাম এখন জলের তলায়। বানভাসি মানুষগুলো বিভিন্ন

স্কুলবাড়ি, বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিসে আশ্রয় পেয়েছে। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা লঙ্গরখানা খুলে বন্যার্তদের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে। সরকারি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে পঞ্চায়েত অফিসে।

খুঁজে খুঁজে জগদীশ পঞ্চায়েত অফিসে এসে হাজির হয়। সেখানে লোক গিজ গিজ করছে। যে ঘর থেকে চিড়ে গুড় দিচ্ছে, তার সামনে দু-তিনটে লম্বা লাইন। রাসবিহারী ফাঁক বুঝে পছন্দের লাইনে দাঁড়ায়। লাইন এগোয় শামুকের গতিতে। অপেক্ষারত মানুষগুলি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে ওঠে। ঠেলাঠেলি করে সবাই আগে যেতে চায়, না পেরে গায়ের ঝাল মেটায় ব্যবস্থাপকদের গালিগালাজ করে। স্বেচ্ছাসেবকরা লাইন সোজা রাখতে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এলোপাথাড়ি লাঠি চালায়।

গলদঘর্ম জগদীশ এক সময় ইপ্সিত বস্তুর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। চিড়ে-গুড়ের সুবাস নাকের ভেতর দিয়ে পাকস্থলীতে যেতেই খিদে চাগিয়ে ওঠে। যে ছেলেটি ঐসব জিনিস দিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে বলে, 'কুপন দাও।'

থতমত খেয়ে জগদীশ বলে, 'আইজ্ঞা, কুপন কি?'

যারপরনাই বিরক্ত ছেলেটি বলে, 'মাকড়া একটা। কুপন না দেখালে কি তোমার মুখ দেখে রিলিফের মাল দেব। সর, সর। পাশের ঘর থেকে নাম লিখিয়ে কুপন নিয়ে এসো।'

তাড়া খেয়ে জগদীশ পাশের ঘরে ছোটে। উড়নচণ্ডী চেহারার তিন যুবক জ্বলন্ত সিগারেট হাতে বসে। ছোট ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। জগদীশের দম আটকে আসে। কোনো মতে উচ্চারণ করে, 'বাবুরা আমারে একটা কুপন দ্যান দেখি।'

খোলা খাতা সামনে নিয়ে বসে থাকা ছেলেটি ডাকে, 'এদিকে এসো। নাম-ঠিকানা বল।'

—আইজ্ঞা, আমার নাম জগদীশ দাস, হরিপুরের মালোপাড়ায় ঘর। প্রাপ্তির আশায় জগদীশ গড়গড়িয়ে বলে।

পলকে হাতের কলম থেমে যায়। চোখ ছোট করে ছেলেটি জগদীশের দিকে তাকায়। অপেক্ষাকৃত ভারি গলায় বলে, 'আজ আর কুপন দেওয়া হবে না, কাল এসো।'

প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে থাকা যাত্রীবাহী কোনো যান হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হলে ঝাঁকুনিতে যাত্রীদের যেমন ঠোকাঠুকি লাগে, জগদীশের মনের মধ্যেও দুরন্ত গতিতে ছুটতে থাকা ইচ্ছে, খুশি, আশা-আকাঙ্খারাও মাথা ঠোকাঠুকি করে মরে। কালো মুখে কাতর স্বরে বলে, 'এই তো আপনেই নাম-ঠিকানা জিগাইয়া লেখতে আরম্ভ করতাছিলেন। অখন কন আইজ কুপন দিবেন না। অনেক দূর থিকা আইছি বাবু। আমার কি দোষ হইল কন দেখি।'

—সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে নাকি? বললাম তো আজ আর কুপন দেয়া হবে না।

তীরে এসে তরী ডুবছে ভাবতেই জগদীশের ভেতরের গোঁয়ার মানুষটা বেরিয়ে

পড়ে। সেও পাল্টা গলা চড়িয়ে বলে, 'দেওয়া হইব না মানে? আপনে কি নিজের ঘর থিকা দিতাছেন? সরকারের মাল, আপনেরে দিতে বলছে—আপনে তার হুকুম তামিল করবেন।'

ছেলেগুলির মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। দ্রুত দুজন উঠে এসে 'বেরো শালা' বলে ঠেলতে ঠেলতে জগদীশকে দরজার দিকে নিয়ে যায়।

চেঁচামেচিতে ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়েসী একজন পাশের ঘর থেকে উঠে এসে ছেলেগুলির উদ্দেশ্যে বলেন, 'হচ্ছেটা কি জয়ন্ত।'

—স্যার, এই লোকটা মালোপাড়ায় থাকে। রিলিফের জন্য জবরদস্তি করছে।

—ওর ন্যায্য পাওনাটুকু দিয়ে বিদেয় কর।

—কি করে দেব স্যার?

—কি করে দেবে মানে? ধুতি-পাঞ্জাবির প্রশ্ন।

—না, মানে ইয়ে। বিব্রত বোধ করে ছেলেটি।

ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। ছেলেটি কিছু একটা বলি বলি করেও জগদীশের সামনে মুখ খুলতে চায় না। শেষে স্যারের ধমকানিতে বলেই ফেলে, 'স্যার, মালোপাড়ার লোকগুলো আমাদের দলের সাপোর্টার নয়।'

স্যারের ভুরুতে ভাঁজ। 'আমার কাজ আছে, তুমি দেখ জয়ন্ত' বলে সরে পড়েন।

ছেলেটির কথায় জগদীশের জ্ঞানচক্ষু ফোটে। মিথ্যে আশায় বুক বেঁধে রয়েছে বলে নিজেকে ছি ছিক্কার করে। বোঝে এখানে সময় নষ্ট করে লাভ হবে না। তবুও ইচ্ছে হয় গলা ফাটিয়ে সবাইকে জানান দেয়, 'এরা ফেরেব্বাজ, এরা শয়তান, এরা খুনী।' কিন্তু একা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তা ছাড়া উল্টে বিপত্তিও হতে পারে ভেবে কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে আসে। পাশে বিধ্বস্ত সাহায্য প্রার্থীটি জিগ্যেস করে, 'এম. এল. এ. সাহেবের সঙ্গে আপনার কি কথা হইল। দূর থিকা মনে হইল উনি আপনার সঙ্গে কথা কইতাছিল।'

—কিছু না। রাসবিহারী দ্রুত পাশ কাটায়। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে মনে হয় ভেতরের কান্না যেন সব গলায় জড় হয়েছে।

বিপদের দিনে দোকানীরাও সাপের পাঁচ পা দেখে। আড়াইগুণ বেশি দামে জিনিষ কিনে গণেশকে সঙ্গে করে জগদীশ বিকেলেই ইটখোলায় ফিরে আসে।

বলতে গেলে কদিন রাত জাগা, তার ওপর প্রায় সারাদিন উপোসের পর পেটে দানা পড়তেই ক্লান্ত মানুষগুলোর চোখ জড়িয়ে আসে। যে যেমনভাবে পারে একটু গড়িয়ে নেয়। বেলা ভাটির দিকে। মেঘের আড়ালে সূর্য দেখা না গেলেও, সন্ধ্যের বাকি নেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। হঠাৎ জলে ছপ ছপ শব্দ হতেই জগদীশ উঠে বসে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। চোখ কচলে আবার তাকায়। না ঠিক দেখছে, ডিঙির ওপর বসে রয়েছে মনিরুদ্দি আর রামিজ। ছেলেবেলার পূর্ব পাকিস্তানের খেলার সাথী, এখন বাংলাদেশের বাসিন্দা। হঠাৎ কেন সীমানা ডিঙিয়ে হাজির বুঝতে না পেরে সবাইকে ডেকে তোলে।

গণেশ, নন্দ, ভরত, বিপিন, ছিদাম সকলেই জড়ো হয়। আন্দাজে বুঝতে চায় আগন্তুকদের মতিগতি। পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। হাতের নাগালে সকলেই হাতিয়ার আড়াল করে রাখে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে গলা খাঁকারি দিয়ে মনিরুদ্দিই শুরু করে, 'ভালো আছো নি, জগদীশ ভাই?'

অন্য তরফ নিরুত্তর।

না দমে মনিরুদ্দি বলে, 'কয়দিন ধইরা তোমাগো দেখতাছি। এইখান দিয়াই তো যাই আসি। কে কোনখানে আমাগো মানুষ পানিতে আটকা পইড়া আছে তালাশ করি। পাইলে লইয়া গিয়া নিরাপদ জায়গায় রাখতাছি। আমাগো মাদ্রাসার দোতলা থিকাও তোমাগো দেখা যায়। মৌলভী সাহেব কইলেন, যা তো মনি ব্যাপারখান কি দেইখা আয়। মনে তো লয় খুব বিপাকে পড়ছে। পোলাপানগুলির জন্য কিছু চিড়ামুড়ি লইয়া যা। আর ওনারা যদি আসবার চায়, তয় নাও লইয়া গিয়া তুইল্যা আনবি।' একটু থেমে আবার বলে, 'গোস্তাকি মাফ করবা,' মন চায় তাই একটা কথা জিগাই, সায্যটায্য কিছু পাইছ? এই কয়দিনে বাইরের কোনো প্রাণীরেই তো এখানে আসতে দেখি নাই।'

মৃদু সুরে জগদীশ বলে, 'না, অখনও পাই নাই।'

আক্ষেপসূচক একটা শব্দ উচ্চারণ করে মনিরুদ্দি বলে, 'নেও এই পোটলাটা ধর।' ডিঙি থেকেই চিড়ে মুড়ির পুটলিটা জগদীশের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়।

নিমেষে পুটলিটা লুফে নিয়ে ছোটরা কাড়াকাড়ি করে খেতে শুরু করে। সেদিকে চোখ রেখে মনিরুদ্দি আবেদনের ভঙ্গিতে বলে, 'জগদীশ ভাই, এই কষ্ট ভোগ না কইরা পোলাপানগুলিরে লইয়া আমাগো কাছে চল।'

জগদীশ ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায়। ছোট বেলায় একসঙ্গে কাটালেও দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে একটা ব্যবধান তৈরি হয়েই গিয়েছিল। তাছাড়া দু-দেশের নাগরিক এবং দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়াতে মনিরুদ্দি এমন প্রস্তাব দেবে সে ভাবতেও পারে না, বিশ্বাস করতেও মন চায় না। ফলে ধাতস্থ হতে সময় নেয়। মনিরুদ্দিকে এড়াতে বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হইয়া গেছে যে, সীমানা ডিঙাইয়া আমরা যামু। আইনে আটকামু না? তোমরা এক দ্যাশের, আমরা আরেক দ্যাশের। তাইলে কি কইর‍্যা যামু।'

শব্দ করে হেসে ওঠে রামিজ। হাসতে হাসতেই বলে, 'হাচা কথাই কইছ জগদীশ ভাই। আমরা দুই দ্যাশেরই মানুষ। তয়, আগে দ্যাশটা তো এককই আছিল, নাকি? যারা খণ্ড করনের তারা করছে। আর সীমানার কথা কও? অখন সীমানা কই? বেবাক তো পানির তলায়। জিগাই, সীমানা আগে না জান আগে? আগে জানে বাঁচো, পরে সীমানার কথা ভাইবো। পুরানা কথা ভাইব্যা মন খারাপ করনের কাম নাই। অখন কও দেখি, আমাগো কাছে যাইবা কিনা।'

তেতে ওঠে জগদীশ, 'থাউক থাউক, ভাইবা আমার কাম নাই। আমরা যামু না। তোমরা অখন আসতে পারো। তোমাগো মতলব বুঝতে আমার বাকি নাই।'

জগদীশের কথা শেষ হতে না হতেই প্রতিবাদ করে মনিরুদ্দি, 'আল্লার কিরা জগদীশ ভাই। আমরা কোনো মতলব লইয়া আসি নাই। যাওন না যাওন তোমাগো মর্জি, কিন্তু ইমান ধইর‍্যা টান মাইরো না।' পরক্ষণেই গলা নামিয়ে বলে, 'বুঝতে পারতাছি, যে বিপাকে পড়ছ অখন তোমার মাথার ঠিক নাই। ঠাণ্ডা মাথায় সকলের সঙ্গে শলা কইরা দেখ। আমরা আবার পরে আসুম।'

ওরা ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে দিতেই জগদীশ চেঁচিয়ে বলে, 'যতই কও, সীমানা ডিঙাইয়া আমরা যামু না, যামু না।' জগদীশের চিৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে দিগন্ত বিস্তৃত জলের ওপর নিষ্ফল আক্রোশে ছুটে বেড়ায়।

মনে করতে না চাইলেও জগদীশের ছেলেবেলার কথা এই মুহূর্তে আরো বেশি করে মনে পড়ে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে চাটাই বিছিয়ে রামিজ, মনিরুদ্দি এবং জগদীশরা এক সাথে লেখাপড়া করেছে। স্কুল ছুটির পর দল বেঁধে চলে যেত মনিরুদ্দিদের প্রাচীন তেঁতুল গাছটার তলায়— দোলনা চড়ার লোভে। ওরাও চলে আসত চণ্ডীমণ্ডপে যাত্রা দেখার আশায়। এখনও সব চোখে ভাসে। তখন সবকিছু বোঝার বয়স নয়, তবুও একদিন বড়দের মুখে শুনল দেশটা ভাগ হয়ে গেল—পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান। একদিন সীমানা বরাবর কাঁটাতারের বেড়াও পড়ল। তবুও ছোটরা যাতায়াত করত, কেউ কিছু বলত না। কিন্তু গোল পাকাল মনিরুদ্দির বাপ-চাচারা। গরুগুলি হিন্দুস্তান-পাকিস্তান বোঝে না। চরতে চরতে এপারের গরু ওপারে গেলে আর ফেরত আসে না। বড়দের মধ্যে এ নিয়ে লাঠালাঠি হত। একবার অবস্থা এমন চরমে উঠল যে, দু তরফের পুলিশ গোলাগুলি চালাল। শেষে বড় অফিসাররা এসে হাসপাতালের মাঠে বসে আলোচনা, সইসাবুদ দিয়ে সামাল দেয়। সেই থেকে দু দেশের সরকার সীমানা থেকে লোকালয় দূরে সরিয়ে নেয়। যাতায়াত তখন থেকেই বন্ধ। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। তারপর তো পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হল, তবুও না। এতদিন পর মনিরুদ্দিরা হাত বাড়ালেও জগদীশ তা সহজভাবে নিতে পারে না।

ভাবনায় ভাবনায় কখন রাত নেমেছে জগদীশ বুঝতে পারেনি। বৃষ্টি গায়ে পড়তেই সম্বিৎ ফেরে। আকাশের দিকে মুখ করে গাল পাড়ে, 'হালা পুঙ্গির পুত মেঘের কাণ্ড দেখ। মাইয়া মাইনষের মতো কেমুন ছিনালী করতাছে। কখন যে হালায় ঢালব দিশা করন যায় না।'

জ্বর গায়ে ধুঁকতে ধুঁকতে গণেশের পিসি বলে, 'জগদীশ ভাই, অগো কথায় রাজি হইয়া গেলেই পারতা। এত ছিদ্দত আর সয্য হয় না।'

জগদীশ খেঁকিয়ে ওঠে, 'তোমার যাইতে হয় যাও, আমারে জ্বালাইও না।'

আকাশ ভেঙে অঝোরে জল ঝরে। ছাতার নিচে ঘন হয়ে বসে মুক্তো নিচু গলায় গণেশকে বলে, 'বুইড়া ঐ রকম করে ক্যান? পিসি তো মন্দ কিছু কয় নাই। ওনার ইচ্ছা না হইলে যাইব না, অন্যেরে আটকায় ক্যান?'

—চুপ কর। জগদীশকাকা শুনতে পাইব। গণেশের চাপা সুর।

—শুনলে শুনব, অল্যায্য তো কই নাই।

নন্দর বউ আট মাসের বাচ্চার কাঁথা পাল্টে নন্দকে শিখণ্ডী করে, শ্বশুর যেন শুনতে পায় এমন গলায় বলে, 'তোমার বাপে তার গোঁসা লইয়া বইস্যা থাকুক। অরা নিতে আইলে আমি পোলা লইয়া চইলা যামু। তোমাগো কথা শুইনা আমি ধনেরে মাইরা ফালাইতে পারুম না।'

দুপুরে গঞ্জে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি জগদীশের চোখে ভাসে। স্বাধীন দেশের নাগরিক যেখানে পক্ষপাত দোষে নিজ দেশে বঞ্চিত সেখানে স্বজনরা বিরুদ্ধে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? মানুষ তো এখন সবখানেই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি নিয়ে বাঁচতে চায়। পোড়খাওয়া জগদীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক আর বুক কাঁপানো মেঘের ডাক অগ্রাহ্য করে ভোর হতে না হতেই একখানা বড় নৌকো নিয়ে মনিরুদ্দিরা হাজির। গণেশ বাদে সকলেই একে একে নৌকোয় ওঠে। স্থির দাঁড়িয়ে দেখে জগদীশ। বুকটা যেন কেমন খালি খালি মনে হয়। নজর ঘুরিয়ে গণেশের ওপর খেঁকিয়ে ওঠে, 'তুই আর পুতলার মতো খাঁড়াইয়া আছস ক্যান? তুইও যা।' বলতে গিয়ে গলাটা ভার হয়ে আসে।

রামিজ সারাক্ষণই জগদীশের ওপর লক্ষ্য রাখছিল। নৌকা ছাড়ার আগে এবার হেঁকে বলে, 'জগদীশ ভাই, তুমি...?'

রামিজের গতকালের বলা কথাগুলি বানের জলের মতো জগদীশের মনের অলিতে গলিতে ঢুকে ঢেউ তোলে। সে ভারী বর্ষণের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চারিয়ে দেয়। কিছু একটা দেখার চেষ্টাও করে। কিন্তু বৃষ্টির ঘনত্বে আবছা একটা পর্দা ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। আবারও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে। কিছুই দেখা যায় না। ইশারায় রামিজকে ডেকে গলা পাল্টে কেটে কেটে জিগ্যেস করে, 'তাইলে তুমি কইতাছ সীমানা অখন জলের তলায়?'

রামিজ মাথা নাড়ে।

উত্তরণ

হাসপাতালের আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন খুঁজেও যখন সহদেবের পাত্তা পাওয়া গেল না তখন কৌশল্যা শেষ চেষ্টা হিসেবে নন্দরানীর ঠেকের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। সে জানে, সহদেবের হাতে যখন বাড়তি দু পয়সা আমদানি হয়, তখন দেশি মদ গিলতে সে এখানেই আসে। মদের সাথে, উপরি পাওনা গতরওয়ালী নন্দরানীর তির্যক হাসি, সচেতনভাবে শরীরী ছোঁয়া। এমনকী উপযুক্ত রেস্ত দিলে তার ডেরায় রাত কাটানোও যায়।

থিকথিকে কাদায় ঘোঁত ঘোঁত শব্দে একটা মাদী শুয়োর একপাল বাচ্চা নিয়ে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তারই উল্টোদিকে অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু জমিতে নন্দরানীর ঠেক। ইঁটের ওপর রেলের স্লিপার সাজিয়ে বসার বেঞ্চ। মাথার ওপর পলিথিনের শিট। যতক্ষণ হুঁশ থাকে ততক্ষণ খদ্দেররা বেঞ্চিতে, বেসামাল হলেই কাদায় চরতে থাকা প্রাণীগুলির সঙ্গে তফাত ঘুচে যায়।

একরকম গায়ে গায়ে চরতে থাকা মুরগির বাচ্চাগুলিকে হাত দিয়ে তাড়িয়ে সহদেবের বাড়ানো গ্লাসে মদ ঢালতে গেলে নেশাতুর সহদেব নন্দরানীর হাত ধরে টানে। টাল সামলাতে না পেরে সাকী এবং পানীয় দুইই বুকের ওপর এসে পড়ে। সঙ্গীরা মজা পায়। নন্দরানীর মুখে শুরু হয় কাচা খিস্তির লহরা।

আসর যখন গুলজার, ঠিক তখনি কোমরে হাত রেখে কৌশল্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। তার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে সহদেব থতমত খেলেও ভড়কায় না। পরকীয়া প্রেমের মাঝে স্ত্রীর আবির্ভাব সহদেবের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভাবনার যেটা, ঘোরতর কিছু না ঘটলে কৌশল্যা এ পথ মাড়ায় না। এই সাতসকালে কৌশল্যার আগমন সত্যি সত্যিই তাকে একটু চিন্তায় ফেলে। সে স্খলিত স্বরে বলে, 'তুই ইখেনে ক্যানে?'

কৌশল্যা জন্মসূত্রে বিহারী। কিন্তু তিন পুরুষ কেটে গেছে বাংলায়। চলনে বলনে বাঙালিয়ানা। তবে পরিবারের নিজেদের মধ্যে যখন কথা হয় তখন মাতৃভাষায়। পুরুষানুক্রমে হাসপাতালের সাফাই কর্মী! সেই সূত্রে হাসপাতালের সর্বত্র যাতায়াত। সহদেব বাঙালি, সেও হাসপাতালের চতুর্থশ্রেণীর কর্মী, মর্যাদায় কৌশল্যাদের সমগোত্রের। তবে কাজের থেকে সহদেবের অকাজেই মন বেশি এবং তার জন্য যত হ্যাপা সামলাতে হয় কৌশল্যাকেই। আজও সেরকম ঘটনা ঘটেছে সহদেবকে কেন্দ্র করে এবং তারই জ্বালা গায়ে মেখে স্বামীকে খুঁজতে সে এখানে। সঙ্গত কারণেই সহদেবের কথার জবাবে সে তিরিক্ষি মেজাজে বলে, 'এসেছি তোর ছেরাদ্দ করতে।'

জীয়ন্তে শ্রাদ্ধ কার ভালো লাগে? উপরন্তু মৌজের যখন সবে সন্ধে সেখানেই বাগড়া

দিতে এসেছে নিজের বউ। অন্য কেউ হলে হয়তো এতটা গায়ে মাখতো না, কিন্তু এখন অসহ্য মনে হয়। নন্দরানীর সামনে শাসানি ইজ্জতে বাঁধে। এর একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন মনে করে যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে সেভাবে সহদেব বলে, 'এত সকালে ঝুটমুট কি ঝামেলা পাকাতে এসেছিস?'

কৌশল্যার গলা সপ্তমে— 'ঝামেলা আমি পাকাচ্ছি না তুই? দুদিন আগে কুচবিহারের পার্টিকে বেড দিবি বলে তাদের কাছে টাকা নিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিস। তোর পাত্তা না পেয়ে ওরা হাসপাতালে হাঙ্গামা করছে। বহোত আদমি লিয়ে এসেছে। সবাই জেনে গেছে। যা এখন গিয়ে সামাল দে। কুত্তার বাচ্চা, তোর শরম লাগে না ধান্দাবাজি করে লোকের থিকে টাকা লিতে।'

কথা সত্য—দুটোই। টাকাও নিয়েছে, বেডও পাইয়ে দেবে বলেছে। কিন্তু এতে দোষেরই বা কি হল, আর শরমের কথাইবা আসছে কোথা থেকে? কৌশল্যার কাছে যেটা ধান্দাবাজি সহদেবের কাছে তা বুদ্ধির খেল। আর ধান্দাগিরি করে কোন শালা টাকা রোজগার না করে? হাসপাতালের অলিতে গলিতে ধান্দাগিরি! ওষুধে ধান্দাবাজি। রোগীদের জন্য বরাদ্দ খাবারে ধান্দাবাজি। যে ব্যাটা হাসপাতালের হেঁসেলে আনাজ, মাছ-মাংস সাপ্লাই দেয় তার সঙ্গে রাঁধুনী বামুনের সাঁট— বড় ধান্দাবাজি। দুধে, তাও ধান্দাবাজি। আরো আছে, সবই সহদেবের নখদর্পণে। সবাই সবারটা জানে—কারুরই বলার মতো মুখ নেই। তারপরও যদি ওপরতলার কেউ ঘাঁটাতে আসে তবে তো কাম কাজ সব বন্ধ করে দিয়ে নিচুতলার কর্মীরা হাসপাতালই অচল করে দেয়। তখন তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। অতএব কৌশল্যার ভর্ৎসনা সহদেবকে লজ্জায় ফেলবে কি বরং তার হাসির উদ্রেক করে। ওসব কিছু না। এত বড় অনিয়মের পৃথিবীতে সহদেবের কৃতকর্ম সিন্ধুতে বিন্দু। কাজেই যেমন চলছে চলবে। কিন্তু কৌশল্যার এ ব্যাপারে এত সতীপনার কারণ কি সেটাই তার সহজ বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছে না। তবে হ্যাঁ, বেডটা পেতে একটু দেরি হচ্ছে এই যা। কিন্তু পাবে ঠিকই। আর সত্যি বলতে দেরির জন্য সহদেব নিজেও দায়ি নয়।

...নং ওয়ার্ডের সাঁইত্রিশ নম্বর বেডের ওপর ভরসা করেই পার্টিকে কথা দিয়েছিল সহদেব। ডায়মন্ডহারবার থেকে আসা অশিতিপর বৃদ্ধ হাঁপানির এক রোগী এখন তখন অবস্থা নিয়ে দিন তিনেক আগে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিল। সহদেবরাই অনেক রাতে তাকে বেডে দিয়েছিল। এতদিনের পোড় খাওয়া সহদেবের ধারণা ছিল রাতটুকুও কাটবে না। অতএব......। কিন্তু ঘাটের মড়া বেঁচে গিয়ে সহদেবকে যে এমন বাঁশ দেবে তা সে বুঝতে পারেনি। যাক যা হওয়ার তাতো হয়েই গেছে। সে ভেবে লাভ নেই। তবে এই মুহূর্তে ঘটনার গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়ায় সেটা দেখার জন্যই একবার হাসপাতালে যাওয়া দরকার।

পা বাড়াতেই পথ আগলে কৌশল্যা বলে, 'যাচ্ছিস কুথায়? এখন হাসপাতালে গেলেই পাবলিক তোর খাল খিচে নেবে।'

—নেবে তো নেবে। সে আমি বুঝব। তুই বেশি গার্জেনগিরি ফলাবি না। এখন ফোট্ তো এখান থেকে।

কৌশল্যাকে রোয়াব দেখায় ঠিকই, কিন্তু সহদেবের এতবড় বুকের পাটা নেই যে, উন্মত্ত জনতার মোকাবিলা করে। সে সদর এড়িয়ে ঘুর পথে পেছনের গেট দিয়ে সকলের অগোচরে হাসপাতাল চত্বরে ঢোকে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে কাজের অছিলায় ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে বাথরুম লাগোয়া খালি বেডটার পাশে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে অন্নপ্রাশনের ভাত উগড়ে দিত। কিন্তু যেহেতু সে সহদেব, জাতে ডোম, সেজন্যই মাসাধিককাল সাফাই কর্মীর হাতের পরশ না পাওয়া বাথরুমের তীব্র কটু গন্ধ যতই নাকে এসে লাগুক, তাকে কাহিল করতে পারে না।

তিনতলার জানালা থেকে নিচে যতটুকু নজরে আসে, মানুষে মানুষে ছয়লাপ। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে কিছু বলছে। আসলে কি বলছে হট্টগোলে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। কিছু কিছু ভাঙচুর চলছে। সহদেব জানে, সে যা করেছে, তাতে খুব একটা বাড়াবাড়ি হওয়ার কথা নয়। হয়তো কথা কাটাকাটি, চিৎকার চেঁচামেচি হবে। কিন্তু এ তো মশা মারতে কামান দাগা। আসলে শুধু রোগীর আত্মীয়রাই নয়, আর আর বার যেমন হয়, মওকা বুঝে আশেপাশের কিছু দুষ্কৃতিও সামিল হয়েছে, কামাবার ধান্দায়। এরা ঝামেলা করার জন্যই শুধু ঝামেলা পাকায়। পুলিশ এলেই সব ফাঁকা হয়ে যাবে। পরদিন খবরের কাগজে ছবি উঠবে। হাসপাতাল যেমন চলছিল আবার তেমনিই চলবে। দেখে দেখে সহদেবের গা সওয়া হয়ে গেছে।

এমন ভাবার পর সহদেবের নিজেকে যখন একটু হালকা মনে হয় এবং পায়ে পায়ে পিছিয়ে এসে পরম নিশ্চিন্তে খালি বেডটায় বসে, তখনই মিঁউ মিঁউ শব্দে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। বেডের দাবিদার ছিল না বলে গোটা চারেক বেড়ালছানা আপন মনে বিছানার তোশকের তুলো বার করছিল। অন্যমনস্কতায় সহদেব তারই একটার ওপর বসে পড়েছে। যন্ত্রণাকাতর শাবকটিকে কোলে নিতে ইচ্ছে হলেও সহদেবের সাহসে কুলোয় না তেড়ে আসা মায়ের চোখের দিকে চেয়ে। ততক্ষণে গা চেটে বিড়াল-মা সন্তানকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। দেখতে দেখতে আরো গোটা কয়েক নানা রঙের বেড়াল ইতিউতি এসে দাঁড়ায়। এরা সবাই পুরুষানুক্রমে হাসপাতালের বাসিন্দা। শাসন করার কেউ নেই বলে ডাক্তার, নার্স, রোগীর আত্মীয়স্বজনদের পায়ে পায়ে ঘোরে। রোগীদের খাবারে ভাগ বসিয়ে সহাবস্থানে রাত কাটায়। বিব্রত সহদেব ওখান থেকে সরে এসে লিফ্‌ট চালক রাজেনের সঙ্গে ভাব জমায়। কেননা সকালের নেশা চৌপট হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। এখন একটু খইনি না পেলেই নয়।

যথাস্থানে খইনিটুকু ঠেলে দেওয়ার পর রাজেন ঠোঁট চেপে কথা বলে, 'এ সহদেব ভাইয়া, তুমি এরকম কাম আর করিস না। কোন্‌দিন না কোন্‌দিন শালা পাবলিকের কেলানি খেয়ে মরে যাবি।'

সহদেব তাচ্ছিল্যভরে রাজেনকে দেখে। কেলানির ভয় করলে তার চলে না। পয়সা কামাতে গেলে ঐ ঝুঁকিটুকু নিতেই হয়। সার বুঝেছে সে। নইলে আজ থেকে ঠিক দুমাস আগেই স্বর্গে চলে যেত। বাপরে বাপ, ভাবতে গেলে এখনো বুক কাঁপে। সেবার জোর ফাঁড়া গিয়েছে। বাবা তারকনাথের কৃপায় চাকরি এবং জান দুটোই বেঁচেছে। তবে শাস্তিস্বরূপ রাতের অন্ধকারে হাউস সার্জেনের ঘরে গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নাকখত দিতে হয়েছিল, এই যা। উনি শেষমেষ ঘটনাটা সামাল দিয়েছিলেন।

ঘটনাটা হল, কৃষ্ণনগর হাসপাতাল থেকে একটা বারো চৌদ্দ বছরের ছেলেকে রেফার করেছিল সহদেবদের এখানে। হাতভাঙা কেস। কেসটা জটিল ছিল বলে মফঃস্বল হাসপাতাল নিজেদের হেফাজতে রাখতে ভরসা পায়নি। আনুষঙ্গিক পরীক্ষার পর বড় ডাক্তার হাড় সেট করে প্লাস্টারের ভারটা নার্স এবং অন্যান্যদের ওপর ছেড়ে গিয়েছিলেন। আর ওখানেই পাকামিটা করেছিল সহদেব। দুটো পয়সা কামাবার লোভে কাজটা নিজেরাই করেছিল। ফল যা হবার—হাড় সরে গিয়েছিল। কেসটা থানা পুলিশ হয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কেননা ওই পার্টির ওপরমহলে জানাশোনা প্রচুর।

সহদেব যখন আপনমনে এসব ভাবছে, বুধুয়া এবং মুন্নাকে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। কিন্তু চোখাচোখি হতেই দ্রুত দুজনে উল্টোদিকের নিচে নামা সিঁড়ির দিকে দৌড়ায়। ব্যাপারটা সহদেবের কাছে সন্দেহজনক ঠেকে। তার অভিজ্ঞ নাক কাঁচা পয়সা কামানোর গন্ধ পায়। সেও পিছু নেয়।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই। দোতলায় একটা সাপে কাটা রোগী মারা গেছে। অর্থাৎ হাতে কিছু আসবেই। ডেডবডি মর্গে যাবে। নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল কর্মীদের—সহদেবদেরই নামিয়ে নিয়ে আসার কথা। কিন্তু সহজ কাজটা সহজভাবে করলে তো কোনো হ্যাপাই থাকে না। সহদেব দর হাঁকে, 'মড়া নামানোর কাজ আমাদের নয়। নামাবার লোক রাত দশটার আগে আসবে না।'

রোগীর আত্মীয়রা মড়া আগলে বসে থাকলে লাস্ট ট্রেনটাও পাবে না। অতএব রফা হয়।

—তিনজনে মিলে নামাবো দুশো লাগবে। মর্গের ভালো জায়গায় রাখবো তারজন্য আরো একশো।

মৃতের ভালোমন্দ জায়গার কোন্ প্রয়োজন শোকাতুর আত্মীয়রা তা বুঝতে চায় না। বেঁচে থাকতে যা করা হয়নি, বা করতে ইচ্ছে হয়নি মৃত্যুর পর তার প্রিয়জন তবুও যদি তুলনামূলক মর্গের একটু ভালো জায়গায় থাকে ক্ষতি কি। এ খরচ তো সাময়িক। অতএব তিনশোই সই।

রাত নটা। মহানগরীর সন্ধ্যা। তবে অকালবর্ষণে হাসপাতালের পেছনদিকে চতুর্থ শ্রেণির কোয়ার্টারগুলির ছাদে ঝাকরা গাছের অন্ধকার গাঢ় হয়ে জমেছে। গা ছমছম ভাব। বিকেলের তিনশো টাকার একশো সহদেবের। সেই টাকার সংক্রমণ সহদেবের

শরীরে। দেশি-বিলেতি মিশিয়ে তূরীয় অবস্থা। বেসামাল হয়ে বারান্দায় লম্বমান। অদূরে চুলায় রুটি সেঁকতে ব্যস্ত কৌশল্যা।

ছাতা মাথায় জনাপাঁচেক মানুষ গুটিগুটি কৌশল্যার সামনে এসে দাঁড়ায়। ওরা সহদেবের খোঁজ করে। কৌশল্যা ইশারায় সহদেবকে দেখিয়ে নিজের কাজ সামলায়।

নাম ধরে অনেকবার ডেকেও সহদেবের সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। এবার আগন্তুকদের একজন সহদেবের শরীর ধরে ঝাঁকায়। সহদেব বেহুঁশ।

সহদেবকে যে খুব প্রয়োজন, অনুমানে বুঝে কৌশল্যা ওদের অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে যায় এবং এক বালতি জল এনে পুরোটাই সহদেবের মুখে মাথায় ঢেলে দেয়। জলের ঝাপটা আর ডাকাডাকিতে চোখ মেলে সহদেব। এতগুলি অচেনা লোককে একসঙ্গে দেখে তার চটকা কাটে। সে জড়িত গলায় বলে, 'কি! হইছেটা কি?'

মধ্যবয়সী একজন এগিয়ে এসে বলে, 'সহদেব, তোমার সাথে কথা ছিল।'

লোকটাকে সহদেব চিনতে পারে। বিকেলে দেখেছে। মানিকতলার পার্টি। ওদেরই একজনের লাশ মর্গে ঢুকিয়েছে। সন্দেহজনক মৃত্যু। পুলিশ কেস হবে।

সহদেব উঠোনে নেমে এসে বলে, 'বলেন কি বলতেছেন।'

ওদের মধ্যে খুব নিচু গলায় কথা হয়। সব কথা না হলেও, 'পারবো না, মর্গবাবু নেই, পাঁচশোতে হবে না, আরো লাগবে'—ইত্যাকার টুকরো কথা কৌশল্যার কানে আসে।

পরদিন। হাসপাতালে ধুন্ধুমার কাণ্ড। হাসপাতালের দেড়শ বছরের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যা ঘটেনি, তাই ঘটেছে। মর্গ থেকে লাশ গায়েব। সাপে কাটা লাশ দিতে এসে সহদেবের চক্ষু চড়কগাছ। মাত্র দুটো লাশই তো ছিল। গতরাতে একটা মানিকতলার পার্টিকে দিয়েছে। সহদেব বুঝতে পারে নেশার ঘোরে কাজটা তার দ্বারাই ঘটেছে। লাশ পাল্টে গেছে।

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মা-টা এখনো বুক চাপড়ে বিলাপ করে কাঁদছে। সহদেব সহ্য করতে পারে না। তার এতদিনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বিবেকের বন্ধ দরজায় অনুশোচনার বাতাস এসে ধাক্কা মারে। এই প্রথম কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়। সে টের পায় শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নামছে।

ততক্ষণে চারপাশে লোক জমতে শুরু করেছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবার আর সময় নেই।

কদিন ধরেই নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছে লোডশেডিং। অন্ধকার ঠেঙিয়ে রাতের প্রথম প্রহরে কৌশল্যা চ্যালাকাঠ হাতে স্বামীর খোঁজে যখন নন্দরানীর ঠেকে এসে দাঁড়ায়, সহদেব তখন সবেমাত্র দুপাত্র চড়িয়ে, চোখ বুঁজে নেশা উপভোগ করছে। কেউ

কিছু বুঝে ওঠার আগেই গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কৌশল্যা অতর্কিতে সহদেবকে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। বাধা দিতে চেষ্টা করেও সহদেব সফল হয় না। মারতে মারতে যখন রাগ কমে আসে তখন, চ্যালাকাঠটি ছুঁড়ে ফেলে ক্লান্ত শরীরে কৌশল্যা ধপাস করে বসে পড়ে। আর তার পরই অভিমানে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে সহদেবের হাত দুটি টেনে নিজের গলায় চেপে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'তোর দারুর পয়সার দরকার? তো আমাকে মেরে লাশ বানিয়ে বেচে দে, অনেক পয়সা পাবি। জি ভরে দারু পিবি। আমি দেখতেও আসব না, বলতেও আসব না। মার! মেরে ফেল আমাকে।'

সহদেবের হাত কৌশল্যার গলায়। কিন্তু হাতে যেন সাড় নেই। ঘটনা তাকে এমন দিশেহারা, বিহ্বল করে দিয়েছে যে, সে শুধু বোবা দৃষ্টিতে কৌশল্যার কান্নাভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুটা সময় মুখোমুখি কাটানোর পর সহসা তার শরীরটাও যেন হঠাৎ কেঁপে ওঠে। বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। এই বুক কেমন করা, যা শুধু নিজের কাছেই অনুভূত হয়। বাইরের কাউকে বলে তা বোঝানো যায় না। আর তখনই কৌশল্যাকে অবাক করে সহদেবও হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

নিষ্ঠুর, নিরেট পাষাণ গলছে। কাঁদছে সহদেব। শারীরিক আঘাতের ব্যাথায় নয়, সংক্রমণেও নয়, এই আঘাত লেগেছে মনে। খুব গভীরে। সহদেবের অজান্তেই সেখানে ভাঙচুর চলছে, আর আজন্ম সঞ্চিত ক্লেদ একটু একটু করে ঝরছে। ঝরছে দু-চোখ বেয়ে।

প্রতিবাদী

সন্ধে গাঢ় হতেই একজন দুজন করে আসতে শুরু করে পাড়ার মানুষ। পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে দলীয় ঘরোয়া মিটিং সুদাম ভট্টাচার্যের বাড়িতে। ছাতার মতো ঝাকড়া মস্ত জামরুল গাছের নিচে ত্রিপল বিছিয়ে মিটিং-এর জায়গা করা হয়েছে। গরমের দিন, তাছাড়া গ্রামের মানুষ যারা প্রায় সকলেই চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা কাজকর্ম মিটিয়ে তবেই আসবে। সময় তো লাগবেই।

সাকুল্যে গোটা পঁচিশেক ভাঙাচোরা মুখ উঠোনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। হুক করা বিজলি বাতিতে সভা আলোকিত। কিছু একটা বলবে বলে সাধন জানা যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি ঝপাং করে লোডশেডিং। কিন্তু উপস্থিত লোকগুলির তাতে কোনো হেলদোল নেই। কেননা তারা এতে অভ্যস্ত। গ্রামে বিদ্যুৎ আসা ইস্তক তারা দেখছে খুঁটিগুলি আছে, তাতে বিদ্যুৎবাহী তারও আছে, কিন্তু বিদ্যুৎটাই থাকে না এই যা। অথবা থাকলেও দিনের কতটুকু সময় থাকে তা ঈশ্বর বিনে কেউ জানে না। আলোর পর হঠাৎ অন্ধকার চারদিক যেন ঘুরঘুট্টি আঁধারে জমাট বাঁধে। কিছুটা সময় অন্ধকারে কাটানোর পর উদ্যোক্তাদের তৎপরতায় জোগাড় হয় দু-তিনটে হ্যারিকেন।

আবার মিটিং শুরুর তোড়জোড় শুরু হয়। হ্যারিকেনের আলোয় মানুষগুলির নড়াচড়ার ছায়া উঠোন পেরিয়ে বাঁশবাগানে বিস্তার নেয়। বাতাসে বাঁশের দোলন, তার ওপর মানুষের ছায়ারা মিলে একটা আধিভৌতিক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে হিতেন মণ্ডল, পরেশ মান্না—নদীর ঘাটে যাদের চায়ের দোকান, পানের দোকান তারাও এক এক করে ঝাঁপ ফেলে চলে এসেছে।

চল্লিশ ছুঁই ছুঁই সাধনের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। কাঁধে ব্যাগ। এই বয়সেই জুলপি সাদা। সে দলের সর্বক্ষণের সক্রিয় সদস্য। এবারের নির্বাচনে প্রধান পদের দাবিদার। আগের প্রধানকে শারীরিক কারণে দল অব্যাহতি দিয়েছে। সাধন সুবক্তা। দলে, দলের বাইরে এ নিয়ে দ্বিমত নেই। গ্রামের মধ্যে পয়সাওয়ালা, জমিজিরেত আছে, বেনামে ইটখোলা আছে, লরিও আছে খানকয়েক। করিতকর্মা মানুষ। বলতে গেলে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামে যে দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য তা এই সাধন জানার ছড়ি ঘোরানোর জন্যই। চোখ দুটো ধূর্তামিতে ভরা। তার বিধানের ওপর গ্রামের মানুষ কখনো টুঁ শব্দ করেছে, এমনটা আজ অবধি শোনা যায়নি।

সভার কাজ শুরু হয়। সাধনের একান্ত অনুগত, লোকে বলে ডানহাত, অবনী সাঁতরা বক্তব্য রাখে। '... থালে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? না গেরামের উন্নতি

করা। মানুষের ভালো করা। সব মানুষের ভালো হয় এমন কাজ করা। কিন্তু উসব তো বাইরে থাকতে করা যাবেনি। আমাদের ভোটে জিতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করতে হবে। থালে আমাদের ভোটে জিততে হবে। আর ভোটে জিততে হলে আপনাদিগের আশীর্বাদ চাই। ত আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন ত?' সভায় জিজ্ঞাসাটা ছুঁড়ে দিয়ে অবনী উত্তর পেতে সময় নেয়।

জমায়েতে ফিসফিসানি। নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে জনতা কোরাসে বলে, 'হ। আমরা তমাদের সঙ্গে রইছি।'

অবনীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তবে তা ক্ষণিকের জন্য। ঝানু রাজনীতিকের মতো হাসি আড়াল করে আবার বলতে শুরু করে, 'ই'আমি জানি, সাধন-দা আপনাদিগের ঘরের ছেলে, উ ত আশীর্বাদ পাবেই। তবে কথা একটা আছে। আপনারা মুখের কথায় বিশ্বাস করে আমাদিগে ভোট দিবেন না। কাজ দেখে দিবেন। আর কাজ যে আমরা করতেছি, ভালো কাজ উসব ত আপনারা লিজের চখে দেখছেন। তবে হ্যাঁ, ভুলত্রুটি মানুষমাত্রে হয়, আমাদিগেরও হতে পারে। ত সিটা আপনারা ধরাইয়া দিবেন। ই সবের জন্যে সমীক্ষা দরকার।' খানিক থেমে জমায়েতের ওপর নজর চারিয়ে একজনকে বেছে নিয়ে তার উদ্দেশ্যে বলে, 'আচ্ছা রাজেন কাকা, আপনি তো অনেক দিন থেকে দেখছেন, আপনি বলেন, আমরা সরকার থিকে গেরামের জন্যে, মানুষের জন্যে যা করতেছি— যেমন ই গ্রামে টিউকল ছিল না, করেছি। স্কুল হইছে, ছাত্রদের টিফিনের ব্যবস্থা হইছে। ঘরে ঘরে যায়নি বটে, তবে গেরামে এসেছে; আমাদের সরকার বিজলির ব্যবস্থা করেছে। ত কাকা ই সবে আপনার কি মত?'

অশিতিপর রাজেন পরিয়া যার সারা জীবন গেল পরের জমিতে জন খেটে, মিটিংয়ে আসতে বলেছে তাই এসেছে। কিন্তু তাকে যে এতটা গুরুত্ব দেবে এবং মতামত দিতে হবে এটা সে ভাবেনি। স্বভাবতই সে এই প্রশ্নে বিব্রত বোধ করে। বিড়বিড় করে মাথা নেড়ে কি বলে বোঝা যায় না।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টি নামলে মিটিং পণ্ড হয়ে যাবে। সহজবোধ্য কারণে সাধন বিরক্ত হয়। অবনীকে তাড়াতাড়ি মিটিং শেষ করতে বলে। তাড়া খেয়ে অবনী বলে, 'থালে, আপনাদিগের আর কিছু বলার নাই ত?'

গ্রামীণ জীবনে চাষবাসে অভ্যস্ত মানুষগুলি নিজেদের নিয়েই সদা বিব্রত। তারা রাজনীতির কূটকচালি বোঝে না, বুঝতেও চায় না। ফলে কেউই আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলে না। নেতারা যা করবেন, যা বলবেন তাতেই তাদের সায় রয়েছে।

কেউ যখন কিছু বলতে এগিয়ে আসছে না তখন সাধন অবনীকে বলে, 'এবার থালে উঠা যাক।'

এমন সময় বছর কুড়ির স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে উঠে দাঁড়ায়। নম্র অথচ স্পষ্ট স্বরে বলে, 'যদি অনুমতি দেন থালে একটা কথা জিগ্যাস করব।'

সাধন-অবনীর চোখাচোখি হয়। অবনী বলে, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বল। বৃষ্টি এসবে।'

বোধহয় তৈরি হতে একটু সময় নেয়। পরে অবনীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আপনারা বলতেছেন মানুষের জন্য যা করছেন সব ভালো কাজ। কিন্তু আমি ত জন্ম ইস্তক আমাদের গেরামে এই একটা পাট্টিকেই কাজ করতে দেখতেছি। পাশাপাশি আরেকটা পাট্টি যদি এসে কাজ করার সুযোগ না পায় থালে কি করে বুঝা যাবে কারা ভালো করছে কারা মন্দ করছে।'

আকাশে বিদ্যুতের চমক বাড়ে। বাঁশ বনে পেঁচা ডেকে ওঠে।

অবনী কিছু বলতে যেতেই সাধন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'ওহে ছকরা, তমার কথার উত্তর এখন দুয়া যাবেনি। আগামী রবিবার সকাল দশটায় দুর্গা মন্দিরে মিটিং। সেখানে এসবে, কথা হবে। আজকে এখানেই মিটিং শেষ।'

নদী বাঁধে হাঁটতে হাঁটতে সাধন জিগ্যেস করে, 'ছকরাটা কে বটে অবনী?'

—অকে চিনেন না? আরে উ ত উত্তর পাড়ার সন্তোষ সামন্তর বেটা পলাশ। উ এমনিতে ভালো ছেলে। সাহস আছে। খুব খাইটতে পারে। মানুষের আপদ-বিপদে বুক দে ঝাঁপায়ে পড়ে। তবে দোষ একটাই। ছড়ার কথাগলান খুব চ্যাটাং চ্যাটাং।

গুম মেরে যায় সাধন। খানিক পরে বলে, 'খিয়াল রাখ। অকে বাগাতে হবে।'

অসময়ের বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে ঘরে ফেরে পলাশ। গ্রামের অন্ধকার রাত, তায় যদি হয় দুর্যোগপূর্ণ তবে প্রথম প্রহরেই নিঃঝুম। শরীরটা কদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে সন্তোষ। ভাত আগলে বুড়ি মা হেঁসেলে জাগে। সাড়া পেয়ে বলে, 'পলাশ আসলি বাপ!'

—আজ্ঞে। মাথায় গামছা ঘষতে ঘষতে উত্তর দেয় পলাশ।

—ভাত দুব?

—দও।

খেতে খেতে কথা হয়। মা বলে, 'পলাশ কাল একবার পিসিঘর থাকতে ঘুরে আসিস। অনেক দিন কুনো খপর লাই।'

ভাত মাখতে মাখতে উদ্বিগ্ন পলাশ বলে, 'কেনে কিছু হইছে?'

—না, না, উসব কিছু লয়। এমনি, তর বাপ বলছিল তাই।

পাশের গ্রাম সেরপুরে পিসি বাড়ি। পিসি বিধবা। অপঘাতে স্বামী মারা গেছে আজ চার বছর। একমাত্র সন্তান এগার বছরের ছেলে নিয়ে একা স্বামীর ভিটে আগলে রয়েছে। লোকজন দিয়ে চাষের কাজ চালিয়ে সংসার নির্বাহ করে। তবে প্রায় সময়েই সন্তোষ, পলাশ তার তত্ত্বাবধান, দেখভাল করে।

বৃষ্টিমাখা বাতাসের মাতলামি, ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝির ডাক সঙ্গী করে কালো রাত আপন খেয়ালে গড়িয়ে চলে।

রবিবার ছুটির দিন, মানুষের যেন হেলদোল নেই। অনেকক্ষণ দুর্গামন্দিরে বসে আছে পলাশ। আশপাশের দু-তিনটে গ্রামের মধ্যে এই একটাই মাত্র পূজামণ্ডপ। পুজোর

কটাদিন ছাড়া সারা বছর পরিত্যক্ত মণ্ডপটির টিনের চালে ঝুল জমেছে। ফাঁক ফোঁকরে সংসার পেতেছে পায়রা। তারাই এখন বক বকম শব্দে প্রাক্ দুপুরের নির্জনতা ভঙ্গ করছে। বসে বসে বিরক্ত হয় পলাশ। পায়ে যার চাকা লাগানো, মাথায় যার হরেক কাজের চিন্তা তার কি দুদণ্ড বসে সময় কাটানো সাজে।

মিটিং শুরু হতে হতে এগারোটা। সভায় নির্বাচন ছাড়াও গ্রামের আরো উন্নতি কিভাবে করা যায়, তাতে গ্রামবাসীদের ভূমিকা কি তাই নিয়ে আলোচনা হয়। মত বিনিময় হয়। যার যা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। ঘড়ির কাঁটা একটা ছুঁই ছুঁই। পলাশ অস্থির হয়ে ওঠে। সবাই বলছে, অথচ তারও যে কিছু বলার ছিল। কিন্তু সুযোগ হচ্ছে না। অল্পবয়সী বলে সে তো পাত্তাই পাচ্ছে না। শেষে মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ায়। গলা খাঁকারি দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকার্ষণ করে। সাধন চোখ ছোট করে তাকায়। ঘাড় ঘুড়িয়ে পেছন পানে তাকিয়ে হিতেন মণ্ডল বলে, 'তুই কি কিছু বলবি পলাশ?'

পলাশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বোমাটা ফাটায়। 'হিতেন কা দোষ নিওনি। ছট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে। তমরা ত গেরামের উন্নতি লিয়ে কত কথা বললে, কই ইদিকটা ত খিয়াল করলে না।'

জনা পঞ্চাশেক মানুষ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বুঝতে পারে না ইদিক বলতে কি বোঝাতে চায় ছেলেটা। পরেশ মান্না বলে, 'সিটা কি তুই-ই বল না কেনে বাপ।'

—হ হ তুই যা জানু তাই বল। অনেকে উৎসাহ জোগায়।

উপস্থিত সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ, পলাশের সম্মানীয়। সে বলে, 'কাকা, আমাদের গেরামটা লদীর ধারে। ইট তৈরির জন্যে খোলার মালিকরা লদীর পাড় কেটে মাটি লিয়ে যায়। তাথে জোয়ারের ধাক্কায় পাড় ভেঙে অনেক জমি লদী গভ্যে গেছে। এমন চলতে থাকলে ধান জমি তো যেছেই, একদিন বাড়িঘরও তলায়ে যাবে। ত ইদিকটা তমরা দেখবে না?'

প্রথমে গুঞ্জন, পরে সোরগোল। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত ব্যক্ত হয়। 'হ হ ই কথাটা ত ঠিক। আমাদিগের নিজেদেরই ভাবা উচিত ছিল। ছড়াটার বয়স কম ঠিকেই, কিন্তু কেমন খিয়াল রাখছে দেখ।'

সকলের অগোচরে সাধনের মুঠি শক্ত হয়। উত্তেজনায় অবনী উঠে দাঁড়ায়। পিঠে হাত রেখে ইশারায় ওকে শান্ত হতে বলে সাধন।

যাদের জমি সত্যি সত্যি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে, তারা এতদিন 'অদৃষ্টে নাই, তাই গেছে' এমন ভেবে চুপ করে ছিল। আজ অবলম্বন পেয়ে সাহসী হয়। প্রতিবাদ জানায়।

—হ সাধনবাবু, ইটা ত আমাদিগের উপর অবিচার হইছে। তমরা পঞ্চায়েতে রইছ তমাদের ইসব খিয়াল রাখা দরকার।

—পঞ্চায়েতে আমাদিকে ভোট দও, ভোট দও বলে ঘর ঘর যাও। যেদি ঘরই লদীতে তলায়ে যায়, থালে কন শালা ভোট দেবে শুনি।

—ই সবের বিহিত চাই। এখখুনি চাই।

চেঁচামেচি বাড়তে থাকে। সাধনের বুকে কংসাবতীর জোয়ারের অশান্ত ঢেউ। কপালের ভাঁজে ঘন ঘন পরিবর্তন। কিন্তু দক্ষ অভিনেতার কুশলতায় মুখে হাসি টেনে হাত তুলে জনতাকে শান্ত হবার আর্জি জানিয়ে বলে, 'আপনারা আমার কথা শুনেন। লদীর পাড় খাস জমি। সিখানে মাটি কাটলে আমি কি করে আটকাব?'

মৌচাকে ঢিল পড়ে। উদ্বেল জনতা ক্ষেপে ওঠে। মুখের কারো আগল থাকে না। খিস্তি সহযোগে বলে, 'উসব আমরা শুনতে চাই না। উসব তমাদের চালাকি কথা। না পারলে পঞ্চাতি ছেড়ে দিয়ে বাগালি করগা।'

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে সাধন বেকায়দায়। গেঞ্জি, পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে জবজবে। রুমালে ঘন ঘন মুখ মোছে। উত্তেজনা একটু থিতোলে, অবস্থা অনুকূল বুঝে গলায় আবেগ ঢেলে সাধন বলে, 'ঠিকাছে, উসব নিয়ে আপনাদিগের কুনো চিন্তা করতে হবেনি। পঞ্চায়েত ভোটটা হয়ে গেলে যা ব্যবস্থা লিয়ার লিব। যেদি দরকার হয় আমাদের এম. এল. এ সাহেবের সাথে দরবার করব।'

ঘুঘুডাকা দুপুরে একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় করে দুর্গা মন্দিরে নিঃসঙ্গ বসে থাকে দুটি মানুষ। দৃশ্যত বিব্রত। যারা মাটি কাটতে আসে, ভাটার মালিকদের সঙ্গে সাধনের মাসোহারার বন্দোবস্ত। তাছাড়া মাটি কাটা নিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা উঠবে সাধন কখনো ভাবেনি। যদিও সাধনদের পার্টি ছাড়া মাথা চাড়া দেবে এমন শক্তিশালী পার্টি আপাতত এখানে নেই, যা আছে নির্বিষ। কিন্তু পলাশ পাকা রাজনীতিকের মতো আজ যা বলল, তা বিরোধী পক্ষের কানে গেলে তারা ভোটের আগে এটাকেই ইস্যু করবে। অথবা পলাশ নিজেই যদি বিরোধী পক্ষে চলে যায়? তবে? কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় সাধনের চিন্তা। উত্তেজনায় দুজনে ঘন ঘন বিড়ি টানে। একসময় স্তব্ধতা ভেঙে অবনীই জিগ্যেস করে, থালে কি হবে সাধনদা?'

দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে চিন্তা করে একটা সমাধানে পৌঁছে, অর্থপূর্ণ হাসি হেসে সাধন বলে, 'হবে। এখন ঘর যাও।'

দুজোড়া পা আলকাতরা মোড়া অন্ধকার ভেঙে চার ব্যাটারি টর্চ হাতে আলপথ ধরে দ্রুত হাঁটে। গন্তব্য পলাশের বাড়ি। মাঠ পেরিয়ে, নদী বাঁধ ধরে বাঁশ বাগানের তলা দিয়ে এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাঁকে, 'সন্তোষ কাকা বাড়ি আছ?'

এগিয়ে এসে হ্যারিকেনের আলোয় মুখ দেখে সন্তোষ সাদর অভ্যর্থনা জানায়, 'এসো, এসো বসো।' দুটো মোড়া এগিয়ে দিয়ে সন্তোষ জিগ্যেস করে, 'কোথা থাকতে সাধন?'

—ঘর থাকতে। যাচ্ছিলম পূব পাড়া, ত ভাবলম, অনেকদিন কাকার দোরে যাইনি, খুড়িমাকে একবার দেখে যাই। কেমন আছ খুড়িমা? সাধন পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যায়।

বিব্রত খুড়িমা পরপুরুষের সামনে মাথার কাপড় আরো টেনে দিয়ে দুর্বোধ্য উচ্চারণ

করে খানিকটা পিছিয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দেয় সন্তোষ, 'আহা উসব কেনে, উসব কেনে। তা দাঁড়ায়ে থাকলে কেন? বসো হে সাধন, অবনী তুম্মো বসো।'

একথা সে কথার পর আসল প্রশ্ন সাধনের, 'কাকা পলাশকে একটু দরকার ছিল। উ ঘরকে লাই?'

—আর বলনি। সেই দুফর বেলা মিটিং থাকতে এসে চান সেরে দুটো ভাত মুখে দেবে ছড়াটা ত অমনি শচীনের ব্যাটা এসে হাজির। উয়ার মার নাকি সকাল থিকে দাস্তবমি হচ্ছে। ত ছড়াটাকে বস করিয়ে নাকে মুখে দুটো গুঁজে সেই যে বারায়ে গেছে এখুনও ফেরেনি। শুনলম টাউনে গেছে। এসবে ঠিকেই। তমরা বসো।'

সাধন মনে মনে হিসেব মেলায়। শচীন শত্রুপক্ষ, পলাশ গেছে তার বউকে নিয়ে হাসপাতালে। মাথাটা ক্রমশ গরম হয়ে ওঠে। উষ্মা চাপা থাকে না সাধনের কথায়, 'কাকা শচীন বেরার বউয়ের জন্যে পলাশ হাসপাতাল যেছে। উ ত আমাদের...।'

সাধনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হাসিমুখে সন্তোষ বলে, 'তাথে কি। সে ত পিতিবেশি। শচীনের ব্যাটা আর পলাশ ছটবেলা থাকতে একসাথে বড় হইছে, স্কুল গেছে।'

শুধু 'অ' বলে সাধন চুপ করে যায়।

একটু পরে উঠোনে পা দিয়ে সাধনদের দেখে পলাশ থমকায়। সন্তোষ বলে, 'উনারা তমার জন্যে বসে আছে।'

ভূমিকার ধার দিয়ে সাধন হাঁটে না। সরাসরি প্রস্তাব দেয়, 'পলাশ ইদিকটা না দেখলে ত হবেনি। তমার মতো ছেলেরাই ত আমাদিগের ভরসা। তা তমাকে ত আমার জন্যে ভোটে খাটতে হবে। অবনী কাল এসবে, কি করতে হবে তমাকে সব বুঝায়ে দেবে। কাল থিকেই লেগে পড়।'

পলাশের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। এই মুহূর্তে ভোটের কাজের চেয়ে তার কাছে জরুরি বন্ধুর মা হাসপাতালে, যে কদিন সুস্থ না হয় ছোটাছুটি করতে হবে। বুড়ো বাপের হাত লুড়কাত সে, চাষের কাজে সঙ্গ দিতে হয়। আছে পিসির তত্ত্বাবধান। তা ছাড়াও কার মেয়ের বিয়ে ডাকো পলাশকে, কার কখন কোন দরকারে সদরে ছুটতে হয় কে জানে। এসব ভেবে সে বলে, 'উসব আমার দ্বারা হবেনি, অন্য লোক দেখে লিন।'

পলাশ যা ভেবেই বলে থাক, কিন্তু মুখের ওপর এমন জবাব গ্রামের কোনো ছেলে দেবে সাধন কল্পনাও করতে পারেনি। এতদিন সে জানত কারো ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে, সাধনের বিরুদ্ধাচরণের সাহস রাখে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় দেখা না গেলেও বোঝা যায় পলাশের কথাগুলি হজম করতে সাধনের কষ্ট হচ্ছে। মনে হয় এক্ষুনি ছেলেটির গলা টিপে ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা ঠিক কাজ হবে না ভেবে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে অপমানাহত সাধন অবনীর উদ্দেশ্যে বলে, 'চল হে অবনী, উদিকে মেলা কাজ পড়ে রইছে।'

টানা দুমাস বৃষ্টি নেই। দাবদাহে মাঠের ঘাস হলুদ। জলাশয়ের কাদামাটি শুকিয়ে

ফুটিফাটা। গৃহপালিত পশুদের চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে প্রথম হালের গরুটা মরল পলাশদেরই। চড়া রোদে মাঠে চরতে চরতেই মারা গেল। এরপর সারা গ্রামেরই কারো গরু কারো ছাগল মরতে থাকল। প্রায় প্রতি ঘরে শিশুদের ডায়ারিয়া। প্রথমে দুঃখ-শোক, পরে বিস্ময়; শেষে ভয় এসে গেড়ে বসল মানুষের মনে। ডাক্তার-বদ্যির চেয়েও ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাসী মানুষগুলির ধারণা অপদেবতার কু দৃষ্টি না পড়লে এমনটা হবার কথা নয়। তারা জোট বেঁধে শীতলা পূজা, সন্ধ্যের পর ঘরে ঘরে হরিসংকীর্তন এবং আরো নানা তুকতাকের ব্যবস্থা করলেও অবস্থার কোনো হেরফের হল না। শেষে দিশেহারা গ্রামের মানুষ সাধনের দ্বারস্থ হল।

সাধন এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল যেদিন গ্রামের একটা বিরাট অংশের মানুষ তার মুখাপেক্ষী হবে। সে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে, 'মনে লয় কুনো অপদেবতার লজর পড়েছে গ্রামের উপর।'

এমনিতেই ভয় পাওয়া গ্রামের মানুষগুলির মুখ আরও শুকিয়ে যায়। তারা সমস্বরে জানতে চায়, 'এখন উপায়?'

সাধন অভয় দিয়ে বলে, 'তুমাদের কুনো ভয় নাই, আমার জানাশোনা গুণিন আছে, তাকে ডাকা করাইছি। তিনি এসলে অপদেবতাই বল আর যাই বল বাপ বাপ করে পলাইতে পথ পাবেনি।'

পরদিন গুণিন আসে তমলুক থেকে। তাকে দেখতে গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ে সাধনের উঠোনে। গুণিনই বটে। যেমন দশাসই চেহারা, তেমন গলার আওয়াজ। মন্ত্রবলে নিশ্চিত হয়ে গুণিন বলে, 'গ্রামে ডাকিনীর লজর পড়েছে। তবে কিনা সে সময়মতো এসে পড়ায় ভয়ের কিছু লাই।' প্রথমেই সে গ্রাম বন্ধন করে দেয়। পরের বিধান, ডাকিনী তাড়াতে অমাবস্যা রাতের তৃতীয় প্রহরে অঘোর কালীর পূজা দিতে হবে।

উপযাচক হয়ে সাধন এগিয়ে আসে, 'উসব খরচাপাতির জন্যে ভাবতে হবেনি, আপনি ব্যবস্থা করেন।'

—হুম! গুণিন আত্মস্থ হয়ে চোখ বোঁজে। মিনিট পাঁচেক পরে, 'এক মুঠা শ্মশানের মাটি আনতে লাগবে হে। রাত দুপহরে আনতে হবে। এক দমে যেতে হবে, এক দমে এসতে হবে। একা।'

এখানেই হোঁচট খায় গ্রামের মানুষ। কে যাবে রাত দুপুরে শ্মশানে মাটি আনতে? গ্রামে অপদেবতার নজর পড়েছে কথাটা জানাজানি হতে এমনিতেই লোকে গাবতলা, তেঁতুলতলা, এড়িয়ে চলে। দিনের বেলাতেই শ্মশানের পাশ দিয়ে গেলে শরীর ভার হয়ে আসে। নিরাপত্তার জন্য পুরুষেরা বুকে থুতু ছেটায়। মায়েরা সন্তানের আঙুল কামড়ে দেয়। আর রাতে? তাও রাত দুপুরে? ডাইনী তবু চোখে দেখা যায়—ডাকিনী যে অশরীরী, হাওয়ার মিশে থাকে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ভয়ে ভয়ে একজন বলে, 'আপনি লিজেই যান না কেনে গুণিন বাবা!'

অট্টহাস্যে দালান কাঁপিয়ে গুণিনের জবাব, 'তালে ত ল্যাঠা চুকেই যেত। আমি গেলে হবেনি। আমি কি ই গেরামের মানুষ? তমাদেরই কাউকে যেতে হবে।'

সমাবেশে ফিসফিসানি বাড়ে। সাহস করে কেউ এগিয়ে আসে না।

—ই কাজ পলাশ ছাড়া কেউ পারবেনি। উ বাপের বেটা বটে। কে যেন ভিড়ের মধ্য থেকে কথাটাকে ভাসিয়ে দেয়।

গাজনে ভক্ত্যে হওয়ার অভিজ্ঞতায় রাতবিরেতে অগম্য স্থানে যাওয়ার হিম্মত পলাশের আছে। উপরন্তু কথাটা যখন তারই উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তখন এটুকু কষ্ট স্বীকার করলে একটা গোটা গ্রামের মানুষের যদি উপকার হয় তবে সে তা করতে রাজি। এমনটা ভেবে সে বলে, 'কাউকে যেতে হবেনি, আমিই লিয়ে আসব।'

উপস্থিত জনতার মধ্যে স্বস্তির বাতাস বয়ে যায়। আড়ালে সাধন ক্রুর হাসি হাসে। গুণিন বলে, 'তবে হা, সিদিনা রাতের বেলা কেউ ঘর থাকতে বার হবেনি। ডাকিনীর মায়া। উ চেনা মানুষের গলা করে তমাদের ডাকবে। খপরদার তবু আগল খুলবেনি।'

অমাবস্যা রাতে উদ্বিগ্ন, উৎকর্ণ, নিদ্রাহীন মানুষগুলি ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছা বন্দি থেকে অক্ষরে অক্ষরে গুণিনের নির্দেশ পালন করে। মাঝরাতে একবার 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শোনা গেলেও এবং গলাটা অতি পরিচিত মনে হলেও গুণিনের কথায় কেউ ঘর থেকে বের হতে সাহস পায়নি। এরপর তারস্বরে সম্মিলিত কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায়নি।

কাক ভোরে সাধনই খবরটা পাড়ায় পৌছে দেয়। রাতে সেরপুরে ডাকাত পড়েছিল। গ্রামবাসীরা একজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

খবরটা চাউর হতেই সোজা পথে পৌছতেও যেন মানুষের তর সয় না। তারা খালবিল, বন-বাদাড় ভেঙে ডাকাত দেখতে ছোটে। নদীর পাড়ে তলা ক্ষয়ে যাওয়া, নদীর বুকে ঝুঁকে পড়া একটি পাকুড় গাছের জেগে থাকা শিকড়ের ওপর পড়ে রয়েছে পলাশের ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহটি। মাথা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত জমাট বেঁধেছে গাছের শিকড়ে।

কেউ কিছু বলার আগেই টাকরায় বিচিত্র শব্দ তুলে সাধন আক্ষেপ করে, 'ছড়াটার সাহস ছিল গ, কাজের মানুষ ছিল বটে! তবে উয়ার মনে যে এমুন বদ মতলব ছিল তা কিন্তুক দেখে বুঝা যেতনি। পাপ বাপকে ছাড়ে নাগো। সে ঠিক শোধ লিবেই লিবে।'

কোনোদিনই গ্রামের মানুষজন সাধনের কথার বিরুদ্ধে কথা বলেনি। আজও বলে না। তবে সাধনের কথাটাও তারা মেনে নিতে পারে না। জনতার ফিসফাস গুঞ্জনে পরিণত হয়।

ভিড়ে মিশে থাকা অবনীর সঙ্গে সাধনের চোখাচোখি হলে অবনী সহ্য করতে পারে না। চোখ নামিয়ে নেয়।

লাচার

অন্ধকার আকাশের নিচে গনগনে চুল্লির আলোর বৃত্তের মধ্যে মানুষগুলোর হাত-মুখ নেড়ে কথা বলা, হাঁটাচলা দূর থেকে রুপোলি পর্দার ছবির মতো দেখায়। পাশাপাশি চারটি ড্রামের বিশাল উনুনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে দেশি মদ। মদ নিতে আসা উদ্‌গ্রীব মুখগুলি মাঘের শেষ রাতের শীতকে উপেক্ষা করে চাদর গায়ে চুল্লির ওম নিতে নিতে নিজেদের মধ্যে গল্প করে। আগুনের তাপে শরীরের সামনের দিক স্বস্তি পেলেও বিলের হিমেল হাওয়ায় পিঠ যেন অবশ হয়ে আসে।

এককালে কান্দাবিল মানুষের অগম্য ছিল। শুধু জল আর জল। দুঃসাহসী শিকারিরা আসত বেলেহাঁস, বক বা জলজপাখি শিকার করতে। তারাই বলে বেড়াত কান্দাবিলের ওপর দিয়ে নাকি অশরীরী আত্মা ঝোড়ো বাতাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ বিশ্বাসও করত সেসব। এখন আর সেইসব দিন নেই। মানুষের প্রয়োজনের কাছে প্রকৃতি হার মেনে বিল বুজতে বুজতে এখন ঝিলে এসে ঠেকেছে। তবে সেই নির্জনতা আছে এখনও। তার সুযোগ নিয়ে, লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে গড়ে উঠেছে চোলাই মদ তৈরির ঠেক আর ইটখোলা। মদ তৈরির আদর্শ জায়গা। ভুলেও কখনো পুলিশ আসে না, মালিকের সঙ্গে থানার বন্দোবস্ত আছে।

ঝিমিয়ে আসা আগুন উস্কে দিতে ঘনশ্যাম এক বেলচা কাঁচা কয়লা চুল্লিতে ছুঁড়ে দিতেই ছাই উড়ে এসে আগুন পোহাতে থাকা মানুষগুলোর গায়ে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে। থুঃ থুঃ করতে করতে উঠে দাঁড়ায় রাধা। চাদরের ছাই ঝেড়ে বিরক্ত গলায় বলে, 'তুমি কি গো ঘনাদা, কোনো চ্যাদবোধ নেই!'

মেঘ-বাদলার দিন বাদে সারা বছরই চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লির পাশে থেকে ধোঁয়া আর কয়লার গুঁড়োয় এতদিনে গায়ের আসল রঙটাই চাপা পড়ে গেছে ঘনশ্যামের। পেটে চুল্লুর ক্রিয়া আর কঠোর পরিশ্রমে মাঘের শীতও তাকে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি ছাড়া জামা পরতে বাধ্য করাতে পারে না। অন্ধকার রাতে ভয় জাগানো কালো শরীরে দুধসাদা দাঁত বের করে, বুকে একটা আলতো চাপড় মেরে ঘনশ্যাম বলে, 'আহা হা মার দিয়া মেরা জান—ইরাম কথা তুমি বলতি পারলা রাধারানী। আমি ঘনশ্যাম আর তুমি হলে গে শ্রীমতী রাধা। কুয়ানে দুটো পিরিতির কথা বলবা, মজা মারতি ঘরে ডাইকে নে যাবা, তা নয় খালি বুকে ব্যথা দিয়ার কথা বলতিছ।'

কথাগুলির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও এটা যে নেহাতই রসিকতা তা রাধা এবং তার সঙ্গীরাও জানে। গায়ে না মেখে রাধাও রসিকতার উত্তর রসিকতা দিয়েই

ফেরায়—'তা যাতি কে বারণ করেছে। গেলে তবুও তো ছলমেয়েগুলান মামার মুখ দেখতি পায়। কতদিন যে ওরা মামারে দেখেনি, আহা রে! রাধা দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করে।

রাধাকে মুখের মতো জবাব দিতে দেখে সঙ্গীদের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে যায়। হাসি থামলে রাধার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। ঘনশ্যামের ঠাট্টাটা আর একবার ভাবে। আজ অনেকেই তাকে এরকম ঠাট্টা করার সাহস পায়। একইরকম কথা শুনতে শুনতে সে ধরেই নিয়েছে তার মতো একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারী এর চেয়ে বেশি কি আশা করতে পারে অন্য পুরুষের কাছে?

মুখবন্ধ করা জালার মধ্যে নিশাদল মেশানো ঝোলাগুড় ঝিলের জলে ডোবানো। সেগুলি থেকে অনবরত জলে বুরবুরি উঠছে। অন্যমনস্কভাবে রানীবালা সেদিকে তাকিয়ে ছিল। আজানের ধ্বনি কানে যেতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাড়া দেয় ঘনশ্যামকে, 'ও ঘনাদা আর কত দেরি করবা? ফাস্ট টেরেনটা তো ধরতে হবে নাকি?'

চুল্লির একেবারে ওপরে মস্ত হাঁড়ির ঠাণ্ডা জল কাঠি দিয়ে নাড়াতে নাড়াতে ঘনশ্যাম উত্তর দেয়, 'তা আমি কি করব? আমার তো মোডে দুখান হাত, দেখতিছ না। যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এয়েছ। এট্টুস সবুর করতি হবে।'

চুল্লির তিনটি ভাগ—নিচে আগুন, ওপরে ঠাণ্ডা জল। মাঝখানে আগুনের তাপে ঝোলাগুড় বাষ্প হয়ে উড়ছে আবার ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মদে রূপান্তরিত হয়ে সরু নলের ভিতর দিয়ে চুইয়ে বাইরে রাখা জারে জড়ো হচ্ছে। সেদিকে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থেকে শান্তস্বরে বকুল জিগ্যেস করে, 'ঘনাদা রতনারে তো দেখতেছি না।'

শান্ত স্বভাবের জন্য বকুলকে দলের সবাই অন্য চোখে দেখে, সমীহ করে। একসঙ্গে কাজ করলেও সে অন্যদের মতো কথা বলে না, আচরণেও সংযত। সঙ্গীরা বলে, 'আসলে ও পেরাইমারি ইসকুলে পড়িছে তো—তাই।'

কাজ করতে করতে ঘনশ্যাম বিড়ি টানছিল। বকুলের কথায় বিড়িটিকে খুঃ করে ঝিলের জলে বিসর্জন দিয়ে বলে, 'নাগো বকুলদি, ও আজকেরে আসেনি। ওর ছলডার মা'র দয়া হয়েছে। বামুনগাছি গেছে শেতলা মার জলপড়া আনতি। খুব জাগ্রত ঠাকুর কিনা।' ঘনশ্যাম শীতলার উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকায়। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে, 'দাঁড়াও তুমাগের বেবোস্থা করে দিচ্ছি' বলে উঁচু গলায় ডাকে, 'জগা, এ্যাই জগা! দিদিদের বেলাডারে মাল ভরে দে দিনি।'

ভোর হয়ে আসছে। শীতের সময়, তাই রাত বলে ভুল হয়। ছজনের দলটি নাইলনের থলিতে ব্লাডার ভর্তি দেশি মদ কাঁখে, হাতে ঝুলিয়ে চাদর চাপা দিয়ে যতটা সম্ভব আড়াল রেখে সন্তর্পণে হাঁটে। বড় রাস্তা থেকে ভারী ট্রাক চলার শব্দ ভেসে আসে। দুটি ঝিলের মাঝখান দিয়ে সরু পথ পেরিয়ে ইটভাঁটার স্তূপাকৃতি মাটির আড়ালে আড়ালে পাকা রাস্তার ঢালে এসে দাঁড়ায়। মানুষজন এখনও জাগেনি। রাস্তার লাইটগুলি ঘন কুয়াশার দাপটে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। অনেকক্ষণ থেকেই একটা ক্ষীণ নাম-সংকীর্তনের সুর

কানে আসছে। মনে হয় বাজারের ব্যবসায়ীমহল বাৎসরিক হরি-সংকীর্তনের আয়োজন করেছে—ভাবতে ভাবতে রাস্তা পার হতে গিয়ে ওরা থমকে দাঁড়ায়। দলনেত্রী গৌরী বলে, 'পুলিশের জিপ আসতিছে মনে হয়। তোরা সাবধান হ।' বলতে বলতে জিপ এগিয়ে আসে। কাঁটার খোঁচা অগ্রাহ্য করে দলটি নিমেষে খেজুর ঝোপে আত্মগোপন করে। হেডলাইটের তীব্র আলোয় অন্ধকার খান খান করে জিপ এগিয়ে যায়।

সোজা রাস্তায় চলা দায়, সামনেই পুলিশ চৌকি। নতুন অফিসার খুব কড়া। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে ওরা ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খালপাড়ে এসে পৌঁছয়। খাল পেরিয়ে একটু এগোলেই রেলস্টেশন। একবার ট্রেনে উঠে বসতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

থেকে থেকে একটা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কেউ মরা কুকুর বেড়াল ফেলে গেছে হয়তো। গৌরী আঘাট দিয়ে সদলে খালে নামে। জলে পা ঠেকানো মাত্র শরীরে শিহরণ বয়ে যায়। বরফ ঠাণ্ডা জল শরীরের যেখানে লাগে যেন খুবলে নিতে চায়। জল বেশি নয়, পচা পাঁকে পা ডুবে যায়। সকলেই প্রায় সমবয়সী বলে কেউ লজ্জার ধার ধারে না। কোমর অবধি কাপড় গুটিয়ে খাল পেরোয়। পাড়ে উঠে শরীরের ভিজে অংশ মুছতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর কুমড়ো ফালি চাঁদের আলোয় শিবানীর নজর গৌরীর উন্মুক্ত পাছায় পড়তেই মনে বদ মতলব বাসা বাঁধে। সে পেছন থেকে হঠাৎ গৌরীকে জড়িয়ে ধরে। অপ্রস্তুত গৌরী হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নেয়। সঙ্গীদের সাক্ষী মেনে খেঁকিয়ে ওঠে, 'দেখ তোরা মুখপুড়ি ঢ্যামনী মাগির কাণ্ডখানা। রস যেন উথলায়ি পড়তিছে। এত যদি রস তালি কাজে আসার কি দরকার ছিল, ভাতার নিয়ে শুয়ে থাকলিই পারতিস।' গৌরীর গলায় ঝাঁঝের থেকে প্রশ্রয় বেশি।

শিবানীর আচরণে আর গৌরীর উক্তিতে সকলেই খিলখিলিয়ে ওঠে।

ট্রেন আসতে এখনও কিছুটা দেরি। প্ল্যাটফর্ম ওদের পক্ষে নিরাপদ নয়। ওরা খালপাড়েই বসে এবং করার কিছু নেই বলে বাস্তব জীবনে বঞ্চিত, অন্য কোনো বিনোদনের উপায় না জানা মানুষগুলি আগের খেই ধরে নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতায় মেতে ওঠে।

সর্বকনিষ্ঠা পদ্ম মুখ খোলে, 'আর গাড় মাজাকি করতি হবে না গৌরীদি। উরাম গতর দেখলি বিশ্বামিত্র মুনি ব্যাটারও মাথা ঘুরি যেত। নাগুরা যে তোমার পেছনে ঘুরে বেড়ায়, মাজাকি মারে কই সে-বেলা তো মুখে রা নাই। শিবানী যা করিছে ঠিক করিছে।'

দলের সবাই জানে পদ্মর মুখ খারাপ। পারতপক্ষে ওকে কেউ ঘাটায় না। বিয়ের দুবছরের মাথায় রেলের তার চুরির দায়ে অনিল তিনবছরের জন্য জেলে যাওয়ার পর থেকেই মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।

পদ্মর কথার সত্যতা আছে। মধ্য চল্লিশের গৌরীর শরীর একটুও টসকায়নি। গায়ের রঙ ফর্সা। হাসলে গালে টোল পড়ে। শুধু এই শরীরের খাতিরেই অনেকবার বিপদ থেকে

উদ্ধার পেয়েছে। আগে নিজে ঘরে চোলাই তৈরি করত। মাতালের উৎপাত, পুলিশি ঝামেলায় পাড়া থেকে প্রতিবাদ উঠতেই সে-ব্যবসা তুলে দিয়েছে।

পদ্মর কথা লুফে নিয়ে শিবানী খলবলায়, 'যা বলেছিস মাইরি, ভামগুলোর জন্যি রাস্তাঘাটে চলা যায় না। যেখানে মেয়েছেলে দেখবে, শালারা সেখানেই ঘুরঘুর করবে। জামাকাপড় দেখে মোড়ে বুঝতি পারবি না ভদ্র না অভদ্র। ভিড় বাসে দাঁড়ালি শালা পাছা গরম করে ছাড়ে। যেন আর কুথাও জায়গা নাই, সব হুমড়ি খেয়ে দাঁড়ায় লেডিজ সিটের সামনে। জোয়ানগুলানের চেয়ে শুড্ডাগুলান বেশি বদমাশ।...

শিবানী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, শেষ করতে না দিয়ে রানীবালা বলে, 'অতদূর যাতি হবে না। ট্রেনে দেখতি পাস না, বাবুরা চুল্লু চুল্লু বলে চেঁচায়, নাকে রুমাল চেপে ধরে, কখনও নামায়ে দিতি চায়। কিন্তুক গায়ে হাত দিতি চায় না নোংরা লাগবে বলে। অথচ ভিড়ের মধ্যি সুযোগ পালেই চেপ্টে মারে। আমি তো বাবা হাত দুখন সব্বদা বুকির কাছে জড়ো করি রাখি।'

এতক্ষণ সকলের কথা শুনছিল বকুল। এবার স্বভাব-সিদ্ধ শান্ত স্বরে বলে, সত্যি মেয়ে মানষির জীবনে এ এক যন্তরনা। ঘরে বাইরে কোত্থাও নিরাপত্তা নাই। সেদিন দেখলি তো কি হল? ঝুপড়িতে ঢুকে জোর করি শয়তানগুলা পারুলের সব্বনাশ করি গেল। পুলিশ এল, প্রধান এল, বিচার হল? কি, না পারুল কইলকাতা শরীল বেচতি যায়। ওরে ধর্ষণ করিছে তার আবার বিচার কি?

পারুলের কথায় পরিবেশ থম মেরে যায়। তার মুখটা সকলের চোখে ভেসে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাধা বলে, 'সিডাই তো ভয় গো বকুলদি, আমার মেয়ে আছে, তোমারও আছে—কি যে হবে কে জানে।'

পদ্ম বলে, 'আমি যা বোঝার বুঝে গেছি বাবা, পুরুষ জাতটাই শালা হারামি।' একটু থেমে যেন নিজেকেই শোনায় এমনভাবে বলে, 'এট্টা লটারির টিকিট কাটিছি, বাঁধলি এই ছ্যাচড়া লাইন ছেড়ে দেব।'

বড় বড় চোখ করে গৌরী বলে, 'সে কি রে! সে তো মেলা ট্যাকা। এ্যাতো ট্যাকা নিয়ে কি করবি?'

চটজলদি জবাব পদ্মর, 'এক বস্তা চাল কেনব, এট্টা এফ এম রেডিও, আর...।' বাকিটা বলা হয় না। খালের ওপার থেকে টর্চের তীব্র আলো ওদের গায়ে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল বাজে। মুহূর্তে ওরা ছিটকে যায়।

খারাপ দিয়ে শুরু হলে সারাটা দিন একটা না একটা ঝামেলা লেগেই থাকে। ট্রেনের ঝঞ্ঝাটে আটকে পড়ে বকুল যখন বাড়ি ফেরে সূর্য হেলতে শুরু করেছে। চাতরা থেকে কুটুম এসেছে, চারজন। ননদ-ননদাই, অচেনা স্ত্রী-পুরুষ দুজন। অভাবের সংসারে চারজন লোক, স্বভাবতই বকুল মিইয়ে যায়। তবুও সৌজন্যবোধে জিগ্যেস করে, 'কখন এলে গো মীনা?'

—সেই দুকুরে। পরক্ষণে নবাগত দুজনের কানে না যায়, ফিসফিসিয়ে বলে, 'আজ ফিরতি তোমার এত দেরি হল বৌদি!'

ট্রেন গণ্ডগোলের খবর যে মীনার অজানা, এটা বুঝতে পারে বকুল। তবে যত আস্তেই হোক মীনার গলা বকুলের কাছে স্পষ্ট কৈফিয়ত চাওয়ার মতো শোনায়। প্রশ্নটাকে হাসি চাপা দিয়ে বলে, 'আসার আগে এট্টা খবর পাঠালে না কেন? খাওয়া-দাওয়া কিছু করিছ?'

—না, চান করে আসো, একসঙ্গে বসব।

খেতে খেতে কথা হয়। ঘরে মেয়ে থাকলে উদ্বিগ্ন মায়েরা যেমন পরিচিত জনেদের মেয়ের জন্য ছেলে দেখে দিতে বলে, বকুলও বলেছিল। সেই সূত্র ধরেই ননদাই তার জায়ের মামাতো ভাইয়ের জন্য একেবারে মামা-মামীকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে টিয়াকে দেখাবে বলে। বকুল কথায় কথায় জানতে পারে ছেলে মুদিখানায় কাজ করে। বয়স বত্রিশের কোঠায়। চাহিদা তেমন নেই।

তবুও বকুল বলে, 'তাহলিও আমরা মেয়ে পক্ষ, আমাদের তো জানতি হবে। দিতি পারব কিনা সিডাও তো দেখতি হবে।'

এখনও মেয়ে দেখা হল না, পছন্দ-অপছন্দর ব্যাপারটা বোঝা গেল না। মেয়ের বাপ হিসেবে সুধীরের ব্যাপারটা ভালো লাগে না। সে আমতা আমতা করে বলে, 'খাওয়া দাওয়া সেরে মেয়ে দেখে নিয়ে কথাবার্তা বললি ভালো হত না।'

—মেয়ে তো দেখবানে। আমাগেরও তো মেলা দূর যাতি হবে। কথাবার্তা হয়ে থাকলি সুবিধা। মামা কি বল?

মাছের কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে নিবারণ বলে, 'তা সে না বলার কি হল। আমাগের চাহিদা তেমন নাই। যা দেবেন আপনার মেয়ের থাকবে। তবে ছেলের জন্যি একখান সাইকেল, আংটি, ঘড়ি আর নগদ দশ হাজার। ট্যাকাটা দরকার হত না, আসলে পাঁচটা লোকের পাতে দুটো ডালভাত তো দিতি হবে, তাই।'

ছ' বছর আগে ভ্যানে চালাতে গিয়ে লরির ধাক্কায় মারা যায়নি ঠিকই, কিন্তু শিরদাঁড়া চুর চুর হয়ে কর্মক্ষমতাবিহীন জীবন্মৃত সুধীর ঘরবন্দী হয়ে বেঁচে আছে। একদিন ওষুধ না পড়লে পিঠের যন্ত্রণায় কাতরায়। সংসারে তার অবদান তো নেই-ই, বরং বকুলের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসা চালাতে গিয়ে শেষ সম্বল বসত বাড়িটুকু বিক্রি করে এখন রাস্তার ধারে ঘর তুলে আছে। রাস্তা চওড়া করার প্রয়োজনে যে কোনো মুহূর্তে উঠে যেতে হতে পারে। রোদে জলে পচে কাঠপাতার চাল, বেড়ার ঘর কাত হয়ে পড়েছে। একদিন কাজ কামাই দিলে হাঁড়ি চলে না। তবুও চারটি পেট চালাতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বকুল নিন্দনীয় পেশা বেছে নিয়েছে। এত সবের পর তার পক্ষে মেয়ের বিয়ের কথা ভাবা অসম্ভব। তবুও ভাবতে হচ্ছে মেয়ের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। কিন্তু এরা যা বলছে তা সাধ্যের বাইরে। নিবারণের কথার উত্তরে সুধীর কিছু বলতে গেলে বকুল ইশারায় থামিয়ে বলে, 'ঠিক আছে মেয়ে দেখেন, পছন্দ হলি দেখা যাবে।'

যদিও ষোলো কিন্তু বয়সের তুলনায় টিয়া বেশ লম্বা। গায়ে গত্তি নেই একটুও, তবে বেশ ফর্সা। লেখাপড়া করতে হয় না বলে সারাদিন টৈ টৈ করে ঘুরে বেড়ানোর চেহারা। বাক্স থেকে ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখানো মায়ের একটা পুরনো শাড়ি জড়িয়ে টিয়া আসরে বসে। কথাবার্তা যা হবার আগেই হয়েছে। মেয়ের নাম, বাপের নাম জিগ্যেস করার পর রূপ খুটিয়ে দেখতে গিয়ে গলায় ময়লা ছোপ, গোড়ালিতে কাদার দাগ দেখতে পেয়ে মামী বলে, 'মেয়ে তো মন্দ নয়, এট্টু যা রোগা। তবে বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবেখনি। কিন্তু মেয়ে এখনও নিজের যত্নআত্যি করতি শেখেনি।'

মা ঘরে না থাকায় কুটুমকে খাওয়াবে বলে কাদা জলে মাছ ধরতে গিয়েছিল টিয়া। তাড়াহুড়োতে ভালোভাবে তা পরিষ্কার করা হয়নি। সেদিকে তাকিয়ে কৈফিয়ত দেবার মতো করে সুধীর বলে, 'আসলে মেয়ে আমাগের কোনোদিনই তেমন সাজগোজ করতি ভালোবাসে না।'

—ওসব বলো না তো, দাদা। এসব বাপে শেখাতি যায় না। তা শেখবে কুয়ান থে। মা যেমন তেমন তো হবে। ঠেস দিয়ে কথাগুলি বলে মীনা।

বাইরের লোকের সামনে মীনার কথাগুলি বকুলের আঁতে লাগলেও হজম করে। আর যাই হোক তার সহবত বোধটুকু আছে।

নিবারণ বলে, 'তালে আপনারা ছেলে দেখতি কবে যাচ্ছেন?'

ওদের এগিয়ে দিতে দিতে সুধীর বলে, 'তা যাবানে। খবর দিয়িই যাবানে।'

ঘরের মধ্যে কুপি জেলে মায়ের গা ঘেষে স্কুলের পড়া মুখস্থ করে বাবলু। টিয়া ভাইয়ের বইগুলি অকারণে নেড়েচেড়ে হাই তোলে। একপাশে বসে আছে সুধীর। বিকেলের কথাগুলিই মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তার। গলা খাঁকারি দিয়ে বকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, 'তাহলি কি করবা ঠিক করলা।'

অবেলায় খেয়েছে বলে বসে বসে বকুলের মাথাটিও একটু একটু করে ঝুঁকছিল। সুধীরের কথায় মুখ তোলে। অবাক সুরে বলে! 'কিসির কি করব?'

বিরক্ত সুধীর বলে, 'টিয়ার বে'র কতা বলতিছি।'

—এখন কি করি হবে। আগে ট্যাকা পয়সা জোগাড় করি তবে তো।

—তালে এদের কি বলব। সুধীরের গলায় রাগের আঁচ।

নিজে চোলাই মদের সরবরাহকারী হলেও সাট্টা মদে নিবেদিত প্রাণ ননদাইকে বকুল সহ্য করতে পারে না। উপরন্তু তার আনা সম্বন্ধর ছেলেটির বয়স বেশি। দাবিও বেশি। সে এমনিতেই বিরূপ ছিল. এবার সুধীরের কথায় স্পষ্ট করে বলেই দেয়, 'না করি দেও। এখেনে আমার মত নেই। তা বাদে গঙ্গানগরের ছেলডা কি দোষ করিছে। নিজি ভ্যান রিক্সা চালায়। কিছু নেবে না। শুধু তিন হাজার নগদ চেয়েছে পুরানো ভ্যানডারে কিসব পাল্টে-টাল্টে নতুন করবে।'

সুধীর জানে সে গৃহস্বামী হলেও এই মুহূর্তে বে-রোজগারে স্বামী হিসেবে তার মতামতের মূল্য নেই বকুলের কাছে। তাছাড়া সে সর্বদা মনে করে বকুল তাকে অবজ্ঞা করে। মনে আগ্নেয়গিরি উথালপাথাল করলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলে, 'তবে সেখানে কথা বললিই তো হয়।'

—বললাম তো টাকা পয়সা হাতে আসুক। একটু থেমে আবার বলে, 'আচ্ছা তুমি এত তাড়া দিচ্ছ কেন বলতো। মেয়ের কি বের বয়স পেরোয়ে যাচ্ছে?'

খানিক গুম মেরে থেকে সুধীর বলে, 'তুমি বাড়ি থাকো না তা জানবা কি করি। কানা কেষ্ট কদিন ধরি ঘুর ঘুর করিতেছে। এই শরীল নিয়ি আমি সামলাতে পারি? এর মধ্যি একদিন তো টিয়ারে সিনেমায় নে যাতি চেয়েছিল।'

শিউরে ওঠে বকুল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পারুলের ধ্বস্ত চেহারা। কানা কেষ্ট ধর্ষণকারীদের একজন। ওদের ভয়ে পাড়ার মেয়েরা তটস্থ থাকে। কখন কার কপাল পুড়বে কেউ জানে না। পার্টির দাদাদের মদতে নির্বিচারে ওরা এসব করে, মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় বকুল দিশাহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে সঙ্কটের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো রাস্তাও সে খুঁজে পায় না।

নীরবে সময় কাটে। দুটি মানুষ যেন বোবা হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকারে রাত বাড়ে। কেশে গলাটা পরিষ্কার করে সুধীর আমতা আমতা করে বলে, 'একবার গগন দাসের কাছে ট্যাকাটা ধার হিসাবে চেয়ে দেখলি হত না।'

—দেবে না। উদাসীন বকুল বলে।

—তালি কি করবা? প্রায় চেচিয়ে ওঠে সুধীর।

বকুল নিরুত্তর।

আবার নিশ্ছিদ্র নীরবতা। অনেকক্ষণ বলি বলি করতে করতে একসময় সুধীর বলেই ফেলে, 'তাহলি হারাণবাবুর কাছেই চাও না।'

খোঁচা খাওয়া সাপিনীর মতো শিরদাঁড়া টানটান করে বকুল। চোখ দুটো জ্বলে। হারাণ নামটা তাকে বিদ্যুতের ছোবল দেয়। তার পুরানো মনিব। দুচোখে লোকটাকে দেখতে পারে না সে। হারাণ চাইলে টাকাটা হাসতে হাসতে দিয়ে দেবে, বদলে বকুলের শরীরটা তার কাছে বন্ধক রাখতে হবে। এঁটো পাত কুড়োতে লোকটার জুড়ি নেই। গগন দাস আর হারাণ দত্ত দুজনেই চুল্লু ভাটার মালিক! চরিত্রের দিক থেকে দুজন দুই মেরুর। কাজ কর, পয়সা নিয়ে যাও, ব্যস সম্পর্ক শেষ। এই হল গগন দাসের দর্শন। কিন্তু হারাণ দত্ত পয়সা বেশি দেয়। পাওনা না থাকলেও হাত পাতলেই পাওয়া যায়, তবে সে উসুল করে ছাড়ে। পেটের দায় বড় দায়। সবকিছু মেনে নিয়েই অনেকে কাজ করে। কিন্তু স্বাধীনচেতা বকুল নিজেকে বিসর্জন দিতে পারেনি। হারাণ দত্তের কু-প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত বকুল মনিবের গালে চড় মেরে কাজ ছেড়ে চলে এসেছে গগন দাসের ভাটায়। আর সুধীর কিনা তার কাছেই হাত পাততে বলছে। সে উত্তেজিত হয়ে রাগত স্বরে বলে, 'আমার পক্ষে সম্ভব না।'

—সম্ভব না বললিই তো হয় না। মেয়েডার দিকটাও তো দেখতি হবে। দৃঢ়ভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করে সুধীর।

বকুল চিৎকার করে ওঠে, 'বলতিছি তো আমি পারব না।'

—তা পারবা কেন? মেয়েডাও তোমার মতো হোক সিডাই তো চাও।

—এ তুমি কি বলতিছ? বকুলের গলায় কান্না উঠে আসে।

—ঠিকই বলতিছি। রাত থাকতে বারায়ে যাও। কুয়ানে যাও কি করো তা তো আমি দেখতি যাই না। আমি পঙ্গু মানুষ যা বোঝাও তাই বুঝি, যা শোনাও তাই শুনি। আর সতীপনা দেখাতি হবে না। যে মেয়েছেলেরা কাজে বারোয় তারা কিরাম সতী সিডা আমার জানা আছে।

আজকাল প্রায়ই সুধীর পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে। তবে এ ধরনের কথা বলবে স্বপ্নেও ভাবেনি বকুল। সে হতবাক হয়ে যায়। ছেলেমেয়ের সামনে এমন অপমান তাকে স্থবির করে দেয়। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করে, 'তুমি আমারে সন্দ করতিছ।'

—সকলে তাই বলে।

রাগ সামলাতে পারে না বকুল। বিকেলে মীনার গা-জ্বালানো কথা, সুধীরের কদর্য ইঙ্গিত তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। গলা চড়িয়ে বলে, 'তুমি এট্টা ইতর। তোমার বুন ইতর, তাই তোমরা ইরাম কথা বলতি পার! তোমার মতো জানোয়াররে গতর খাটায়ে খাওয়ায়ে আমি ভুল করিছি।'

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সুধীর তুই-তোকারি করে, 'তোর বাপ ইতর, তোর চোদ্দগুষ্টি ইতর, বেশ্যা মেয়েছেলে কুয়ানের।' অন্ধরাগে হাতের কাছের ধুনুচিটা ছুঁড়ে মারে। লক্ষ্যভ্রষ্ট মাটির ধুনুচি বাঁশের খুঁটিতে লেগে চুর চুর হয়ে ভেঙে পড়ে।

স্তম্ভিত বকুল কি করবে ভেবে পায় না। সুধীরের ওপর রাগ মেটাতে টিয়ার চুলের মুঠি টেনে ধরে। চ্যালা কাঠ দিয়ে মারতে মারতে বলে, 'পোড়ারমুখী, তোর জন্যি আমারে এত কথা শুনতি হচ্ছে। তুই মরতি পারিস না। মর্, তুই মর।'

মায়ের হাত ছাড়াতে না পেরে টিয়া পড়ে পড়ে মার খায়। চেঁচামেচিতে পড়শিরা ছুটে আসে। বকুলের হাত থেকে টিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

বকুল হাপুস নয়নে কাঁদে। সারারাত। অনেক রাতে বেদম জ্বর আসে। জ্বরের ঘোরে জ্ঞান হারায়।

ঘোরে আচ্ছন্ন থাকার পর তৃতীয় দিন সকালে চোখ মেলে বকুল। দুটো দিনের কথা কিছুই মনে করতে পারে না। তবে আবছা মনে পড়ে কেউ তাকে ওষুধ খেতে পীড়াপীড়ি করেছিল। সে আশেপাশে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পায় না। বসে বসে নিজের কথা, সেদিন রাতের কথা ভাবে। স্বামী পঙ্গু হবার পর অমানুষিক পরিশ্রম করে সংসারটাকে সচল রাখা, সুধীরের নিত্য অষুধ জোগানো—পরিবর্তে পেল স্বামীর সন্দেহ। তার সঞ্চয়ের ঘরে শূন্য। বকুলের চোখ ছাপিয়ে জল আসে। জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা জমে। যে স্বামী

স্ত্রীকে সন্দেহ করে, তার আর থাকে কি? সে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় না। থেকে থেকে মনে আত্মহত্যার চিন্তা প্রবল হয়। তার সারা চেতনায় এসে জুড়ে বসে রেললাইন। একটু হেঁটে গিয়ে মাথাটা শুধু লাইনে পেতে দেওয়া, পরমুহূর্তে চিরশান্তি। সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। মাথাটা ভার হয়ে আছে। শরীর খুব দুর্বল। প্রথমবারের চেষ্টা সফল হয় না। কিন্তু মনের জোরের কাছে শরীর হার মানে। ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে রেললাইনের উদ্দেশ্যে হাঁটে।

শীতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সূর্য দেখা যাচ্ছে না বলে বেলা আন্দাজ পায় না বকুল। ধীরে ধীরে আদাড় পেরিয়ে ক্ষেতের আল ধরে হাঁটে। ধানবিহীন মাঠে গরু চরছে। পথের ধারে খেজুর গাছে হাঁড়ি। আর একটু এগোতেই থমকে দাঁড়ায়। ডোবার কাদাজল সেঁচে মাছ ধরছে টিয়া। আলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবলু মাকে দেখতে পেয়েই ভূত দেখার মতো চমকে, 'দিদি, মা' বলেই হাতের পলিব্যাগ ফেলে ছুট দেয়। চুনো ল্যাঠাগুলি মাটিতে পড়ে ছটফট করে। টিয়াকে দেখে বকুলের শরীর জ্বলে। এই মাছ ধরার জন্য খোঁটা শুনতে হল তাকে। রাতে কি মারটাই না খেল, তবু লজ্জা নেই মেয়েটার। ইচ্ছে করে এখনই চড় মারে মেয়েটার গালে।

মাকে দেখে টিয়ার মুখ শুকিয়ে যায়। পালাবার উপায় নেই। পা যেন কাদায় গেঁথে গেছে। সে অপরাধী মুখে দাঁড়িয়ে তাকে। কিন্তু এক পা এক পা করে মাকে তার দিকে এগোতে দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় কৈফিয়ত দিতে টিয়া বলে, 'বাবা বলিল, দুদিন পর তুমি আজ ভাত খাবা, তাই।'

যন্ত্রচালিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে বকুল। পা আর সরে না। টিয়ার কথাগুলি বকুলের মনে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আনে। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে মুক্তি পেয়ে কিশোর রোদ ঝাপিয়ে পড়ে মাঠের ওপর, গাছগাছালির ওপর, বকুল-টিয়ার ওপর।

বকুলের নজর মেয়ের ওপর। সারা গায়ে কাদা। বুকের পাশটায় জামাটা ছিঁড়ে গিয়ে যৌবন উঁকি দিচ্ছে। এই প্রথম বকুলের মনে হয় সত্যিই মেয়ে তার বড় হয়ে গেছে। শেয়াল-শকুনে খাওয়ার জন্য আর ঘরে রাখা উচিত হবে না। টিয়ার পায়ের দিকে তাকাতেই কাদায় কয়েকটা ল্যাঠাকে চিড়বিড়াতে দেখে উৎসাহিত বকুল বলে, টিয়া ঐ দেখ মাছ। ঐ যে, ঐদিকে আরেকটা। তুই ধর আমি এট্টুস ঘুরে আসি।'

দূর থেকে বকুল দেখে রোদ পড়ে রেললাইন দুটি চকচক করে। সে এগিয়ে চলে। বাঁদিকে খাল পেরিয়ে ইটভাঁটা। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় গলগলিয়ে। ধোঁয়ার আড়ালে নজরে আসে হারাণ দত্তের কোঠা বাড়ি। রোদ পড়ে সাদা বাড়িটাও ঝকমক করে। হাঁটতে হাঁটতে বকুল মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। রাস্তা দুদিকে বেঁকে গেছে। মুহূর্তের ব্যবধানে মনস্থির করে বকুল রেল লাইন ছেড়ে, দৃপ্ত পায়ে খালমুখী রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়।

ফোঁস করতে নেই মানা

—বোধহয় কয়লার দামটাও উঠবে নারে সুরেন। আজ এ পথে কেউ হাঁটবে বলে মনে হয় না। কেটলির ফুটন্ত জলের দিকে তাকিয়ে গলায় আক্ষেপ ঝরে গোঁসাইর।

কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা সেই সুরেন এই মুহূর্তে তুরীয়ানন্দ। সকাল নটাতেই আকণ্ঠ গিলে এসেছে। এতক্ষণ বসে বসে ঢুলছিল। গোঁসাইর কথার উত্তরে 'অ' বলে পাশাপাশি রাখা বেঞ্চির একটিতে সটান শুয়ে পড়ে। গোঁসাই, 'ও সুরেন, সুরেন' বলে বারকয়েক ডেকে সাড়া না পেয়ে ক্ষান্ত হয়। উপায় নেই। হোক মাতাল, তবু খদ্দের লক্ষ্মী। তাড়িয়ে দিতে পারে না। এখন তো সে প্রশ্নই নেই।

টিপটিপ ঝরছে কদিন ধরেই। কিন্তু আজ সকাল থেকে নেমেছে মুষলধারে। তিন ফুট উঁচু, দু ফুট চওড়া ইটের পাতা উনুনটাকে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচাতে গোঁসাই দোকানের ঝাপটাকে একটু নামিয়ে দেয়। রাস্তার ওপারে মুখোমুখি মুদিখানা থেকে শীতল চেঁচায়,'ও গোঁসাইদা, এমন বৃষ্টি তো বাপের জন্মে দেখিনি। সব কি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নাকি?'

বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের উলটোপালটা ঝাপটায় শীতলের কথা সবটা ঠিকমতো শোনা যায় না। তবু গোঁসাই আন্দাজে উত্তর দেয়, 'খবরে বলেছে নিম্নচাপ হয়েছে। চলবে কদিন।'

বৃষ্টির জল ধানখেত ছাপিয়ে রাস্তা ছুঁই ছুঁই। এই দুর্যোগে মানুষ তো দূরের কথা, যেখানে গরু ছাগলও পথে বেরোতে ভরসা করে না সেখানে হাঁটু অবধি পা কাদায় ডুবিয়ে দুধের বালতি নিয়ে গোঁসাইর দোকানে ঢোকে লক্ষ্মী। ছাতায় বৃষ্টি আটকায়নি। ছাঁটে পরনের কাপড় ভিজে গেছে। মাথা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে। বালতি রেখে কাদামাখা পা দুটোকে টালির চাল থেকে গড়িয়ে পড়া জলে মেলে ধরে লক্ষ্মী। বৃষ্টিতে কাদা গলে গলে পড়ে।

নিটোল পায়ের গোছে নজর যায় গোঁসাইর। বুকের কাছটা চকিত চঞ্চল হলেও মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করে। একটা গামছা এগিয়ে দিয়ে বলে. 'লক্ষ্মী মাথাটা মুছে নে মা, ঠাণ্ডা লাগলে জ্বরে পড়বি যে।'

'গামছা লাগবে না' বলে অসঙ্কোচে বুকের আঁচল খসিয়ে নিংড়ে মাথা মুছতে মুছতে বলে, 'তোমরা কিগো গোঁসাই জ্যেঠা? পঞ্চায়েত এ রাস্তাটা কি জীবনেও সারাবে না?'

বিষণ্ন হেসে গোঁসাই বলে, 'তা আমি কি করে বলব বল? সবই ওপরওয়ালার মর্জি। অদৃষ্টে থাকলে হবে। তা তুই আজ এ বৃষ্টিতে না বেরোলেই তো পারতি।'

মুখ ঝামটা দেয় লক্ষ্মী, 'আমি না এলে তোমার দোকানে দুধ জোগাত কোন কমলি শুনি! আর কোয়াটারের বাবুদের বাচ্চাগুলি কি উপোস দেবে?' পরক্ষণেই গলা পালটে

বলে, 'এসবে আমার কষ্ট হয় না জ্যেঠা, কিন্তু শালার রাস্তাটাই তো খতরনাক।' বিরক্তিতে অশালীন শব্দ বেরোয় লক্ষ্মীর মুখ থেকে।

ক্ষোভ শুধু একা লক্ষ্মীর নয়, ভুক্তভোগী সকলের। বর্ষায় কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি চলার ফলে থিকথিকে কাদা। এখানে সেখানে গর্ত। রাস্তায় জল দাঁড়ালে চোরা গর্তে পড়ে মানুষ নাকাল। এ আজ তিরিশ বছর ধরে দেখছে গোঁসাই। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষ আকাশে ঘরবাড়ি বানাবার পরিকল্পনা করছে। আকাশে উপগ্রহ স্থাপন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, ঘরে বসে রিমোট কন্ট্রোলে টিভিতে নিজের আঙিনায় বিশ্বকে এনে ফেলছে। দেশে অনেক রাজা, মন্ত্রিও পালটেছে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়ম করে ভোট এসেছে, সঙ্গে প্রতিশ্রুতি—রাস্তা এবার সারাই হবেই। ভোট গেছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে রাস্তা পড়ে আছে সেই রাস্তাতেই। অথচ রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম, একবাক্যে ছোট বড় সকলেই স্বীকার করে।

রাজপথ থেকে দেড় কিলোমিটার রাস্তাটি শেষ হয়েছে ব্লকের সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উঠোনে। আশেপাশের পাঁচ ছটি আদিবাসী গ্রামের মানুষজনের একমাত্র ভরসা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। নির্জন পরিবেশে, দেবদারু আর শাল গাছের ছায়াঘেরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ঘিরে কর্মীদের কোয়ার্টার। দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া আদিবাসীদের বসতি। চার চাকার গাড়ি, যদি কখনো মহকুমা থেকে পরিদর্শক অথবা থানা থেকে তদন্তের কাজে বড়বাবুর আসার দরকার হয় তবেই ঢোকে। সব বাড়বাড়ন্ত বড় রাস্তাকে ঘিরে। মহকুমা থেকে সীমান্ত শহর, দিনরাত গাড়ি ঘোড়া ছুটছে। বিত্তবানদের জন্য রাস্তার দুধারে রয়েছে সারি সারি বাতানুকুল বেসরকারি সেবাসদন। তবে, কোন আহাম্মক যায় ঐ সরকারি হাসপাতালে? যায়, তবুও যায়। যারা নার্সিংহোমের কথা চিন্তাতেও আনতে পারে না, ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে তারাই যায়।

লক্ষ্মীর মুখঝামটা উপভোগ করে গোঁসাই। হেসে বলে, 'এসেই পড়েছিস যখন তবে একটু চা খা।'

—দাঁড়াও, আগে কোয়াটার থেকে ঘুরে আসি। বৃষ্টির বেগ একটু নরম হতেই লক্ষ্মী বেরিয়ে যায়।

লক্ষ্মীর গমনপথে তাকিয়ে একটা বড় করে শ্বাস ছাড়ে গোঁসাই। সদাহাস্য, চঞ্চলা মেয়েটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই বুকে কি ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে অভাগিনী। বাপ অনেক সাধ করে বিয়ে দিয়েছিল। স্বামীটা পাঁড় মাতাল। বছর দুই আগে নেশার ঘোরে মারপিট করে একটি চোখ আর জননেন্দ্রিয় খুইয়ে নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসে আছে। তবুও নেশা করা কমেনি। যোগান দিতে হয় লক্ষ্মীকেই। যেদিন ব্যতিক্রম হয় কপালে জোটে লাঞ্ছনা। মেয়েটার জন্য সহমর্মিতা অনুভব করলেও মাঝে মধ্যে ধন্দে পড়ে গোঁসাই। সত্যিই কি লক্ষ্মীর মনে কষ্ট? মুখ দেখে তো বোঝার উপায় নেই। বিচিত্র এই সংসারে কার যে কিসে কষ্ট, কিসে সুখ বোঝা বড় দায়। এখানেই কেউ দুধ বেচে মদ খায়, আবার কেউ তার উল্টোটা।

পরের চিন্তা ছেড়ে গোঁসাই রান্নার জোগাড়ে মন দেয়। একা মানুষ, তায় বাদলার দিন। ভাতে ভাত, আর দুধ তো আছেই। হাঁড়ি-কড়া সব পর্দার আড়ালে। এই একটাই ঘর। দিনে দোকান, রাতে আশ্রয়।

দুধ দিয়ে ফিরে হই হই করে দোকানে ঢুকে সুরেনকে দেখতে পেয়েই মেজাজ হারায় লক্ষ্মী। সুরেন তখনো বেহুঁশ। লক্ষ্মী তড়পায়, 'গোঁসাই জ্যাঠা তোমাকে কতবার বলেছি, এই আপদগুলোকে এখানে একদম জায়গা দেবে না। মাল খেয়ে আসবে আর তোমার দোকানে পড়ে পড়ে ঘুমোবে। ঘর জ্বালানো ঢ্যামনাগুলোকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারো না?'

গোঁসাই জানে লক্ষ্মী তার স্বামীর দুরবস্থার কথা মনে রেখেই আজকাল মাতালদের সহ্য করতে পারে না। বেচারার স্বামী নামেই বেঁচে আছে, দাম্পত্য সুখ তার কপালে নেই। একথা মনে হতেই কেন জানি গোঁসাই মুখ নিচু করে হাসি চাপে।

সেদিকে নজর পড়তেই তিড়বিড়িয়ে ওঠে লক্ষ্মী। গা-জ্বালানো অস্থিরতার জ্বলুনি উগড়ে দেয় গোঁসাইকে লক্ষ্য করে, 'কেন? এতে হাসির কি হল? ওরা কি তোমার ঘর ইজারা নিয়েছে নাকি।'

গোঁসাই ভালো করেই জানে, তার কথার উত্তর না পেলে লক্ষ্মী শান্ত হবে না। তাই ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের বলে, 'ভাবি তো সব কটাকে খেদিয়ে দেব। কিন্তু কি করব বল, আমি যে মুখের ওপর ওদের কিছু বলতে পারি না। বড় মায়া পড়ে গেছেরে!'

গোঁসাইর নরম কথায় লক্ষ্মীর মনটাও ভিজে যায়। কিন্তু বাইরে কঠোরতার ভাব বজায় রেখে বলে, 'ঠিকাছে, ঠিকাছে। তোমাকে খেদাতে হবে না। কিন্তু ফোঁস করতে তো পারো অন্তত।'

এবার গোঁসাই সত্যিই বেকায়দায়। তার দুচোখে বিস্ময়। একরকম তোতলাতে তোতলাতেই জিজ্ঞাসা করে, 'ফোঁস করতে?'

—নয়তো কি? তোমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছে না, ছোবল মারতে না পার, ফোঁস করতে তো পার। তুমি কি ভাব, সাঁওতাল বলে লক্ষ্মী কিছু জানে না! কেন আমার কথাবার্তা শুনে কি মনে হয় আমি অশিক্ষিত আদিবাসী?

এ কথা ঠিক, শহরে যাতায়াতের ফলে এবং পেটে ন্যূনতম কালির অক্ষর আছে বলে আদিবাসী হলেও লক্ষ্মীর কথাবার্তা মার্জিত। লক্ষ্মীর অনুযোগে গোঁসাই মিন মিন করে, 'না তা নয়। তবে...।'

—তবে আবার কি? তুমি কি কারো ধার ধারো নাকি? নিজের দোকান, মুখের উপর না বলে দেবে, ব্যস!

লক্ষ্মী তার বোধবুদ্ধিতে যা বুঝেছে, বলেছে। কিন্তু গোঁসাই যে অন্য ধাতুতে গড়া। তার সামনে কেউ অন্যায় করলেও কারো মুখের ওপর কোনোদিন কটূ কথা বলতে পারেনি। যদি পারতো তবে হয়তো তার জীবনের চিত্রটাই অন্যরকম হতো। তাহলে এই বয়সে আজ তাকে হাত পুড়িয়ে খেতে হতো না। একদিন সবই ছিল, আজ নেই কিছুই।

চল্লিশ বছর আগে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে ঘরভাড়া নিয়ে থাকত রাণাঘাটে। স্টেশনে প্লাটফর্মের ধারে ফল বিক্রি করত। বাড়ি থাকত খুব কম সময়। সেই সুযোগে যুবতী বউয়ের সঙ্গে বাড়িওয়ালার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সব বুঝেও গোঁসাই, লক্ষ্মীর ভাষায় ফোঁস করতে পারেনি। একদিন বদনাম নিয়ে বউ রেখে তাকেই বাড়িছাড়া হতে হল। বউ পাড়ার পাঁচজনকে বলল, 'সে গোঁসাইয়ের বিয়ে করা পরিবার নয়। বাংলাদেশ থেকে ফুঁসলিয়ে এনেছে।' গোঁসাই মুখ বুজে অপমান সয়ে বেরিয়ে এল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এখানে। পুরানো কথা মনে পড়ায় চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

দেখে ফেলে লক্ষ্মী। তার মনে হয় হয়তো তার কথায় গোঁসাই আঘাত পেয়েছে। সে বুঝতে পারে না কি এমন বলল যে চোখের জল ফেলতে হবে। তাই বিব্রত গলায় বলে, 'ঠিক আছে বাবা, আমি আর কিছু বলতে যাবো না। আমার ঘাট হয়েছে। তোমার পাঁঠা তুমি লেজেই কাটো আর মুড়োতেই কাটো আমার কি! মনে হয়েছিল তাই বললাম। চলি অনেক বেলা হল।' অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে লক্ষ্মী পথে নেমে হাঁফ ছাড়ে।

লক্ষ্মী বেরিয়ে গেলেও কিছু বলে না গোঁসাই। আজ আর কিছু করতেও ইচ্ছে করে না। ঠায় বসে থাকে। তলানি লেগে ভাত পোড়া গন্ধ বেরোতেই হুঁশ ফেরে তার। সে সবে উঠতে যাবে, ছুটে এসে দোকানে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে লক্ষ্মী চেঁচায়, 'শিগগির চলো গোঁসাই জ্যাঠা, সর্বনাশ হয়েছে।'

দোকান থেকে দুশো গজ দূরে রাস্তার কাদায় পড়ে রয়েছে দুজন মেয়েমানুষ। তিন চাকার মনুষ্যবাহী ভ্যান রিক্সাটি উলটে পড়ে রয়েছে ধানক্ষেতে। চালক এবং আর একজন বোধহয় মহিলাদের সঙ্গী হবে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে দুজনকে কাদা থেকে টেনে তোলার। যেহেতু মহিলা, সংকোচবশে সুবিধা করতে পারছে না সাহায্যকারীরা। লক্ষ্মীরা গিয়ে পৌঁছালে বয়স্কা মহিলাটি কেঁদে ওঠে, 'মাগো, আমার মেয়্যাটিরে আগে উঠাও। বাচ্চা হবেক। উয়ার বড় সখ হইছিল বাবুদের বউয়ের পারা হাসপাতালে বিয়ান দিবে।'

প্রসূতি কাতরাচ্ছে। প্রসব বেদনা উঠতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথে জলের নিচে চোরা গর্তে ভ্যানের চাকা পড়তেই এই বিপত্তি। আসন্নপ্রসবা ছিটকে পড়ে আর সামাল দিতে পারেনি। সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নেয় গোঁসাই। লক্ষ্মী এগিয়ে যায়। তার হাতে উঠে আসে রক্ত-ক্লেদে মাখামাখি নবজাতক।

খবর চাপা থাকে না। মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বেহাল রাস্তার জন্য ক্ষোভ ধিকি ধিকি জ্বলছিল। এবার তা ফেটে পড়ে। রাস্তার দাবিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে। কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। অন্যদিকে কিছু মানুষ বড় রাস্তার উপর বসে পড়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। মহকুমা থেকে প্রশাসনের লোক এসে রাস্তা সারানো হবে কথা দিলে তখনকার মতো অবরোধ উঠে যায়।

শীতের মরসুম। মাঠের ধান যার যেটুকু, ঘরে উঠে গেছে। নবান্ন শেষ। সন্ধ্যার পর পল্লীতে পল্লীতে শোনা যায় মাদলের দ্রিমিদ্রিমি। বাদনার প্রস্তুতি। এই সময় লক্ষ্মীর দুধ যোগান দিতে যাওয়ার সময়ের কোনো ঠিক থাকে না। ঘরদোর পরিষ্কার করা, আলপনা দেওয়া, গবাদি পশুর পরিচর্যা, পরিচিত জনেদের পরবে নেমন্তন্ন করা, হাজারো কাজ।

বেলা দশটা নাগাদ সুরেন তার দুই সাকরেদ গোবিন্দ আর রাজেনকে নিয়ে টলতে টলতে গোঁসাইয়ের দোকানে এসে ঢোকে। বাদনার দৌলতে নেশাটা মাত্রাছাড়া হয়েছে। এতক্ষণ বড় রাস্তার মোড়ে ছিল। তিনটিই কাঠ বেকার, অথচ নেশার জিনিস ভুতে ঠিক জুগিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেখে গোঁসাই কঠিন হয়। কিন্তু কিছু বলতে যাবার আগেই সুরেন আর্তকণ্ঠে বলে, 'ও গোঁসাই দাদা, দশটা টাকা দও মদ লিব।'

দুজনকে ঢুকতে দেখেই গোঁসাইর মনটা বিরূপ ছিল, নেশার টাকা যোগান দেওয়ার কথায় মেজাজ আরো বিগড়ে যায়। কঠোর কণ্ঠে 'হবে না' বলে পা বাড়াতে গেলে আচমকা সুরেন গোঁসাইর পা জড়িয়ে ধরে। নেশার ঘোরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'তুমি আমার বাপ লাগ গোঁসাই দাদা! টাকা দও।'

শক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও দুর্বল চিত্তের গোঁসাই আরো দুর্বল হয়। দশ টাকা গুনাগার দিয়ে রেহাই পায়।

দুপুরবেলা খবরটা শীতলের মুখ থেকে শোনে গোঁসাই। সে শহরে গিয়েছিল দোকানের মাল কিনতে। ফিরে এসে বলে, 'গোঁসাইদা লরি থেকে ইট নামাচ্ছে। রাস্তা তৈরি হবে গো। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।' সে এমনভাবে বলে যেন লটারির লাখ টাকার পুরস্কারটা তার কপালেই জুটেছে।

খুশির খবরটা গোঁসাইকেও কম উদ্বেল করে না। তার তো চোখ ফেটে জল আসার যোগাড়।

কদিন কুলি-কামিনদের হাঁকডাক। রাস্তার দুপাশে স্থানে স্থানে ইট স্তূপ করে রাখা, মাপজোখের পর মাটি সমান করার জন্য রোলার চলে রাস্তায়। এরপর শুধু ইট বিছানোর অপেক্ষা। গোঁসাই কল্পনায় দেখে ইট বিছানো রাস্তায় হেঁটে চলেছে মানুষ। কেউ হাসপাতাল মুখো, কেউবা শহরমুখো। আত্মীয় পরিবেষ্টিত প্রসূতি নবজাতককে কোলে নিয়ে অটো, ট্যাক্সিতে করে হাসিমুখে ঘরে ফিরছে।

লক্ষ্মীর কথা ঠেলতে না পেরে সন্ধ্যে হতে না হতেই ঝাঁপ বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ে গোঁসাই—বাদনা পরবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। লক্ষ্মী আজ লক্ষ্মীতে নেই। সেও আর সকলের মতো বাদনার আনন্দের অংশীদার হতে হাঁড়িয়ায় আক্রান্ত। গোটা পল্লীটাই তাই। গোঁসাইকে পেয়ে লক্ষ্মী চড়াও হয়। হাঁড়িয়া খেতে জোরাজুরি করে। না খেলে খারাপ দেখায়, শুধু সঙ্গ দিতেই এই ষাট বছর বয়সেও গোঁসাইকে চেখে দেখতে হয়। ওরা যাত্রা দেখার অনুরোধ করে রাতটা ওখানেই কাটিয়ে যেতে বলে। গোঁসাই রাজি হয় না। সে

জানে রাত যত বাড়বে হুল্লোড় তত মাত্রা ছাড়াবে। শরীর খারাপের অজুহাতে সে উঠে পড়ে। লক্ষ্মী সঙ্গে লোক দিয়ে পৌঁছে দিতে চাইলেও সে মানা করে।

আকাশে খণ্ড চাঁদের আলো জোছনা ছড়ায়। বাতাসে মহুয়ার গন্ধ। স্বল্প আলোয় পায়েচলা সরু পথ ধরে আপন মনে হেঁটে আসে গোঁসাই। মাদলের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একসময় মিলিয়ে যায়। দূরে দূরে ঝাকড়া মহুয়া গাছগুলিকে যেন মনে হয় বনাঞ্চল পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে থাকা নৈশ প্রহরী। এদিককার মাটি বড় কৃপণ। বালি আর কাঁকর মেশানো। ফসল ফলানোর অনুপযোগী। পথ চলতে কোথাও কোথাও পায়ের নিচের মাটি সরে সরে যায়।

অনেকক্ষণ ঢাল বেয়ে হাঁটে গোঁসাই। এবার চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতেই বুকে হাঁপ ধরে। এই বয়সে শরীর বেশি ধকল সইতে পারে না। সে একটু বিশ্রাম নিতে মাটিতে বসে। এখান থেকে হাসপাতালের নির্মীয়মান রাস্তাটি দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে গোঁসাইয়ের মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ কিছু একটা চোখে পড়তেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে। আবছা আলোয় কতগুলি ছায়ামূর্তির নড়াচড়া নজরে পড়ে। এতদূর থেকে ঠিক ঠাহর হয় না ওখানে কি করছে ওরা। কিছু একটা আন্দাজ করে পায়ে পায়ে নেমে আসে গোঁসাই। প্রথমে ভয়, পরে সন্দেহ। হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছে। কজন মানুষ নিঃশব্দে অথচ দ্রুত রাস্তার কাজের জন্য জড়ো করে রাখা ইটগুলি মালবাহী সাইকেল ভ্যানে তুলছে।

দ্রুত পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে যায় গোঁসাই। চেনা মানুষ। সুরেন, গোবিন্দ আর রাজেন। ওরাও এ সময়ে এখানে গোঁসাইকে দেখে ভুত দেখার আতঙ্কে চমকায়। উত্তেজনায় গোঁসাইর শরীর কাঁপে। চড়া গলায় বলে, 'এই হতচ্ছাড়ারা এত রাতে এখানে কি করছিস?' মুখোমুখি হতেই গোঁসাইর গা গুলিয়ে ওঠে। তিন জনের মুখ থেকেই তীব্র নেশার গন্ধ নাকে এসে লাগে।

গোঁসাইর প্রশ্নে ওরা চুপ করে থাকে। দুহাতে সুরেনকে ঝাঁকানি দিয়ে গোঁসাই আবার ধমকায়, 'এই সুরেন তোরা ইটগুলি ভ্যানে তুলছিস কেন? নিয়ে যাবি কোথায়?'

এবারও সুরেন নিরুত্তর। স্খলিত পায়ে এগিয়ে আসে রাজেন। জড়ানো গলায় বলে, 'এই বুড্ডা ছোড় তো। এত রাতে দিল্লাগি ভাল্লাগে না।' টেনে সুরেনকে সরিয়ে নেয় সে।

গোবিন্দ বরাবরই গোঁয়ার। সে সতেজে বলে, 'এই ইট যাবে সাহাবাবুর গোলায়।'

—সাহাবাবুর গোলায়? বিস্মিত স্বর গোঁসাইর। 'সে নিজেই তো এই ইটের সাপ্লায়ার। তবে? এই রাজেন, সত্যি করে বলতো ব্যাপার কি?'

—হ, সাহাবাবু আর পরধানবাবু বুইলছে এই ইট গোলায় পৌছাই দিলে নেশা কইরতে টাকা দিবে। হটেলে মুরগা-ভাত খাওয়্যাবে। সরল জবাব গোবিন্দর।

এর মধ্যে প্রধানও জড়িত? অবিশ্বাস্য লাগে গোঁসাইর। ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। সুরেন ইট তুলতে গেলে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে কোমর জাপটে তাকে

নিরস্ত করতে বলে, 'এই কাজ তোরা করিস না বাপ। এটা অন্যায়। একবার ভেবে দেখ রাস্তা খারাপ থাকলে মানুষের কত কষ্ট। তোরা ফিরে যা। আমি তোদের নেশার পয়সা দেব, আমি মাংসভাত খাওয়াবো।'

কোনো কথা নেশাতুর সুরেনের কানে ঢোকে না। উপরন্তু কাজে বাধা পেয়ে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। সে নিজেকে ছাড়াতে ঝটকা দিলে দুজনেই ছিটকে পড়ে। গোঁসাই উঠে বসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সুরেন তার বুকে চেপে বসেছে। হাঁড়িয়ার প্রভাবজনিত কারণ কিংবা সেদিনের প্রসূতির দুর্গতির ছবিটি মনে ভেসে ওঠার দরুণ অথবা কাপুরুষ বলে লক্ষ্মীর ধিক্কার বিবেকে আঘাত হানার জন্যই হোক গোঁসাই আর চুপ করে থাকতে পারে না। ক্রমেই একরোখা, সাহসী হয়ে ওঠে। শরীরের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে, স্বভাববিরুদ্ধভাবে চরাচর কাঁপিয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোমরা কে কোথায় আছ শিগগির আসো। চোরে ইট চুরি করে পালাচ্ছে।'

বেগতিক বুঝে গোঁসাইর চিৎকার বন্ধ করতে ভীতসন্ত্রস্ত, দিশাহারা, অনোন্যপায় সুরেনের পাঞ্জা দুটি গোঁসাইর নলি হাতড়ায়। প্রাণপণ শক্তিতে শীর্ণ দুটি হাত প্রতিরোধ গড়তে গিয়েও সবল পেশীর কাছে হার মানে। দুচোখে আঁধার ঘনিয়ে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত গোঁসাই চেঁচায়, 'চোর, চো-র, চো-র।'

অভাগিনী

টানা বৃষ্টিতে জনজীবন স্তব্ধ। সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামের জলবন্দী মানুষগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়। প্রায় নিয়ম করে প্রতি বছরের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ঠেকানোর কোনো উপায় জানা না থাকায় তারা কপালের দোহাই দিয়ে এ দুর্যোগকে পাশ কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে চায়।

বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বনবিহারী নিজের ওপর ভীষণ চটছিল। নিজের ওপরও ঠিক না, সে মনে মনে গাল পাড়ছিল নিজের নির্বুদ্ধিতাকে। আজ চার চারটে দিন সে এখানে আটকে রয়েছে। ওদিকে ভ্যান চালানো বন্ধ মানে রোজগারও বন্ধ। তাছাড়া দশ টাকা রোজ হিসেবে চারদিনের জমা তো মালিককে দিতেই হবে। পেটে টান পড়বে নির্ঘাত। তবে ভরসা এই, একার পেটের পরোয়া খুব একটা না করলেও চলে। দু-একদিন নাহয় বন্ধুবান্ধবের কাছে হাত পাতবে। সে আর এমন কি। কিন্তু কেনই বা সে এমন করবে বা করছে সেটা ভাবতে গিয়েই রাগ আরো চড়ে। তাকে তো কেউ দিব্যি দেয়নি যে কাজ কামাই দিয়ে থাকতেই হবে। তাছাড়া যার জন্য এত ভাবনা, সে তো চোখের সামনে দিব্যি এঘর ওঘর করছে। সে কি তার কথা একবারও ভাবে? যদি ভাবতো, তবে এ কয়দিনে একবার হলেও তার সামনে এসে দু-একটা সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারতো। পারতো না?

ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু বনবিহারী ঘন বৃষ্টির ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে বৃষ্টির জলে টইটম্বুর দূরের ঐ বিদ্যাধরী একটু কষ্ট করলে বারান্দা থেকেই দেখা যায়। ঘর আর নদীর মাঝে কয়েক বিঘা ফসলি জমির ব্যবধান মাত্র। বনবিহারীর বুকের মধ্যে এখন ভরা বিদ্যাধরীর উথালপাথাল।

টান কাকে বলে! বনবিহারী সেই উত্তর চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙা থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রায় শেষপ্রান্ত নফরগঞ্জে এসেছে নিমন্ত্রণ রাখতে। পিসতুতো ভাইয়ের শ্রাদ্ধে। অবনীর অপঘাত মৃত্যুর খবর পেয়ে এসেছে। পিসি অনেক করে কেঁদেকেটে ভ্যানরিক্সা ইউনিয়নের অফিসে ফোন করেছিল। বনবিহারী না করতে পারেনি। সে এসেছে। কার টানে? বনবিহারী নিজেকেই প্রশ্ন করে। পিসির টানে? উহুঁ। তবে...?

দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না বনবিহারী। সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পিসির ঘরের সামনে হাজির হয়। উৎকর্ণ হয়ে প্রথমে বোঝার চেষ্টা করে ঘরে কটি প্রাণী অবস্থান করছে। যখন অনুমানে বোঝে যে, একাধিক প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে তখন গলা খাঁকারি দিয়ে এবং পিসির অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলতে বলতে ঢোকে, 'অ পিসি, কি করত্যাছ? তোমারে এট্টা কতা বলতি এলাম।'

শোকাতুরা জননী বাদলার বিকেলে পুত্রবধূ ও দু বছরের নাতি সহ তন্দ্রাভিভূত ছিল। বনবিহারীর ডাকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বিস্রস্ত বেশ সামলাতে সামলাতে বলে, 'আয় বনো আয়, এখেনটায় বস।'

বনবিহারী আড়চোখে দেখে মাটির দেয়ালঘেরা প্রায় জানলাবিহীন আধ অন্ধকার ঘরে পিসি ছাড়াও তক্তপোষের ওপর আরো একটি প্রাণী জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। সে ইচ্ছে করেই জলচৌকিটা টেনে দরজা আগলে বসে।

পিসিও অকাল বর্ষণে বিরক্ত। কেন না গতকাল পর্যন্তও তার বাড়িতে যে দুচারজন কুটুম ছিল, ঘর কম থাকার দরুণ সবাইকেই কমবেশি অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। অবশ্য পাড়াগাঁয়ে এরকম একটু আধটু অসুবিধা প্রত্যেকেই যার যার বাড়িতে সহ্য করে। কিন্তু কুটুমবাড়ি এলে সব যেন লবাবের বেটা। বৃষ্টি ঝ্যানো আর অন্য কুথাও হয় না। অ, কি ঠেসমারা কতা। জায়গা নি তো এ্যাতো নোক বলার কি দরকার ছেল। কথাগুলি কানে বাজছিল তার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিসি বলে, 'অ বনো দেয়াডার আক্কেল দ্যাকতেছিস, আকাশডা ঝ্যানো ভেঙে পড়ত্যাছে। তা কি বলবি ঝ্যানো বলতেছেলি।'

পিসির ডাকে হুঁশ ফেরে বনবিহারীর। সে তন্ময় হয়ে এতক্ষণ অদূরে তক্তপোষে বসে থাকা আবছা অবয়বটির দিকে তাকিয়েছিল। থতমত খেয়ে বলে, 'পিসি, ম্যালা দিন হয়ে গ্যাল। ভাবতেছি, কালকেরে বাড়ি ফিরে যাব।'

—সে কি রে! তুই তো একা নোক। তুর অ্যাতো তাড়ার কি হল বল দিকি? যাবিই তো। আব কটা দিন নাহয় থেকি যা। তুই থাকলি আম্মো এট্টু ভরসা পাই। বউমাও কতা বলার এট্টা নোক পায়।

বাইরে বিকট শব্দে বাজ পড়ে। অবধারিত বিদ্যুতের আলোর ঝলক ঘরে ঢোকে। সেই আলোয় বনবিহারী দেখে পিসিমার বউমা নাম্নী অবয়বটি আচমকা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

বনবিহারী যেন এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল। পিসির কথার খেই ধরে বলে, 'হ, তুমার বউমার আমার সাথে কতা বলতি ভারী দায় ঠেকেচে। আজ চারদিন এখেনে রয়েচি। তুমার বউমা যে কতা বলতি পারে তেমন সাবুদ তো এখুনও পালাম না। আমি ভালো আচি কি মন্দ আচি, সে কতাডাও অ্যাকবার শুধোয়নি গা।'

বনবিহারীর অনুযোগ মিথ্যে নয়, পিসি তা জানে। জেনেও করার কিছু নেই বলেই বলে, 'সবই কপাল রে বনো, সবই কপাল। পুরানো কতা ছাড়ান দে। উসব ভেবি আর মন খারাপ করিস না।' জল অন্যদিকে না গড়ায়, বুদ্ধিমতী পিসি পরমুহূর্তেই প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, 'বনো, চা খাবি?'

বনবিহারী উৎফুল্ল হয়। চা করতে গেলে সে যেখানে বসে রয়েছে, তার গা ঘেঁষেই বেরোতে হবে। বলে, 'তা এট্টুস হলি মন্দ হত না।'

—তালে তুই বারান্দায় যেয়ি বস, আমি লিয়ে আসতেছি।

নিমেষে বনবিহারীর হাসিমুখে বৃষ্টিমাখা সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে উঠে যায়।

রাতের দিকে বৃষ্টিটা ধরল মনে হয়। তবে বাতাসের মাতামাতি কমেনি। বেশ বোঝা যায়, বাঁশঝাড়ের ওপর দিয়ে বাতাস যখন তার অভিযান চালায়। কুড়ি-বাইশ ফুট লম্বা বাঁশগুলিকে এক ঝটকায় শুইয়ে দেয়, আবার পরক্ষণেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। আনমনে বনবিহারী প্রকৃতির এই দৌরাত্ম্য দেখছিল। দেখছিল, কিন্তু উপভোগ করছিল না। তার মনে তখন ভাবনার ভাঙচুর। রাতে খেতে দেবার সময় বনবিহারী ছাড়া আর কেউ যেন শুনতে না পায় এমন অনুচ্চ স্বরে অথচ স্পষ্ট ভাষণে মালতি তার উদ্দেশ্যে বলেছিল, 'ঝ্যাতো তাড়াতাড়ি হয়, এখেন থেকে ঝ্যানো চলি যাওয়া হয়। নোকের সুবিধা-অসুবিধার কতাটা ভাবাও তো মানষির কত্তব্য।'

তখন থেকে বনবিহারী মালতির বলা কথাগুলি ভেবে চলেছে। ভাবছে, কিন্তু রহস্য উদ্ধার করতে পারছে না। তবে কি মালতি এটাই বোঝাতে চেয়েছে তার উপস্থিতি মালতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে? যাতে আরো দুর্বল হয়ে না পড়ে তার জন্য এই চেতাবনী? অথবা কয়েক বছর আগের নিপীড়নের জ্বালা মালতির মনে এখনও দগদগে ঘা হয়ে রয়েছে, যা এখনও সে ভুলতে পারছে না। আক্রোশে শোধ তুলতে এখান থেকে তাকে একরকম তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঘায়ের কথা মনে হতেই বনবিহারী আমূল কেঁপে ওঠে। এখনও মালতির বাঁদিকে কানের নিচে থেকে সারা গালের একদিকে পোড়া দাগ রয়ে গেছে। যতদিন বাঁচবে বনবিহারীকে ঐ পোড়া দাগ দগ্ধে দগ্ধে মারবে। অস্থিরভাবে বনবিহারী দুহাতে মুখ ঢাকে।

কপালের ফের না হলে এমন হয়! বনবিহারী ভাবে। মালতি তো একদিন তারই বউ ছিল। কপালের ফেরেই তো সে আজ পর ইস্তিরি। যাকে একদিন জড়িয়ে ধরে আদর করতে বাধা ছিল না, আজ কি না তার সঙ্গে কথা বলতে হলেও লুকিয়ে চুরিয়ে বলতে হয়। তা সে সুযোগটাও তো মালতি দিচ্ছে না। বনবিহারীর বুক থেকে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বেরিয়ে যায়। বুকটা কেমন খালি খালি লাগে। নিজেকে উদাস মনে হয়।

আট বছর আগের কথা। বনবিহারীর মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। পিসিই যোগাযোগটা করে দিয়েছিল। মালতি এ গ্রামেরই পিসির চেনাজানা মেয়ে। বনবিহারীর মায়েরও কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বনবিহারী লক্ষ্য করল বিয়ের পরপরই মা-টা কিরাম ঝ্যানো পালটি খেয়ে গ্যাল। বউডারে উঠতি বসতি খোঁটা, শাপমন্যি। বনবিহারী অনেক খুঁটিয়ে দেখেও বউয়ের খুব একটা দোষ খুঁজে পেত না। কিন্তু যেহেতু সে মায়ের মুখের ওপর কোনোদিন কথা বলেনি, এখনও সংসারে অশান্তির ভয়ে কোনো কথা বলত না। তবে কোনো কোনো দিন মায়ের ব্যবহারে যখন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতো, সেদিনই শুধু মিনমিন করে বলতো, 'এট্টুস কম বললি কি এমন ক্ষেতি হয় বল দিকি! ও পরের ঘরের মেয়ে, ভুল হলি এট্টুস মানিয়ে নিতি পার না? নিজির প্যাটের মেয়ে হলি ইরাম করতি পারতে?'

বনো বউয়ের হয়ে এত কথা বলবে ঘুণাক্ষরেও মায়ের এই ধারণা ছিল না। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পাল্টা আক্রমণে বলে,'তুই থাম দিকি ভেড়ুয়া। বউয়ের কুনো দোষই তো তুই দ্যাকতে পাস না, যত দেখিস মায়ের।'

বনবিহারী অনেক ভেবেও কিনারা পেত না মালতির ওপর মায়ের এত রাগ কিসের জন্য! পাড়ার বউদিরা বলতো, 'তুমার মায়েরে ডাক্তার দ্যাখাও। ব্যামো সারবে।'

—মাথার ব্যামো!

উমা বৌদি চোখ টিপে বলেছিল, 'না, মনের।' এর পর আরও বলেছিল 'আসলে, বউয়ির সঙ্গে তুমার এ্যাত মিলমিশ তুমার মা সহ্য করতি পারত্যাছে না।'

অবাক বনবিহারী বলেছিল, 'ধ্যাৎ, তাই কখুনো হয় নাকি?'

অর্থপূর্ণ হেসে বউদি উত্তর করেছিল,'হয় গো হয়। তুমরা উসব বুঝবে নি। আমরা মেয়েমানুষ বুঝি।'

বনবিহারী বুঝতে চায়ওনি। জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল কোনোমতে। কিন্তু একদিন মায়ের একটি ঘটনাই বনবিহারীর সঙ্গে মালতির চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল।

বনবিহারী তখন আনাজের ব্যবসায়ী। ঘুম থেকে উঠতে সেদিন মালতির একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। বেলা আটটা। বনবিহারী হাটে যাওয়ার জন্য তৈরি। স্বামীকে খেতে দেবে বলে গরম ফ্যানাভাতের থালাটা মেঝেয় রেখে কথা বলছিল মালতি। তক্কে তক্কে থাকা মা কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনোর ওপর। 'লবাবের ব্যাটা, অ্যাতো বেলা হল এখুনো হাটে যাবার নাম নি। বসে বসে মাগের সঙ্গে মসকরা করত্যাছ?'

লজ্জায় বনবিহারী রা কাড়ে না। কিন্তু অবান্তর কথায় গা জ্বলে মালতির। সে বলে, 'কি ঝা তা বলত্যাছ? ফ্যানা ভাতটা জুড়াতে দেছি, ঠাণ্ডা হলিই খেয়ে বেরোয়ে যাবে। অ্যাতো কতার কি হল?'

একে ছেলের অধিকারে হস্তক্ষেপ দ্বিতীয়ত শাশুড়ির মুখের উপর কথা বলার স্পর্ধা ক্ষেপিয়ে তোলে বনোর মাকে। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, 'কি, মার দরদ নি তো মাসির দরদ? মুখে মুখে চোপা ? আয় তুকে জন্মের মতো খাওয়াচ্ছি ফ্যানাভাত।' কেউ কিছু বোঝার আগেই বনোর মা মালতির চুলের মুঠি ধরে মুখটাকে ঠেসে ধরে গরম ফ্যানাভাতের ভিতর।

মালতির আর্ত চিৎকারে পড়শিরা ছুটে এলেও ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে।

মাস দুই পর গালের একদিকে পোড়া ঘায়ের চিহ্ন নিয়ে মালতি হাসপাতাল থেকে ফেরে। মালতির বাবা-মা মেয়েকে আর শ্বশুরবাড়িতে রাখেনি। পুলিস কেস হয়েছিল। বনো সেই যে গা ঢাকা দিয়েছিল, ফিরেছিল দুবছর বাদে মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। ততদিনে মালতি পিসতুতো ভাইয়ের বউ হয়ে গেছে। আবার একটা বড় করে শ্বাস টানে বনবিহারী।

রাত বাড়ে। ঘুম নেই বনবিহারীর চোখে। মালতির চেতাবনী কানে বাজে। কি করা উচিত ভেবে পায় না। চলে তো যেতেই পারে। তার আর কি দায়! সব তো কবেই

ঢুকেবুকে গেছে। কিন্তু গেছে কি? ধন্দ তো সেখানেও। সে বুঝতে পারে না, যদি সব ঢুকেবুকেই যাবে তবে পিসি যেই একবার ডাকলো আর অমনি ছুটে এল? কিসের জন্য? সে কি নেমতন্ন রাখতে? না কি অন্য কিছু? বুকে হাত দিয়ে সে কি বলতে পারবে যে, মালতিকে চোখের দেখা দেখবে মনে মনে একবারও সে চায়নি? তাছাড়া এ ভাবনাও তাকে পেয়ে বসে মালতিকে এখন কে দেখবে! তার পিতৃহীন দুগ্ধপোষ্য শিশুটির কি হবে! মালতির প্রতি সে যে অবিচার করেছে, শিশুটির দায়িত্ব নিতে পারলে তবু খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। এটুকু ভেবে সে একটু স্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় মালতি কি তার প্রস্তাবে সাড়া দেবে? যদি না দেয়! পরস্পর বিপরীতমুখী ভাবনায় বনবিহারী বিচলিত বোধ করে, দরদর ঘামে। সে আর ভাবতে চায় না। ভাবতে পারে না। একসময় ধীরে ধীরে তক্তপোষে গা এলিয়ে দেয়।

বর্ষণক্ষান্ত আকাশ রোদ নিয়ে এখন অনেক ঝকঝকে। বিদ্যাধরীর জলও অনেক নিচু দিয়ে বইছে। কাল যে নদী প্রায় কূল ছাপাতে চলেছিল তার প্রমাণ দিচ্ছে পাড়ের নাবালে সর্বাঙ্গে পলিমাখা গেমো গাছের জঙ্গল। অবনীর ডিঙি যেখানে বাঁধা থাকতো ছেলে কোলে সেখানে এসে দাঁড়ায় মালতি। ঘাট এখন শূন্য। এখান থেকে প্রায়ই ডিঙি ঠেলে দিয়ে মাছ ধরতে যাবার প্রাক্কালে অবনী আর কোনোদিনই বলবে না 'চলিরে বউ, কচিডারে সামলে রাখিস।' কথাগুলি মনে পড়তেই মালতির চোখ বেয়ে জল গড়ায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে, 'হ, সামলে তো রাখতিই হবে। দায় ঝ্যাখন চাপায়ে গ্যাছ সে তো করতিই হবে।'

নিজ গুণে অবনীর সংসারেও সকলের মন জয় করে নিয়েছিল মালতি। শাশুড়িও মাটির মানুষ। তাছাড়া সে তো এ গ্রামেরই মেয়ে। বনবিহারীর সঙ্গে কিছুদিনের সংসার তার কাছে তখন দুঃস্বপ্ন। সুখ যখন তার সংসারে ভরপুর তখনই আবার কপাল পুড়ল। পেশায় ধীবর অবনী আগে মহাজনের ভটভটিতে যেত মাছ ধরতে। কিন্তু দিয়েথুয়ে প্রায় কিছুই থাকতো না। পরে পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে নিজের ডিঙি নিয়েই যেত। তাতে ঝুঁকি একটু বেশি থাকলেও দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেত। স্ত্রী-পুত্রের জন্য সাধ মিটিয়ে খরচ করতে পারতো। কিন্তু এ যাত্রায় আর ফিরতে পারেনি। ঘূর্ণিতে ডিঙি তলিয়ে গেছে।

তন্ময় হয়ে মালতি এসব ভাবছিল। পেছনে পায়ের শব্দে চমক ভাঙে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দেয় কে আসতে পারে! এ সময়ে মালতিকে একা পেতে বনবিহারী এসেছে।

খানিকটা উসখুস করার পর বনবিহারী আবেগঘন গলায় মালতিকে বলে, 'একা একা এখেনে কচিডারে লিয়ে কি করত্যাছ লতি?'

বড় আদরের ডাক। বনবিহারী ঐ নামেই ডাকত। বনবিহারীর ডাক মালতিকে বিচলিত করে। সে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেও বাইরে তার প্রকাশ ঘটতে দেয় না।

বরং নিজেকে সংযত রেখে মনে মনে আরও কঠিন হয়। বনবিহারীর কথার উত্তর না দিয়ে যেমন নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনই থাকে।

নীরবে সময় কাটে। মালতির দিক থেকে সাড়া না পেয়ে অপ্রস্তুত বনবিহারী। কিন্তু সময় বয়ে যায় দেখে ভণিতা না করে সরাসরি বলে, 'যে গ্যাছে সে তো গ্যাছে, তার কতা ভেবি আর কি করবে বল? আমি বলি কি পুরানো কতা চাপান দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে চল। মা তো আর বেঁচে নি যে জ্বালাবে। তা বাদে একা একা সোমত্ত মেয়ে মান্ষির এখেনে থাকাডাও ঠিক হবেনি। তুমি কি বল?' বনবিহারী উত্তরের আশায় মালতির মুখের দিকে তাকায়।

মালতির ভাবান্তর নেই। সে ক্রমশ নিজেকে আরো কঠিন খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়।

বনবিহারী আবার শুরু করে, 'আচ্ছা, লিজের কতাডা নাহয় নাই ভাবলে, কিন্তুক কচিডার কতা তো ভাবতে হবে নিকি? তারে তো মানুষ করতি হবে। এট্টুস আট্টুস ন্যাকাপড়াও শিখাতি হবে। তারে তো আর আমাগের মতো মুক্কু রাকলে হবেনি। তা বাদে এখেনে থাকলি দলে পড়ি সেও বাপের মতোই মেছুড়ে হবে। লিশ্চয় তুমি মা হয়ি সিডা চাও না।' বলতে বলতে বনবিহারী আবেগে মালতির ছেলেকে নিতে হাত বাড়ায়।

চকিতে সরে যায় মালতি। তার দুচোখে আগুন। ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে, 'খবরদার, কচির গায়ে হাত দেবেনি। আমার কচির জন্যি কারো ভাবতে হবেনি। সে ভাবনা আমার। সে এখেনেই থাকবে। মেছুড়ে হোক ঝা হোক সে আমি বুঝব।' একদমে কথাগুলি বলে মালতি থরথর কাঁপে।

অপ্রত্যাশিত উত্তরে দমে যায় বনবিহারী। তবুও মালতিকে শান্ত হওয়ার সময় দিয়ে সহানুভূতির স্বরে আবারও বলে, 'লতি, মাথা ঠাণ্ডা করি আর এ্যাকবার ভেবে দ্যাকলে হতনি। আমি তোমার ভালোর জন্যি...'

কথা শেষ করার ফুরসত দেয় না মালতি। প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'চুপ, আর এট্টা কতাও নয়। আমার অনেক ভালো করিছ আর করতি হবে না। সাফ সাফ বলি দেলাম আর একদণ্ডও এখেনে থাকবেনি। যেখেন থেকে এয়েচো সেখেনে চলি যাও। নাহলি পাড়ার নোক ডেকে কুরুক্ষেত্তর বাঁধায়ে ছাড়ব।'

বনবিহারী তার সংসার জীবনে মালতির এমন মত্ত রূপ আগে কখনো দেখেনি। তার তেজের কাছে সে যথার্থই মিইয়ে যায়। যে পৌরুষের ওপর ভরসা করে মালতিকে আশ্বাস দিচ্ছিল, তার ছিটেফোঁটাও সে এই মুহূর্তে আর খুঁজে পায় না। বাস্তবিকই এক অসহায়তা তাকে গ্রাস করে। সে ভেতরে ভেতরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

নীরবে সময় কাটে। অনেক কথার ঝড় দুটি মনকে উথাল পাথাল করলেও কারও দিক থেকে কোন সাড়া আসে না। নির্জন নদীতীরে নির্বাক দুটি মানুষ শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ এভাবে ঝিম মেরে থাকার পর যখন বনবিহারীর উপলব্ধি হয়

যে, সে এখানে সত্যিই অবাঞ্ছিত এবং এখানে তার মতামতের কানাকড়িও দাম নেই তখন সে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। পাখিরা উড়ে চলেছে যে যার আস্তানার খোঁজে। পড়ন্ত আলোয় মালতি দেখে শক্তসমর্থ দশাসই একজন পুরুষ যেন দিন পনেরোর উপোসী শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে বাঁধের দিকে। বাঁধের ওপর উঠে মানুষটি একবার পেছন ফিরে তাকায়। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর ঢাল বেয়ে আবার চলতে শুরু করলে একসময় বাঁধের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

ভেতর থেকে ঠেলে আসা কান্নাটাকে এতক্ষণ ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণে আটকে রাখলেও বনবিহারী চোখের আড়াল হতেই মালতি সংযম হারায়। ছেলেকে বুকে চেপে ডুকরে ওঠে। কান্নার তাড়সে শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। অনেকক্ষণ কান্নার পর বেগ প্রশমিত হলে বনবিহারীর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়াকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে অথবা নিজেকে প্রবোধ দিতে যেন অদৃশ্য বনবিবিকে সাক্ষী মেনে মালতি বিড়বিড় করে, 'মাগো, বেধবা মেয়েমান্‌ষির কি কখুনও সোয়ামীর ভিটা ছেড়ি যেতি আছে? ওমা, বল না যেতি আছে!'

বৈধ ধর্ষক

কলিংয়ের শব্দ জানান দেয় দরজায় আগন্তুক। একবার নয়, বারকয়েক বাজে। জয়ন্তী দোতলার রান্নাঘর থেকে কলিংয়ের শব্দ শোনে। কিন্তু হাতজোড়া বলে নিচে নেমে দরজা খুলে দিতে পারে না। সকালের জলখাবার করবে বলে সদ্য সদ্য জল দেওয়া ময়দায় হাত ডুবিয়েছে। সে অবশ্য ধরেই নিয়েছিল প্রতাপ দরজাটা খুলে দেবে। কিন্তু দরজা খোলার শব্দ না পেয়ে সামনের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে প্রতাপ আধশোয়া, মুখটা খবরের কাগজের আড়ালে। কলিংয়ের ঘন্টা শুনে দরজা খুলে দেওয়া তো দূরের কথা, সে যে ঘন্টা শুনেছে সেটাই বোঝা যায় না তার আচরণে।

আবার কলিংয়ের মুখঝামটা। হাতের আঙুলে লেগে থাকা ময়দা তাড়াতাড়ি থালার কানায় কেচে বাধ্য হয়ে জয়ন্তী উঠে দাঁড়ায়। কাজের ব্যস্ততায় কপালের উপর চলে আসা চুলগুলি পেছনে ঠেলে, বেয়াড়া গরমের দাপটে ঘামে ভেজা মুখে আঁচল বোলাতে বোলাতে নিচে নামে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় শুনতে পায় অনুচ্চ স্বরে প্রতাপ বলছে, 'আমাকে খুঁজলে বলবে বাড়ি নেই।'

দরজায় মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। হাতে পৌরসভার কাগজপত্র। তড়িঘড়ি মুখের ঘাম মুছতে গিয়ে অজান্তে হাতের ময়দা কখন গালে লেগেছে জয়ন্তী খেয়াল করেনি। ঐ অবস্থায় তাকে দেখে ভদ্রলোক প্রথমে হেসে ফেলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। কেননা, একজন পৌরমাতাকেও যে আর পাঁচটা সংসারের মহিলাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হয়, এ ধারণাটা তার ছিল না। ফলে, অসময়ে এসে পড়ার অপরাধবোধে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে করুণ মুখে বলেন, 'আজ্ঞে, আপনি দেখছি ব্যস্ত। অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। আসলে সারা হপ্তা অফিস করতে হয়। রবিবার ছাড়া তো ছুটি পাই না।'

একজন বয়স্ক মানুষের মুখে আপনি সম্বোধন জয়ন্তীকে বিব্রত করে। সে খুবই আন্তরিকতায় বলে, 'না না কাকু, ও কথা কেন বলছেন ? আপনাদের প্রয়োজনে যখন খুশি আসবেন, আমার কোনো অসুবিধা হবে না। কি দরকার বলুন!'

ভদ্রলোক কাগজপত্রগুলি সসঙ্কোচে জয়ন্তীর দিকে বাড়িয়ে বলেন, 'জলের কানেকশনের জন্য পৌরসভায় দরখাস্ত জমা দেব, আপনার সই দরকার, তাই।'

—একটু দাঁড়ান, বলে জয়ন্তী ভেতরে গিয়ে সই এবং শিলমোহর মেরে কাগজপত্রগুলি ফেরত দেয়।

রান্নাঘরে গিয়েছে কি যায়নি, আবার কলিং। প্রতাপের হেলদোল নেই। আড়চোখে

জয়ন্তীকে দেখে খবর পড়ায় মন দেয়। অগত্যা জয়ন্তী এগিয়ে যাওয়ার মুখে প্রতাপ পুনরুক্তি করে, 'আমি কিন্তু বাড়ি নেই।'

জয়ন্তীর মুখে রাগ ও বিরক্তি একসঙ্গে ফুটে বেরোয়। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার প্রতাপকে দেখে বিশেষ কায়দায় মুখ বাঁকায়। খর চাউনিতে অবজ্ঞা বজায় রেখে নিচে নামে। দরজায় দাঁড়িয়ে মানদা—পাঁচ দরজায় বাসন মেজে সংসার চালানো, হাতে-পায়ে হাজা সমন্বিত, দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি দুটি নাবালিকার জননী। রাস্তার পাশে পৌরসভার খোলামুখ কল থেকে যেমন অবিরল গলগল করে জল বেরোয় তেমনি জয়ন্তীকে দেখেই, কলকলিয়ে ওঠে মানদা। 'হ্যাগো দিদিমণি, তোমারে যে কলাম আমারে এট্টা বিপিএল কার্ড কইর‍্যে দেও, তা তোমার তো মোটে হেলদোল নি। তা আমি গেইলাম চেয়ারমেনবাবুর কাছি। আমারে বলিল, তুমাগের কমিশনারের এট্টা সই নাগবে। তা দাও দিনি বাপু আমারে এট্টা সই।'

বিরক্ত হতে গিয়েও মানদার কথা বলার ধরনে জয়ন্তী হেসে ফেলে। বলে, 'সই দেবটা কোথায়? কাগজপত্র কিছু এনেছো?'

সে কিছুই আনেনি। আনতে হয় তাও জানে না। তবুও না দমে বলে, 'আমারে আগে বললিই হত, এট্টা কাগজ আর আনতি পারতাম না? এ আর এমন কি শক্ত কাজ?'

যা বোঝার জয়ন্তী বুঝে নিয়েছে। সে বলে, 'তুমি এক কাজ করো, বৃহস্পতিবার পৌরসভায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না—আমিই যা করার করে দেব। মনে থাকবে তো? বৃহস্পতিবার।'

পৌর প্রতিনিধি হওয়ার সুবাদে এবং সহজাত মধুর স্বভাবের জন্য জয়ন্তীকে সকাল থেকে সন্ধ্যে এমনি নানা অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে হয়। কখনো কখনো বিধানও দিতে হয়। যতটা পারে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে।

মানদাকে বিদায় করে শরীরে রাগ বয়ে জয়ন্তী প্রতাপের সামনে দাঁড়ায়। দোতলার রাস্তার পাশের ঘর। একটু জোরে কথা বললেই রাস্তার লোক শুনতে পাবে। সে কথাটা মাথায় রেখেই নিচু গলায় অথচ ঝাঁঝে জয়ন্তী বলে, 'দিনের পর দিন আমাকে দিয়ে কতগুলি মিথ্যে বলিয়ে তোমার কি লাভ বল তো! দরকার না পড়লে তো শুধু শুধু তোমার খোঁজে কেউ আসে না।'

জয়ন্তী কি বলতে চাইছে প্রতাপের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সে উত্তেজিত না হয়ে নির্বিকার বলে, 'ওদের দরকার থাকতে পারে, আমার নেই।'

স্কুল মাস্টারের মেয়ে জয়ন্তী। রাজনীতিগতভাবে একটা আদর্শে বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাস থেকেই জন প্রতিনিধি হিসেবে যতটা পারে সৎ থাকতে, সৎভাবে কাজ করতেই পছন্দ করে। কিন্তু চাইলেই সব হয় না। বিশেষ যখন নিজের ঘরেই ঘুঘুর বাসা। তাছাড়া সমাজে রাজনৈতিকক্ষমতাশীল আর যারা অসৎভাবে করে কম্মে খাচ্ছে তাদের কাজের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সে কতটা নিরাপদে থাকতে পারবে তারও নিশ্চয়তা নেই। নিজে সৎভাবে কাজ করতে গেলেও পদে পদে বাধা। আর বাধাটা প্রথমেই আসে ঘর থেকে—

প্রতাপের কাছ থেকে। সে অঞ্চলের বড় নেতা, দাপটও বেশি। পার্টির বদান্যতায় ক্ষমতাও ভোগ করে যথেষ্ট। আর ক্ষমতা আছে বলেই সবসময় তার পাশে বিশ পঞ্চাশ জন চাটুকারের ভিড় লেগেই থাকে। ফলে এই সমর্থন ধরে রাখতে প্রতাপকে সচেতনভাবে অনেক দুষ্কর্মের জন্য মদত দিতে হয় অসৎ উপায়ে উপার্জনের রাস্তাটাকে পরিষ্কার রাখতে।

হাল আমলে লোকের মুখে মুখে প্রায়ই একটা কথা বেশ শোনা যায় যে, রাজনীতিতে যে যত বড় নেতা সে ততটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। জয়ন্তীও প্রতাপের অনেক কাজই মন থেকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু এক ছাদের নিচে ঘর করতে হয় বলে মানিয়ে নিতেই হয়—ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও। তাই প্রতাপের বাঁকা উত্তরে জ্বালাধরা গায়ে জয়ন্তী বলে, 'আজ তুমি এ কথা বলার সুযোগ পাচ্ছ পার্টিদরদী ঐ মানুষগুলি ছিল বলে। আর ওদের কাঁধে ভর করেই তুমি এতদূর আসতে পেরেছ এটা ভুলে যেও না।'

প্রতাপ ধুরন্ধর রাজনীতিক। সে চায় না এই নিয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হতে। কারণ সে ভালো করেই জানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই প্রসঙ্গ অন্য খাতে বইয়ে দিতে বলে, 'বেলা তো কম হল না, এখনও সকালের টিফিনের দেখা নেই। লেকচার না ঝেড়ে কাজের কাজটা কর, তাহলেই বুঝি।'

প্রতিপক্ষের প্রতি মেয়েরা যত কঠোরতাই দেখাক, অতি বড় শত্রু হলেও যদি খাওয়ার আর্জি জানায় সম্ভবত সেখানে নরম না হয়ে পারে না। প্রতাপের কথায় আহত হলেও কথা না বাড়িয়ে জয়ন্তী রান্নাঘরে ঢোকে।

সকালের খাবার করতে সত্যিই আজ বেলা হয়েছে। বাইরের কাজের মেয়ে দুবেলা কাজ করে দিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু খাবার এখনও পর্যন্ত নিজের হাতেই তৈরি করে জয়ন্তী।

সকালে একটি মিছিলে পৌরমাতা হিসাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে জয়ন্তীকে। তার ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়ে রেলপাড়। দুঃস্থ মানুষের বসতিপূর্ণ এলাকা। সেখানে গতকাল রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতি সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করেছে সদ্য যুবতী একটি মেয়েকে। সংকটজনক অবস্থায় যুবতীটি হাসপাতালে ধুঁকছে। কানাঘুষোয় শোনা গেছে দুষ্কৃতিরা যে রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট সে দলের আঞ্চলিক নেতা প্রতাপ। স্বাভাবিক কারণেই অভিযোগের তীরটি প্রতাপের দিকে তাক করা। কিন্তু জল যাতে বেশিদূর না গড়ায়, বিরোধী পক্ষ ময়দানে নামার আগেই প্রথমে প্রতাপ, পরে জয়ন্তী সাতসকালেই রেলপাড়ের বস্তিতে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারটিকে সমবেদনা জানিয়ে এসেছে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পরিস্থিতি যাতে আয়ত্বের বাইরে চলে না যায় সেজন্য পাড়ার লোক, বিশেষ করে মহিলাদের নিয়ে মিছিল বের করেছে এবং ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে বিকেলে এ নিয়ে রেল ময়দানে জনসভা করা হবে বলে।

প্রতাপ যতই শান্ত থাকার চেষ্টা করুক কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। জয়ন্তীর বলা কথাগুলি আপাত নিরীহ মনে হলেও দহন ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। আর সেই জ্বলুনি থেকেই বিস্ফোরণ ঘটে। প্রতাপ গলা চড়ায়, 'আমিই তো ছিলাম, ঢং দেখাতে তোমাকে মিছিলে যেতে কে বলেছিল? না গেলে তো খাবার করতে এত দেরি হতো না।'

থম মেরে যায় জয়ন্তী। বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে বলে, 'তার মানে? আমি এ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমার ওয়ার্ডে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর আমি না গিয়ে ঘরে বসে থাকব? বিশেষ করে যেখানে আমাদের দলের ছেলেদের নামে কথা উঠেছে।'

বারুদ জ্বলছে। ভেতরে ভেতরে। প্রতাপ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, 'থাক, অনেক মারিয়েছ। আর কাউন্সিলারগিরি মারাতে হবে না। কাউন্সিলার! কে তোমাকে কাউন্সিলার বানিয়েছে শুনি? আমি কলকাঠি নেড়েছি বলেই আজ রোয়াব দেখাতে পারছ। শোন, পরিষ্কার বলে রাখছি আজ থেকে বাইরের কাজ নিয়ে একদম মাতামাতি করতে যাবে না। ঘরের মেয়েছেলে ঘরেই থাকবে। পৌরসভার কাজকর্ম আমিই দেখাশোনা করব। আর একটা কথা, কালকের ঘটনায় জড়িত যে ছেলেগুলিকে আমাদের দলের ছেলে বলছ তারা কোনোদিনই আমাদের ছিল না। প্রয়োজনে কাজকর্ম করে দিত, ব্যস। দল তাদের স্বীকার করে না। ফের যদি মুখে ঐ কথা শুনি তাহলে কিন্তু মুখ ভেঙে দেবো, মনে থাকে যেন কথাটা।'

জয়ন্তী হতবাক। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে যে প্রতাপ এতটা বাড়াবাড়ি করবে সে ভাবতে পারেনি। তবে একটা সত্য সে আবিষ্কার করে যে, তার জনপ্রিয়তা প্রতাপকে ইদানিং ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে। নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে বুদ্ধিজীবীরা মাঠে-ময়দানে ভাষণ দিয়ে যতই গলা ফাটাক না কেন বাস্তবে কিন্তু নারীর সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে বেশিরভাগ পুরুষ এখনও মেনে নিতে পারেনি। নাহলে তার কাউন্সিলর হওয়ার পেছনে বলতে গেলে যেখানে প্রতাপের কোনো ভূমিকাই নেই, সেখানে অহেতুক সে অপমানসূচক এত কথা শোনাতে পারতো না। সরকারি নিয়মে মহিলা সংরক্ষিত আসনে গত পাঁচ বছরের কাউন্সিলর প্রতাপের জায়গায় সে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। নিষ্ঠা, জনসংযোগ এবং কাজের মধ্য দিয়ে তার জনপ্রিয়তা প্রতাপকে ছাপিয়ে গেছে। আর এই জনপ্রিয়তাই প্রতাপের কাছে তাকে চক্ষুশূল করে তুলেছে।

অন্য কথায় না গিয়ে জয়ন্তী এটুকু না বলে পারে না, 'প্রয়োজনে যে ছেলেগুলি এতদিন তোমাদের হয়ে কাজ করে দিয়েছে, যার সুফল এখনও ভোগ করছ, তাদের অস্বীকার করতে তোমাদের বাঁধছে না? ছিঃ!'

প্রতাপের চোখে বিদ্রূপাত্মক চাউনি। বরফশীতল গলায় বলে, 'এটাই রাজনীতি।'

বিকেলের জনসভায় লোক হয়েছিল প্রচুর। যেহেতু ধর্ষণের প্রতিবাদে এই জনসভা, তাই প্রতিবাদী মানুষ ছাড়াও মজা দেখার টানেও অনেক মানুষ হাজির হয়েছিল। পৌরপ্রধান সহ অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু সকলের বক্তব্যকে ছাপিয়ে যায় প্রতাপের উপস্থাপনা। প্রতাপের অন্যান্য গুণের মধ্যে অন্যতম—বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে দর্শক-শ্রোতা ধরে রাখার ক্ষমতা ছাত্র রাজনীতি থেকেই করায়ত্ত। এখন তার ধার আরো বেড়েছে। সে বলে, 'এ আমরা কোন সমাজে

বাস করছি?' বলেই খানিক চুপ থেকে সমাবেশের ওপর চোখ বোলায়। প্রতিক্রিয়া বুঝতে সময় নেয়। এটা তার ভাষণ দেবার একটা কায়দা।

আবার শুরু করে, 'এ আমরা কোন সমাজে বাস করছি? যেখানে ঘুম থেকে উঠে প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজগুলিতে নারী হত্যা, নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, যৌন হেনস্থা, ধর্ষণ ইত্যাদির খবর দেখতে পাই। ট্রেনে, বাসে, অফিসে, আদালতে প্রত্যেকটি জায়গায় মহিলারা শ্লীলতাহানি কিংবা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। বলতে পারেন আপনারা, এ কোন সভ্য সমাজে আমরা বাস করছি?'

জনতা নিশ্চুপ। নীরবতা ভেঙে প্রতাপ শুরু করে, 'প্রশাসন কি অন্ধ না বধির হয়ে গেছে? তাদের কানে কি কোনো কথাই পৌঁছায় না? পুলিশ কি শুধু বড়লোকের স্বার্থ রক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হবে। এসব ঘটনা কি তাদের চোখে পড়ছে না। এমনকি সমাজের বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাতে ভুলে গেছেন? কারো কাছ থেকে কোনো প্রতিবাদ নেই। সব মজা দেখছে। প্রশাসন বলছে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কখনও বলছে এমনটা হতেই পারে, আবার কখনও বলছে নারীদের সচেতন হতে হবে, প্রতিবাদী হতে হবে। কিন্তু সচেতন কিভাবে হবে? প্রতিবাদ জানালে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? প্রশাসন নেবে? কেউ জানে না।

অথচ দিনের পর দিন প্রশাসনের চোখের সামনে দিয়েই গরিব ঘরের মেয়েদের, তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে, কাজ দেবার লোভ দেখিয়ে বাইরে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। পাচারের আগে ধর্ষিত হচ্ছে। আমরা জানি না মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি কতদিন চলবে। আমার বক্তব্য, প্রশাসন যাই করুক আমরা সাধারণ মানুষরা চুপ করে থাকতে পারি না। আজ আমাদের এখানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে মেয়েটির ওপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো মেয়েকেই এই লাঞ্ছনার শিকার হতে না হয় তার জন্য আসুন আমরা সমবেতভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হই। নারী আমাদের সমাজে মাতৃস্বরূপা। সেই নারীর ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদ আমাদের করতেই হবে। নইলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। কবিগুরু বলেছেন,

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

ঘন ঘন করতালিতে সভাস্থল মুখরিত হয়।

আকণ্ঠ মদ গিলে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে প্রতাপ। জামা খুলতে খুলতে জয়ন্তীর উদ্দেশ্যে জড়ানো গলায় বলে, 'আমি খেয়ে এসেছি, তুমি খেয়ে নাও।'

সারাদিনের এত পরিশ্রমের ধকল জয়ন্তীর শরীর নিতে পারেনি। শরীর খারাপ লাগাতে সে বিছানায় শুয়েছিল। প্রতাপের বলা কথাগুলি কানে গেলেও অবাক হয় না। এমনটা প্রায় প্রতিদিনই হয়। কাউন্সিলার থাকাকালীন যেদিন থেকে দু'নম্বরী পয়সা হাতে আসতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই প্রতাপের সুরা এবং নারীসঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি বেড়েছে।

অসুস্থ শরীরে জয়ন্তী পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করে। প্রতাপ শুলেও ঘুমিয়ে পড়ে না। খানিকটা উসখুস করার পর তার একটি হাত আলতো করে জয়ন্তীর শরীরের গলিঘুঁজি খুঁজে বেড়ায়। জয়ন্তী নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় জানে এরপর কি ঘটবে। মদ্যপানের মত্ততায় এই একটি খেলা অনিবার্য। তবুও সে কাতর স্বরে বলে, 'দোহাই আজকের দিনটা আমাকে রেহাই দাও। শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে।'

অনুনয়ের তোয়াক্কা প্রতাপ করে না। সে আসুরিক মত্ততায় শরীরী খেলায় মাতে।

পাশে পড়ে থাকা প্রতাপের দুচোখে পরিতৃপ্তির গাঢ় ঘুম নেমে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে জয়ন্তীর তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। মনে পড়ে, বিকেলে এই মানুষটিই রেল ময়দানের জনসভায় কত ভালো ভালো কথা বলে হাততালি কুড়িয়েছে। অথচ কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে, তার মতামতকে অগ্রাহ্য করে যা করল তাতে এই মুহূর্তে রেলপাড়ের ধর্ষিতা যুবতীটির সঙ্গে তার নিজের কোনো ফারাক খুঁজে পায় না। রিরি ঘৃণার আগুনে পুড়তে থাকা জয়ন্তীর ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে থাকা মুখোশ পড়া পিশাচটার মুখে একদলা থুথু ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু শুধুমাত্র সহবত বজায় রাখতে জয়ন্তী তা করতে পারে না। অবরুদ্ধ আক্রোশে তার শরীর কাঁপে। তখনকার মতো প্রতাপের সান্নিধ্য এড়াতে সে অবসন্ন শরীরটাকে বয়ে এনে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়।

আকাশ ছেয়ে আছে ঘন মেঘে। বর্ষণ আসন্ন। দূরে দূরে রাস্তার লাইটপোস্টগুলি থেকে বৈদ্যুতিক আলোর বিচ্ছুরণ এলাকাটুকু সামান্য আলোকিত করলেও, বৃত্তের বাইরে বাকিটা ভরে আছে গাঢ় অন্ধকারে।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জয়ন্তীর মনে এক অনিবার্য অস্থিরতা অনুভূত হয়। সকাল থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি এক এক করে তার মনের দরজায় ভিড় করে দাঁড়ায়। এ ঘটনা একদিনের নয়—প্রতিদিনের। তবুও তাকে সব মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে। কারণ অন্য কেউ নয়, যদি কিছু করেও থাকে, করেছে অগ্নিসাক্ষী রেখে সাতপাঁকে বাধা স্বামী। আর কে না জানে স্বামীরা প্রত্যেকেই এক একজন বৈধ ধর্ষক।

জয়ন্তী চোখ মুছে মনকে শক্ত করে। নিজেকে তৈরি করে পরের দিনের জন্য। তারও পরের দিনের জন্য।

লিঙ্গ-কবন্ধ

ঘর থেকে বেরনোর মুখেই অশান্তি। গ্যাস সিলিণ্ডার ডেলিভারি দিতে আসা ছেলেটির সঙ্গে তর্কাতর্কি। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, ব্যাঙ্ক, রান্নার গ্যাস, এমনকি রেশনে কেরোসিন তোলা ইত্যাদি কাজগুলো দর্শনাই এতদিন সামাল দিয়ে এসেছেন। পরাশরবাবুর সময় এবং ইচ্ছে দুটোরই প্রচণ্ড অভাব। কিন্তু কপালের ফেরে আজ তিনি জড়িয়ে গেলেন।

বুকিং থাকলেও যে সবসময় নিয়মমতো গ্যাস সিলিণ্ডার ডেলিভারি পাওয়া যায় তা নয়। অধিকাংশ সময়ই তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয় রাস্তার দিকে। একে তাকে বলে রাখতে হয় গাড়ি এলে যেন এদিকে একটু পাঠিয়ে দেয়। সিলিণ্ডারের ভ্যান দেখা গেলেই পাণ্ডারা যেমন স্টেশন থেকেই যাত্রী পাকড়াও করে, দর্শনাও একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে আসেন। অবশ্য এর জন্য বাড়তি কিছু পয়সাও গুনতে হয়। তা হোক, কিন্তু গ্যাস বাড়ন্ত হলে যে কি জ্বালা, যিনি রান্না করেন তিনিই বোঝেন। অন্য কোথাও চিত্রটা অন্যরকম থাকলেও, এ পাড়াতে দীর্ঘদিন এমনই চলে আসছে।

ব্যাপারটা জানা ছিল না পরাশরবাবুর। আর জানবেনই বা কখন? প্রায় সারাটা দিনই তো স্কুলে ছাত্র পড়ানো, বাকি সময়টা ট্যুইশনি। এভাবেই কেটে গেল জীবনের এতগুলো বছর। রিটায়ার করেছেন বছরখানেক। ফলে এখন বেশি সময় বাড়ি থাকার সুবাদে সংসারের টুকিটাকি ব্যাপারগুলো ইচ্ছে না থাকলেও ঠিক নজরে এসে যায়। যাবতীয় সামাজিক নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলা জীবনে ব্যতিক্রম দেখলেই মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষকসুলভ ঢঙে তিনি সিলিণ্ডার দিতে আসা ছেলেটিকে ধমকের সুরে বলেন, 'তোমার যা ন্যায্য দাম তাই নেবে, পনের টাকা বেশি দেব কেন?'

—না দিলে আমি সিলিণ্ডার দিতে পারব না। শান্ত স্বরে জবাব দেয় ছেলেটি।

—পারবে না মানে? এটা তো জবরদস্তি। বেনিয়ম। আমি একটা পয়সাও বেশি দেব না। দরকার হলে তোমার অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করব। দেখি দাও কিনা। বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন পরাশরবাবু।

অফিসে রিপোর্ট করার ভয় ছেলেটিকে দমাতে পাবে না। সিলিণ্ডার ডেলিভারি দিতে গিয়ে কোথায় কি হয় না হয় সব খবরই অফিস রাখে। কিন্তু গা করে না। দুর্বলতা ওদেরও আছে। ওরাও সাধারণ গৃহস্থ খদ্দেরকে বঞ্চিত করে বেশি দামে হোটেল, রেঁস্তোরাগুলিতে নিয়ম বহির্ভুতভাবে যোগান দেয়। এবং এদের দিয়েই পাঠায়। ফলে

যত রিপোর্টই অফিসে আসুক, লোকদেখানো যেটুকু না বললে নয় সেটুকুই বলে খদ্দেরদের কাছে ভালো সাজার চেষ্টা করে।

ছেলেটি মনে মনে যথেষ্ট রেগে গেলেও যেহেতু সিলিণ্ডারটি ভ্যান থেকে নামিয়ে ফেলেছে এবং কাঁধে করে অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছে, তাই ইচ্ছে না থাকলেও রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু পরাশরবাবুর কথায় নিজের মনে গজরায়, 'কি করে টাইট দিতে হয় আমিও জানি।' বলতে বলতে বেরিয়ে যায়।

দর্শনা বিপদের গন্ধ পান। পরাশরবাবু তো বলেই খালাস। এই নিয়ে ফ্যাসাদ বাঁধলে হ্যাপা সামলাতে হবে তাকেই। বেশ বিরক্তি নিয়েই বলেন, 'কি দরকার ছিল ওকে কথাগুলি বলার। ঝামেলা না পাকালে তোমার আর চলছিল না?'

মেজাজ আগেই তিরিক্ষি ছিল। দর্শনার কথার আভাসে উপদেশের ছোঁয়া। পরাশরবাবুও খেঁকিয়ে ওঠেন, 'চলছিল কি চলছিল না, সেটা বোঝ না বলেই তো. তোমাদের এগারো হাত কাপড়েও কাছা দিতে কুলোয় না।'

প্রসঙ্গ পালটে ঘটনা ব্যক্তি সংঘাতে মোড় নেয়। দর্শনাও স্বর বিকৃত করে বলেন, 'কি আমার কাছাওলা পুরুষরে। যত তেজ ঘরের মধ্যে। কই, পেনশনের অফিসে যারা তোমাকে ছ-মাস ধরে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, তাদের একটু পৌরুষটা দেখিয়ে আসো না। বুঝব মুরোদ।'

বাচনে ঝাঁঝ ছিল না, কিন্তু বিষ ছিল। বিষের জ্বালায় শরীর জ্বললেও পরাশরবাবু খোঁচাটা হজম করেন। এক্ষেত্রে নীলকণ্ঠ হওয়াটাই তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কেন না কথাটায় একরত্তি মিথ্যে নেই। আজ ক-মাস ধরে পেনশন অফিসের লোকগুলি তাকে একরকম গরু খেদান খেদিয়ে চলেছে। এ টেবিল, ও টেবিল, একতলা-তিনতলা, আজ আসুন-কাল আসুন, অফিসার আসেনি, ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—হরেক বাহানা।

লোকে বলে কাক নাকি কাকের মাংস খায় না। কিন্তু সরকারি অফিসের লোকেরা খায়। দেখেশুনে পরাশরবাবুর এখন তাই মনে হয়। দীর্ঘদিন ছাত্র পড়ানোর সুবাদে, এই অফিসেও দেখা হয়ে যায় প্রাক্তন এক ছাত্রের সঙ্গে। বেশ ভালো পদেই আছে। আশা ছিল ছাত্রেব মাধ্যমে হয়তো তাঁর কাজটা হলেও হয়ে যাবে। যদিও ছাত্রের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হতে পরাশরবাবুর আত্মসম্মানে বাঁধছিল। তবুও তিনি তাঁর শরণাপন্ন হন। ছাত্রটি সরাসরি না করেনি। অন্যকে দিয়ে ঠারেঠোরে বলিয়েছে, 'স্যার কাজটা আপনার দুদিনেই হয়ে যাবে। এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। যদি একটু আধটু মিষ্টির ব্যবস্থা....আসলে আমরা তো কিছু পেয়ে থাকি।' একে তো অশোকনগর-কলকাতা ট্রেন যাত্রার ধকল, তার উপর পুত্রসম ছাত্রের এই ব্যবহার—মানুষের উপর বিশ্বাসের ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি ঠিকই করেছেন আর নয়, আজকেই যাহোক একটা হেস্তনেস্ত করে ফিরবেন। তাতে যতদূর যেতে হয় যাবেন। কিন্তু বেরনোর মুখেই যে বিপত্তি।

যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। এরপর না বেরোলে আজ আর সাড়ে এগারোটার ট্রেনটাও পাওয়া যাবে না। কাঁধে ঝোলা, হাতে ছাতা নিয়ে পরাশরবাবু চলতি ভ্যানে উঠে পড়েন।

আজকাল মানুষের সুবিধা হয়েছে খুব, এক কদমও হাঁটতে হয় না। পকেটে রেস্ত থাকলে হাতের কাছেই ভ্যানরিক্সা, অটো হাজির—যাত্রীর অপেক্ষায়। অথচ পঁচিশ বছর আগে এই অজ পাড়াগাঁয়ে যা কল্পনাই করা যেত না।

এক কিলোমিটারের বেশি তো কম নয়, আপন মনে পেরিয়ে এসেছেন পরাশরবাবু। হঠাৎ একটা শোরগোল কানে আসতেই তিনি ঘাড় ফেরান। দৃশ্যটা তাঁর চোখ টানে। উত্তেজনায় আগুপিছু না ভেবে কলকাতা যাওয়া স্থগিত রেখে তিনি ভ্যান থেকে নেমে আসেন।

জনা দশ বারোর হিজড়ের একটা দল। তাদের হাতে মাস দেড়েকের একটি বাচ্চা। একজন বাচ্চাটাকে এক হাতে উঁচু করে এমনভাবে ধরেছে, পরাশরবাবুর অভিজ্ঞ চোখ বলছে ভবিষ্যৎ জীবনে বাচ্চাটার অঙ্গহানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু ওরা ক্রমাগত বাচ্চাটিকে নিয়ে ওরকম করছে এবং নিজেদের মধ্যে রঙ্গতামাশা করে হাততালি দিয়ে বিকৃতস্বরে সমবেত কণ্ঠে ফিল্মি গান গেয়ে নাচছে।

হিজড়েদের সাথে চোখ তুলে কথা বলা তো দূর স্থান, পরাশরবাবু জীবনে কোনোদিন মুখোমুখি পর্যন্ত হননি। দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন। ওদের অশালীন অঙ্গভঙ্গি, অশ্রাব্য গালিগালাজকে তিনি রীতিমতো ভয় করেন।

রাস্তা আর উঠোনের তফাত মাত্র একটি পাতাবাহারের বেড়া। ফলে পথচলতি বহু মানুষ উঠোনে ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। অজ্ঞতাজনিত কারণই হোক অথবা সাহসের অভাব—শিশুটির নিগ্রহ দেখেও কেউ প্রতিবাদ করে না। একসময় শিশুটি যখন যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে ওঠে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে পরাশরবাবু এগিয়ে গিয়ে সরাসরি পালের গোদাটিকে বলেন, 'তোমরা বুঝতে পাচ্ছ না যে, বাচ্চাটার কষ্ট হচ্ছে। ওকে ওর মার কোলে দিয়ে দাও।'

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা তার বয়স আনুমানিক চল্লিশ। যেন একটা আজব কথা শুনল এমনভাবে মুখে উগ্র প্রসাধন করা হিজড়েটি অপাঙ্গে পরাশরবাবুর দিকে এমনভাবে তাকায় যে, পরাশরবাবু লজ্জায় পালাবার পথ পান না। তবুও দাঁড়াতে হয় শিশুটির নির্যাতনের কথা ভেবে। হিজড়েটি চেষ্টাকৃত নরম সুরে গলায় চুকচুক শব্দ তুলে বলে, 'অ দাদু, তোমার বুকে ব্যথা লাগছে? আহা, লাগবেই তো। ত বাচ্চাটাকে তো আমরা লিতে আসি নাই গো। অর বাপটাকে আমাদের পাওনা দিয়ে দিতে বল। আমরা চলে যাই।'

শিশুটির বাপ ঘরে নেই, দাদুই এগিয়ে আসে। ছেলের ঘরের প্রথম সন্তান—নাতি। শিক্ষকতা করার দরুণ পরাশরবাবুকে আশপাশের গ্রামের মানুষরাও চেনে। সেই সুবাদে পরাশরবাবুকে সাক্ষী মেনে দাদু বলে, 'দ্যাহেন তো মাস্টার, এরা কি জুলুমডা করতিছে। আমরা জনমজুর খাটি— দিন আনি দিন খাই, তো দুহাজার ট্যাহা দেব কুয়ানথে? একটা ল্যায্য মতো চাইলি দেওয়া যায়। তবুও ধারধোর করি পাঁচশ দেব তো বলতিছি, তেনারা তাতেও রাজি হচ্ছে না। সে কোন্ বিহানে ছলডাও জন খাটতি গ্যাছে। সে বাড়ি থাকলি না হয়...।

পরাশরবাবুর কাছে এতক্ষণে চিত্রটা পরিষ্কার হয়। ওরা দু হাজারের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু ওরা রাজি না হওয়ায় চাপে ফেলতে শিশুটির উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। পরাশরবাবু দেখেন, এতগুলো লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে। কেউ কিছু বলা দূরে থাক, বরং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খেউড় শুনছে। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা মুখে পরাশরবাবু যখন কি করবেন ভাবছেন, লোকমুখে খবর পেয়ে ঠিক তখনি সত্যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ঢোকে। বাপের অপমান এবং আপন সন্তানের নির্যাতনের কথা কানে যাওয়াতে এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, কিছু শোনারও প্রয়োজন মনে করে না। এসেই হিজড়েদের উপর হামলে পড়ে। কানে আঙুল দেয়া শব্দ প্রয়োগ করে বলে, 'এই....বাচ্চারা, টাকা কি হারামে আসে যে চাইলেই দিতে হবে। একটা পয়সাও পাবি না। বেরিয়ে যা শালারা বাড়ি থেকে, নইলে খুনখারাবি হয়ে যাবে আজ।'

এতদিন মুখ খারাপ করে সহজ সরল মানুষদের বিপাকে ফেলা হিজড়েদের একচেটিয়া কৌশল বলেই সবাই মানতো। কিন্তু আজ অকথ্য খিস্তি দিয়ে সত্যেনের হিজড়েদের দিকে তেড়ে যাওয়া শুধু দর্শক নয়, উপস্থিত হিজড়েদেরও স্বপ্নের অতীত ছিল। ফলে, প্রথমটা দমে গেলেও, একজন এগিয়ে এসে শাসানির ভঙ্গিতে বলে, 'এ্যাই, এ্যাই মুখ খারাপ করছিস ক্যানো? বেশি ত্যাদরামি করলে যেখান দিয়ে বেরিয়েছিস, খচ্চরের বাচ্চা সেখান দিয়েই ঢুকিয়ে দেব মায়ের পেটে।' বলেই কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক উঠোন মানুষের সামনে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে হিজড়েটি যৌন অঙ্গভঙ্গি করে।

জড়ো হওয়া মানুষগুলি মজা উপভোগ করে। হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। সত্যেন আরো রেগে যায়। ছুটে গিয়ে উঠোনের কোণে পড়ে থাকা একটা জুতসই বাঁশ নিয়ে এসে গজরায়, 'খবরদার, খিস্তিখামারি না করে এক্ষুণি বেরোয়ে যা। না বেরোলে সব কটাকে পিটোয়ে বার করি দেব। কানা খোঁড়া হলি নাহয় কথা ছেল। এককে জনার তো হাতির মতন গতর। গতর খাটায়ে খাতি পারো না? পরের মাথায় বাড়ি মারতি মজা লাগে?'

শুনে অবাক হন পরাশরবাবু। এটা তো তারও মনের কথা। যে কথাটা একজন অশিক্ষিত মাতাল অবলীলায় গুছিয়ে বলতে পারল, যে কথাটা তার বলার কথা—অথচ তিনি একজন লেখাপড়া জানা মানুষ, জীবিকায় শিক্ষক হয়েও তা পারলেন না। শুধু তিনিই নন, অন্যায় জেনেও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন না, হেনস্থা হওয়ার ভয়ে কিংবা লোকলজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতে পাশ কাটিয়ে যান। তিনি মনে মনে সত্যেনের তারিফ না করে পারেন না।

আবার এটাও সত্যি পরাশরবাবু যখন হিজড়েদের দুর্বিষহ জীবনযাপনের কথা চিন্তা করেন তখন নরম না হয়েও পারেন না। এরা সমাজে বাস করেও সাধারণের চোখে সমাজ বহির্ভূত এক আজব জীব। এই জীবন বেছে নেওয়ার পেছনে যে সমাজের ইন্ধন রয়েছে তাও তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। হিজড়ে, নপুংসক কিংবা ক্লীব যে নামেই এদের চিহ্নিত করা হোক না কেন পরাশরবাবুর চোখে এরা প্রত্যেকেই লিঙ্গ-কবন্ধ। তা

সে যৌনাঙ্গ কর্তন স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে যেভাবেই হয়ে থাক না কেন। আসলে পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ জন্ম নেয় যারা লিঙ্গ চিহ্নে পুরুষ কিন্তু যৌন মানসিকতায় নারী। ফলে বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই এরা পড়েন চরম আতান্তরে। তখন সামাজিক বিদ্রূপ, তামাশা, যৌন নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য আপনজনদের ত্যাগ করে বাঁচার তাগিদে হিজড়ে সমাজে এসে লিঙ্গান্তরিত হয়ে তাদের একজন হয়ে যায়। পরবর্তীতে জীবন ধারণের জন্য রোজগারের পন্থা হিসাবে এরা যা বেছে নেয় তাতেই সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের সাহচর্য এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে। পাকেচক্রে পরাশরবাবু আজ এদের সান্নিধ্যে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

সত্যেনের কথা শোনার পর জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। প্রথমে ফিসফাস, পরে গুঞ্জনে পরিণত হয়। কে কবে, হিজড়েদের হাতে হাটে-বাটে, রেলস্টেশনে হেনস্থা হয়েছে এবং শুধু বুদ্ধিবলে কায়দা করে টাকা কম দিয়ে ওদের হাত গলে বেরোতে পেরেছে তারই নানা কাহিনী অতি মসৃণভাবে পল্লবিত হয়ে পরিবেশিত হতে থাকে।

প্রথমত টাকা না পাওয়ার জ্বালা, দ্বিতীয়ত সত্যেনের মারমুখী মেজাজ হিজড়েদের খেপিয়ে তোলে। 'মার দেখি খানকির ছেলে' বলে দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতেই সত্যেন নেশার ঘোরে সত্যিসত্যিই এলোপাথাড়ি বাঁশ চালাতে চালাতে এগিয়ে আসে। দু একজন জখম হয়। পালের গোদা নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে শরীরের সুরক্ষিত জায়গা থেকে মোবাইল ফোনটি বের করে, 'অ বড়বাবু গো, আমাদের মেরে ফেললো গো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি প্রমীলা বলছি। শিগগির আসো।' বলে স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করে।

এখানে আর থাকা উচিত নয়, মনে করে বেরোতে যেতেই হিজড়েদের একজনের নজরে পড়ে যান পরাশরবাবু। বুড়োটাই যত নষ্টের গোড়া ভেবে যত রাগ এসে পড়ে তার উপর। একজন তার সামনে এসে, 'দাদু, ক্যাচালটা তো ভালোই বাঁধিয়েছ। কি দরকার ছিল তোমার এখানে আসার।' বলেই সুর করে, 'মেরে আঙ্গনে মে তেরা কেয়া কাম হ্যায়' এবং অতি উৎসাহে একজন কাছা ধরে টানাটানি আরম্ভ করে। দেখাদেখি আরো কয়েকজন মিলে পরাশরবাবুকে প্রায় উলঙ্গ করে দেয়।

পাঁচজনের সামনে তাঁর পরনের কাপড় নিয়ে টানাটানি পরাশরবাবুকে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তিনি অধোবদন হয়ে পালাতে পা বাড়ান। ঠিক তখনি জনাকয়েক পুলিশ সহ বড়বাবু জিপ থেকে নামেন। সব শুনে হিজড়েদের লক্ষ্য করে বলেন, 'এই তোরা এক্ষুণি এখান থেকে যা, নইলে কিন্তু সব কটাকে ফাটকে পুরে দেব। যা, যা বলছি।'

দারোগাবাবু বলেন বটে, কিন্তু তার নির্দেশ পালন করার গরজ কেউ দেখায় না। বরং একজন এগিয়ে এসে বলে, 'যাব কেন? আগে আমাদের হকের পাওনাটা দিতে বল, তবে তো যাব।'

বড়বাবু এবার রেগে যান। বলেন, 'কথাটা কানে যায়নি না? যাবি, নাকি ব্যবস্থা করবো!'

গতিক সুবিধের নয় বুঝতে পেরে, 'যাচ্ছিরে বাবা যাচ্ছি। ঠিক আছে, পরে এসে

হিসাব বুঝে নিব। এ শেফালি, এ চামেলি চল বে, বড়বাবু যেতে বলছে।' ওরা যেতে যেতে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসে।

ততক্ষণে পরাশরবাবু কাপড় সামলে নিয়েছেন। বড়বাবুকে দেখে বলেন, 'স্যার, সেই এলেন যদি একটু আগে আসতেন!'

নেহাত সরকারি পরোয়ানা জারি রয়েছে তাই তাঁকে এখানে ছুটে আসতে হয়েছে হিজড়েদের সুরক্ষা দিতে। নইলে এই সামান্য কাজে পুলিশ নিয়ে ছুটে আসতেন না। ফলে বড়বাবুর মেজাজ এমনিতেই তিরিক্ষি ছিল, পরাশরবাবুর কথায় আরেকটু চড়ে। তিনি খেঁকুরে গলায় বলেন, 'তাতে আপনার কোন ক্ষতিটা হল?'

ম্লান হেসে পরাশরবাবু বলেন, 'স্যার, আমার কথা নাহয় ছেড়ে দিন। কিন্তু যে অত্যাচার ওরা এখানে করে গেল, ভবিষ্যতেও হয়তো অন্য কারোর ওপর করবে—ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হল স্যার! শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল না?

আগের বড়বাবু এলাকাকে হাতের তালুর মতো চিনতেন। ইনি মাস দুয়েক হল এসেছেন। এখনো এলাকার বিষয়ে সড়গড় হননি, হালচালও সমস্ত জানেন না। পরাশরবাবু তার কাছে আমজনতার একজন। ফলে বিধ্বস্ত পরাশরবাবুর দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে বলেন, 'ধুর মশাই, বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে দেখছি। এই বয়সেও হিজড়ের পেছনে লাগার লোভ সামলাতে পারেন না!'

পরাশরবাবুর মনে হল ঠাস করে একটা চড় এসে পড়ল গালে। তিনি এমনটা ভাবতে পারেননি। অপমানে অন্তর জ্বলে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন তিনি একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যারা এতক্ষণ ভিড় করে রঙ্গ দেখছিল পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়ে গেছে। তারপরও যারা অবশিষ্ট দুচারজন ছিল, আর কিছু মজা নেই ভেবে হিজড়েদের পিছু পিছু কেটে পড়েছে।

পরাশরবাবুর এখন মনে হচ্ছে বোকামিটা না করলেই পারতেন। তাহলে গাল বাড়িয়ে চড়টা খেতে হতো না। অনেক মানুষই তো ছিল, কই কেউ তো হিজড়েদের বেলেল্লাপনার প্রতিবাদ করেনি। আজকাল সবকিছু মেনে নেবার, মানিয়ে নেবার প্রবণতা যেন মানুষকে পেয়ে বসেছে। নাকি প্রতিবাদ করার মানুষই কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কে জানে! মাথাটা ঝিমঝিম করে। তিনি আর ভাবতে পারেন না।

রাতে ধুম জ্বর। জ্বরের ঘোরে পরাশরবাবু স্বপ্ন দেখেন। যে কাজটা বাস্তবে করার সাহস দেখাতে পারেননি স্বপ্নে সেটাই করেছেন, হাকিমের কাছে হিজড়েদের নামে নালিশ করে। বলেন, 'হুজুর, আমি একজন অবসৃত বিপন্ন শিক্ষক, হিজড়েদের হাতে লাঞ্ছিত, সুবিচার চাই।'

অভূতপূর্ব নালিশ। চমৎকৃত হাকিম পরাশরবাবুর দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির গলায় বলেন, 'অপরাধীর নাম? ঠিকানা?'

—জানি না হুজুর। কিছুই জানি না।

—দেখলে চিনতে পারবেন?

পরাশরবাবু সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন।

এরপর হাকিমের আদেশে একটা করে হিজড়ের দল কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালে পরাশরবাবুকে বলেন, 'দেখুন তো এর মধ্যে অপরাধী আছে কিনা?'

প্রথমে যে দলটি কাঠগড়ায় ওঠে, হিজড়ের বেশে পরাশরবাবুর প্রতিবেশি, সকালে গ্যাস সিলিণ্ডারের ছেলেটির সঙ্গে তর্কাতর্কির সময় যাদের মুখগুলি জানালায় দেখা গিয়েছিল।

পরাশরবাবু মাথা নাড়েন।

দ্বিতীয় দলে পেনশন অফিসের বাবুরা। তৃতীয় দলে পাড়ার মাস্তান আর প্রোমোটাররা। চতুর্থ দলে ছোট, বড়, মাঝারি নেতা আর থানার বড়বাবু।

এবারও পরাশরবাবু মাথা নাড়েন।

এরপরের দলটায় ছোট থেকে বড়, বড় থেকে আরো বড় নেতা, মন্ত্রীরা।

হতাশ পরাশরবাবু ঘন ঘন মাথা নাড়েন।

পরিশ্রমে ক্লান্ত, গলায় একরাশ বিরক্তি এনে পেশকার বলে, 'দেশের সমস্ত হিজড়েকেই তো তুলে এনেছি ধর্মাবতার। আর কোথায় পাবো?'

'ঠিক।' এবারে হাকিমই সন্দেহ প্রকাশ করেন, 'দেখ তো, লোকটা মাল খেয়ে আসেনি তো? দিল্লাগী করছে নাকি?'

চমকে ওঠেন পরাশরবাবু। এ কী ভাষায় কথা বলছেন মহামান্য হাকিম। মুখ তুলে কিছু বলতে যেতেই দেখেন চেয়ার খালি এবং খালি চেয়ার থেকেই নির্দেশ আসে, 'শুধু শুধু আদালতের সময় নষ্ট। বাঞ্চোতকে পোঁদে লাথ মেরে বের করে দাও।'

পেশকার মিনমিন করে, 'ধর্মাবতার, আপনি মুখ খারাপ করছেন।'

'কই? নাতো। আচ্ছা ঠিকাছে ওটা রেকর্ড থেকে কেটে দাও। তবে হ্যাঁ, হাকিম নড়ে কিন্তু হুকুম নড়ে না। বাঞ্চোতকে....।' কথা মাঝপথে থেমে যায়।

পেশকার মহামান্য হাকিমের হুকুম কার্যকর করার উদ্যোগ নিতেই কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায় পরাশরবাবুর। তিনি আড়মোড়া ভেঙে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন সকালের তরতাজা রোদে ঝলমল করছে চরাচর।

কুটুম বাড়ি

ভাদ্র মাসের ঠাঠা রোদে গা পুড়িয়ে পানু আলপথ ধরে হাঁটছে। অনেকক্ষণ। তার লম্বা ছায়া এখন পায়ের কাছে। যতদূর নজর চলে সদ্য রোয়া আমনের চারা বুকে নিয়ে চিতিয়ে পড়ে আছে বিশাল প্রান্তর। অল্প কাদাজলে দাঁড়িয়ে থাকা রোয়াগুলি বাতাসে দোলে। বর্ষণ ভালো হয়েছে, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে আর কয়েক মাস বাদে মাঠ ভরে উঠবে সোনার বরন ধানে।

দুপাশে তাকাতে তাকাতে উদোম-গা পানু হাঁটে। চাষের কাজ সারা, তাই মাঠ সুনসান। অথচ কদিন আগেও মাঠ জুড়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাকি। লাঙল দেওয়া, বীজতলা তৈরি করা, রোয়া লাগানো—হরেক কাজ। প্রায় সারা গ্রামের লোকই যেন মাঠে। রাত্রিটুকু বাদ দিয়ে সারাদিন একসঙ্গে। কাজ করতে করতে সুখ-দুঃখের কথা, প্রেম-পীড়িতের বুলি, খুনসুটি— সব। পাশাপাশি তো আর মুখ বুজে কাজ করা যায় না। তা ছাড়া রঙ্গ-তামাশায় নাকি পরিশ্রম গায়ে লাগে না। তাই মাত্র এক আলের ব্যবধানে মুষলধারা মাথায় নিয়ে কাজ করতে থাকা শ্যামলী চেঁচিয়ে বলে, ওলো দুগ্গি, পানুদার কি চোখের অসুখ করিছে নাকি? কাজ থামায়ে ড্যাবড্যাবিয়ে যে আমারে দেখে।

সব সমবয়সী, লাজের বালাই নেই। দুর্গাও উত্তর ফেরায়, 'তোমার বুকের কাপড়খান সামাল দে রাখো তালি আর দেখবে না।'

—তালি নয় বুক ঢাকলাম। মন ঢাকবানে কি দিয়ে!

হাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে দুর্গার নিদান, 'তালি আর কি করবি ঘরে নে যা। আমি বাসরের ব্যবস্থা করি দেবানে।'

পানু উপভোগ করে। যখন মেজাজ ঠিক থাকে তখন দুর্গার সব ভালো। খাটেও পুরুষ মানুষকে লজ্জায় ফেলে। চার প্রাণীর সংসারটাকে বলতে গেলে সে-ই টেনে রেখেছে। পানুর থাকা না থাকা সমান। তবে দুর্গার একটাই দোষ—জিভের ডগায় বিষ। পানু কখনো ঠাট্টাচ্ছলে যদি বলেছে, 'তোমার মা আঁতুড়ে তোমার মুখে ইট্টুস মধু দিতি পারেনি।' ব্যাস, একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। কদিন কথা বন্ধ। এখন তো কদিন জ্বরেই কাবু। আজকে তবু কোনো মতে উঠে বসেছে।

বাড়ির কথা মনে হতেই পানুর বুকের ধড়ফরানি বাড়ে। এলোমেলো পা চালাতে গিয়ে আঙুলের ফাঁকের হাজায় মুথো ঘাসের খোঁচা খেয়ে কাতরায়। গরমে ঘেমে, অসহায়ভাবে দিন পনেরোর আকাটা দাড়ির জঙ্গলে আঙুল চালায়। কদিন আগে চাষের কাজ শেষ হয়েছে—এখন সে বেকার। চলবে টানা তিন-চার মাস। অথচ ঘরে এখনই

সব বাড়ন্ত। একজন ক্ষেত মজুরের দীর্ঘদিন কাজ না থাকা কি দুর্বিসহ ভুক্তভোগী মাত্রে জানে। আজ সকালেই দুর্গা কড়ার করিয়ে নিয়েছে। চাল নিয়ে ঘরে ঢুকতে না পারলে সে যে অনর্থ বাঁধাবে তা আঁচ করেই পানুর বুকের দুরদুরানি তলপেটে এসে ঠাঁই নেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঝোপের আড়াল খুঁজতে বাধ্য হয়।

পিচমোড়া রাস্তাটা চলে গেছে মাঠের বুক চিরে। দুপ্রান্ত দু বাংলার রাজধানী শহরে গিয়ে মিশেছে। এই দুপুরে যান চলাচলও পাতলা হয়ে এসেছে। পানু পায়ে পায়ে সড়কে উঠে আসে। বড় সখ ছিল রাজধানী দুটি দেখার—হয়নি। তার দৌড়, তাও জীবনে মাত্র একবার জেলা শহর যশোর পর্যন্ত। তবে ছেলেবেলায় হাটবারে ম্যাজিক বাক্সের ফুটোয় চোখ গলিয়ে—'ইয়ে বোম্বাই শহর দেখ, কলকাতা শহর দেখ বাবুয়া' দেখেছে। বুক দুমড়ে নিঃশ্বাস পড়ে। সে কোলকাতামুখী রাস্তার দিকে তাকায়। বছর তিনেক আগে একবার কলকাতা দর্শন হতে হতেও ফসকে গেছে। তার জ্ঞাতিরা, যারা ভিটে ছেড়ে চলে গেছে কলকাতা থেকে পত্র দেয়। হাওড়ার পুলের কথা লেখে, কালিঘাটের কথা লেখে। বড় সখ ছিল।

সেবারও ঠিক এইরকম সময়েই যখন চাষের কাজ শেষ এবং সংসারে অভাব জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে দুর্গা বলেছিল, 'চল না গো পিসির বাড়ি গোবরডাঙা থেকে ঘুরে আসি।'

বিনা পাসপোর্টে যেতে পানুর মন সায় দেয়নি। অজুহাত দিতে বলেছিল, এখুন গেলি পিসি ভাববে, 'হাতে কাজ নেই, খাতি না পেয়ে এয়েছে।'

দাবড়ে উঠেছিল দুর্গা। বলেছিল, 'ভাববে ভাবুক সে আমি সামলাব, তুমি যাবে কি না বল। না গেলি আমিই ছল দুটি নে চলি যাব।'

দুর্গার দাপট আর কলকাতা দেখার সুপ্ত বাসনায় পানু নিমরাজি হয়েছিল। ঘোরা পথে ছ-ক্রোশ পায়ে হেঁটে বর্ডার পেরোতে গিয়ে পুলিশের হাতে। পাক্কা চার কুড়ি আটদিন বনগাঁ জেলে। কুটুম বাড়িই বটে। তবে মাঠ-ময়দানে চরে খাওয়া পানুর চার দেয়ালে আটকে থেকে যতটা কষ্ট হয়েছিল সুখ হয়েছিল ঢের। বিনা পরিশ্রমে নিশ্চিন্তে সময় ধরে পেটপুরে খাওয়া। আহা! পানু তন্ময় হয়ে অতীত ভাবে।

কপালের ঘাম গড়িয়ে চোখে যেতেই জ্বালা করে। মাথায় রোদের তাপ আর পেটে আগুন দুয়ে মিলে পানু কাহিল। লুঙ্গিটাকে দু ভাঁজ করে সড়ক থেকে নেমে কোণাকুণি জলা পেরিয়ে ঘরমুখো পা বাড়ায়। কারা যেন কাদা জলে মাছ ধরেছে। জলে আঁশটে গন্ধ। পানুর মনে হয় গন্ধটা যেন তার ভেতর থেকেই বেরোচ্ছে। উত্তর-তিরিশের জীবনে এ সুগন্ধের মুখ এ পোড়া কপালে আজ পর্যন্ত দেখেনি।

ঘাম জবজবে শরীরটাকে টেনে এনে পানু দাওয়ায় উঠে বসে। সাড়া পেয়ে শোয়া থেকে, অশক্ত শরীরে দুর্গা বাইরে এসে দাঁড়ায়। দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। এসময় পানুর ঘরে ফেরার কথা নয়। অন্যান্য দিন যা হয়, সকালে বেরিয়ে কাজ সেরে সন্ধ্যেবেলা যেমন জোটে নিয়ে ফেরে। অবশ্য যদি বেরোয়। গতকাল, পরশু বেরোয়নি। আজ একরকম

ঠেলেঠুলেই দুর্গা পানুকে কাজের খোঁজে পাঠিয়েছে। মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফেলে উদ্বিগ্ন গলায় দুর্গা জিগ্যেস করে, 'শরীল টরীল খারাপ করিল নাকি?'

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভ দিয়ে ঠোট ভিজিয়ে পানু কোনোমতে উচ্চারণ করে, 'বউ, এক গিলাস জল দেও দিনি।'

জল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে পানু দুর্গার মুখে দৃষ্টি ফেলে। শরীরে অভাবের ছাপ প্রকট। শাড়ির জায়গায় জায়গায় সেলাই। হাত দুটি শাঁখাবিহীন—এয়োতির চিহ্নস্বরূপ সস্তার দুটি লাল পলা মাত্র। মুখে উপোস-অসুখের মিশ্র প্রতিফলন। পানু চোখ নামিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, কি যেন বলতেছেলে।'

এক নজরে সোয়ামীর শরীরগতিক জরিপ করে দুর্গা বলে, 'চাল আনোনি?'

কথাটা কানে গেলেও না শোনার ভান করে পানু অন্য কথা তোলে। 'শালা দেয়াডা কিরাম নিদ্দয় দেখিছ বউ। রোদ্দুরে মান্ষির চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। গরমডাও পড়িছে আচ্ছা। নিঘ্যাত ওবেলা আকাশ ঢালবেনে।'

আকাশ ঢালুক না ঢালুক দুর্গার তাতে আসে যায় না। সে মা, ঘরে তার অভুক্ত দুটি নাবালক। সকালে দুটি মুড়ি ছাড়া এত বেলা অবধি পেটে কিছু পড়েনি। ভাত চাইতে বলেছে বাপ কাজের থে ফিরুক রেঁধে দেবে। কিন্তু সে সম্ভাবনা নেই দেখে সে গলা চড়িয়ে বলে, 'কানের মাথা খেয়েছ? চাল আনবা বললা যে।'

মনে মনে দুর্গার ওপর চটে যায় পানু। 'হ্যাঁ, চালের বস্তা যেন গাছে ঝুলতিছে, গেলাম আর টপাটপ পেড়ে নিয়ে আলাম।' কথাগুলি প্রায় মুখ ফসকে বেরোতে গিয়েও সামলে নিয়ে, যেন ব্যাপারটা তার কাছে জলভাত এমনভাবে বলে, 'ও চাল তো, তা কালকেরে নে আসবানে।'

পানুর উত্তরে দুর্গার কান্না পাবার জোগাড়। সে আহত চোখে বিপন্ন সুরে বলে, 'তালি ছলগুলান খাবে কি?'

বড় সংবেদনশীল প্রশ্ন। বিশেষ করে জন্মদাতার কাছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সাঁতার না জানা ডুবন্ত মানুষের অবস্থা পানুর। হাত একেবারে খালি। বিস্তর চিন্তা করেও উপায় বের করতে না পেরে লম্বা করে শ্বাস ছেড়ে অসহায় সুরে যেন খানিকটা নিজেকেই পরিত্রাণ দিতে অবান্তর প্রশ্ন করে। বলে, 'ওরা গেল কুয়ানে বল দিনি?'

—যাবে আর কমনে? হরেনের সাথি গরু চরাতি গেছে। দুর্গা কথায় ঝাঁঝ মিশিয়ে উত্তর দেয়।

খানিক ভেবে যতটা সম্ভব গলায় মধু ঢেলে পানু বলে, 'তালি এক কাজ কর না বউ, নগেনকার বাড়িখে দু মুঠো চাল ধার করে নে আসো।'

পলকে দুর্গা স্বমূর্তি ধারণ করে। বলে, 'মরে যাই, কি বায়না। বলতি পারো কত ধার নেব মান্ষির কাছ থিকে। আগেও তো এনেছি, শুধিছ? এবার গেলে আমারে তাড়ায়ে দেবে। যাতি হয় নিজি যাও, শুদুমুদু অপমান হতি আমি যাতি পারব না।'

যেখানে দায় পেটের, সময়ের ফেরে সেখানে মান-অপমান চাপা দিয়ে রাখতে হয়।

দুর্গার তড়পানিতে মনটা দমে গেলেও পানু হাল ছাড়ে না। আগের থেকেও আরো নরম করে গলায় সোহাগ ঢেলে বলে, 'রাগ করতিছ কেন বউ? তুমি হলে গে আমার মা দুগ্গা। সাখ্যাত অন্নপুণ্যা। তুমি হাত পাতলি তেনারা ফেরাতি পারবে না।'

সোয়ামীর বচনে দুর্গা লজ্জা পায়। তার ভেতরটা আদর খাওয়া বেড়ালের মতো গব্‌গর করে। রাঙা মুখে কিশোরী গলায় বলে, 'ধ্যাৎ, তুমি আমারে মা মা করনি তো। আমার লজ্জা লাগে। আমি তো তোমার বে করা বউ, তোমার পরিবার।'

তোষামোদে কাজ হয়েছে বুঝে গিয়ে পানু বলে, 'হেই দেখ, তুমি তালে কিচ্ছু জানো না। যখন সমুদ্দুর ইয়ে করার সোমায় বিষ পান করি শিব মর মর হয়েছেল, তখন তারে বুকির দুধ খাওয়ায়ে কে বাঁচায়ে ছেল? না, তার পরিবার দুগ্গা। তাতে কি তার মাগ মা হয়ে গেল? ওসব শাস্তরের কথা তুমি বুঝবে না। যাও, নগেনকার বাড়িখে ঘুরে আসো।'

ছেলে দুটির অনাহারক্লিষ্ট মুখ মনে করে এবং পানুর কথা ঠেলতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্গা রোদ মাথায় নগেনকার বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

যাতায়াতে দশ মিনিট— খালি হাতে ফিরে অসহায় গলায় দুর্গা বলে, 'কাকিমা বলিল আজকেরে লক্ষ্মীবার, চাল ধার দিতি নাই।'

পানুর বোবা দৃষ্টি মিথ্যে আশায় হোঁচট খেতে খেতে খালের জলে পথ হারায়। সে আন্দাজ করেছিল এমনটাই হবে। কাকিমা মুখের ওপর না বলতে পারেনি, কথাটা ঘুরিয়ে বলেছে।

খেদ নিয়ে দুর্গা পরতে পরতে গলা চড়ায়, 'কতবার বলিছি থাকতে রাখি খাও বেলা থাকতি হাঁটি যাও। তা আমার কথাডা কোন মনিষ্যি কানে নেয় শুনি? এবার ছলপুলে নে শুকোয়ে মর। সাধের সংসার? ইরাম সংসারে আমার দরকার নাই। সংসারের মুখে আগুন ধরায়ে যেদিক পানে দুচোখ যায় চলি যাব।' বলতে বলতে বারান্দায় রাখা থালাবাসন এক এক করে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে। শেষে ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় বসে আঁচলে চোখের কোণ মোছে।

দুর্গা সময়ে সঞ্চয় করে খেতে বলেছে। কিন্তু কাকে? পানু সে পাত্রই নয়। সে স্বভাব কুঁড়ে। যতক্ষণ ঘরে খাবার থাকবে জগদ্দল হয়ে বসে থাকবে। উপরন্তু তার বাঁধাধরা কোনো পেশা নেই। যখন যেমন—ঘরামী, জোগালি, ধানরোওয়া, ধানকাটা এমনকী বাগালি পর্যন্ত। তবে শেষের কাজটায় তার কেমন বাধো বাধো ঠেকে। তার অহমিকা— সে বারুজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। এক কালে পানের বরজ ছিল, রমরমাও ছিল। ছিল, কিন্তু পানু চোখে দেখেনি। আর ছিল বংশগত কুঁড়েমি। বিক্রি করে বসে বসে খেয়ে সব শেষ। শ্রীপান্নালাল দাস এখন একটি মাত্র খড়ের ঘরের মালিক। তাও সময়মতো খড় পাল্টাতে পারে না বলে বর্ষায় জল খেতে হয়।

একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পানুর সময় কাটে। এই মুহূর্তে দুর্গার চোখের আড়াল হতে ফিকির খোঁজে। বেলা একটু একটু করে গড়ায়। বাড়ির নাবাল দিয়ে বিশ্বনাথকে যেতে দেখে, অকারণেই গলা উঁচিয়ে ডাকে, 'ও বিশুদা, যাও কুয়ানে?'

বিশ্বনাথের কাঁধে বাঁ হাতে চেপে ধরা পাঁচ ছটি চুনো মাছ ধরার ছিপ। ডান হাতের কৌটোয় মাছের খাদ্য। সামনে এসে বেজার মুখে বলে, 'কি বলবি বল, আমার সোমায় নাই।'

পানুর বয়ে গেছে। সে খেজুরে আলাপ জমায়। 'না, বলতেছি কি মাছ ধরতি যাতিছ?'

একে ডেকে দেরি করিয়ে দেওয়া, তায় অর্থহীন কথা। বিশ্বনাথ খেঁকুরে গলায় বলে, 'তোমার কি মনে হয় টকি দেখতি যাতিছি। কানা কুয়ানের।' বলে পা বাড়াতে গিয়েও থমকায়। কি মনে করে, বোধহয় সঙ্গ পেতে বলে, 'কেন তুই যাবি?'

দিন দুপুরে পানুর হাতের নাগালে চাঁদ। দুর্গাকে বলে, 'বউ তালি কডা মাছ, ধরি নে আসি।'

দুর্গা হাসবে না কাঁদবে দিশা পায় না। অপসৃয়মান পানুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, 'তাই যাও। মাছ এনে আমার চিতায় দিও।'

সকালে ঘুম ভাঙতেই পানু পিট পিট করে তাকায়। দুর্গার সাড়া পেতে উৎকর্ণ হয়ে ব্যর্থ হয়। কাল অনেক রাত্রে নিজের বাড়িতেই চোরের মতো ঢুকেছে। দুর্গার ঘুম ভাঙিয়ে ঘরে ঢুকতে সাহসে কুলোয়নি। বারান্দায় চাটাই বিছিয়ে শুয়েছিল। সে বসে বসে হাই তুলে গতকালের কথাগুলি ভাববার চেষ্টা করে। বিকেলে বেরিয়েছিল ঠিকই মাছ ধরার নাম করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথের সঙ্গেও যায়নি। বন্ধুদের সঙ্গে চণ্ডী মণ্ডপের পিছনে তাস পিটিয়েছে সন্ধ্যে অবধি। পরে সকলে মিলে গিয়েছিল পাড়াতুতো মাসি সুরবালার বাড়ি। তার রাঙা গাইয়ের বাছুর হয়েছে— সেই উপলক্ষে গোবক্ষনাথের পূজা। কীর্তনে দোহারকি করে, পংক্তিভোজে গরম খিচুড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরেছে।

না দুর্গার কোনো সাড়া নেই। সকালের আনুষঙ্গিক কর্ম সেরে আট বছরের বাবলুকে জিগ্যেস করে, 'তোর মা কনে গেল?'

—মা! সেই ভোর ভোর দত্তগের বাড়ি চিড়া কুটতি গেছে। দাঁড়াও। বলে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে একটা বাটিতে দুটি রুটি, একটু গুড় এনে বাপকে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'মা বলিলো, রুটি কডা খেয়ি দত্তগের বাড়ি যাতি। তেনাদের বাড়ি নাকি কি কাজ রয়েছে।'

রুটি দেখে অবাক হলেও মনে মনে খুশিই হয় পানু। জিগ্যেস করে, বাবলু, রুটি পালি কুয়ান থে?'

বাবলু সঙ্গীর ডাকে খেলতে যাওয়ার ব্যস্ততায় বলতে বলতে ছোটে, 'কালকেরে মা দত্তগের বাড়িথে আনিল।'

আপাতত পানু নিশ্চিন্ত। দুর্গা বাড়ি নেই, বকাঝকারও কেউ নেই। কিন্তু দত্তবাড়ি ডেকে পাঠাল কেন? কাজের কথা ভাবতেই তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। দুপুরে দুর্গা ফেরার আগেই গুড় রুটি খেয়ে পানু সোজা বাজারমুখো।

আড্ডা জমেছে তারিণীর চায়ের দোকানে, জনা পাঁচ-ছয়ে মিলে। পানুকে

দেখতে পেয়ে তারিণী অনুনয়ের সুরে বলে, 'পানু যা না বাবা, টিপ কল থে দু টিন জল এনে দে।'

দ্বিরুক্তি না করে পানু খুড়োর কাজ করে দেয়। সে ভালোই জানে, বিনিময়ে চা-বিস্কুট জুটবে।

আলোচনা হচ্ছিল এ বছরের চাষের ভালোমন্দ নিয়ে। আলোচকরা পানুর সতীর্থ—মাঠে ঘাটে খেটে খাওয়া জনমজুর। অমূল্য কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'তুমি যাই বল তারিণী কা, ফসল এ মরসুমে ভালো হবেই। বিধু ঠাকুর, ঐ যে গো যার বাড়িতে মা শেতলার থান রয়েছে, বলেছে মা দুগ্গা এবার হাতিতে আসতেছে, যাবে ঘোড়ায়। দু হাত ভরে দে যাবেনে।'

তাচ্ছিল্যে সদানন্দ ঠোঁট ওল্টায়, 'বেল পাকলি কাগের কি? আমাগের কি ফয়দা? যা লাভ হবার তা মহাজনেরই হবে। আমাগের ঐ ফুটো কড়ি। আরে শালা মজুরির ব্যাপারটা দেখ না। গরমেন বাঁধি দিল এক, দালালের হাত ঘুরে, আমরা পাই আদ্দেক। পিতিবাদ করলি, কাজ করতি হবে না। অন্য জাগাখে লোক এনে করাব বলে ভয় দেখায়।'

কানের বিড়ি দাঁতে চেপে, উনুনে কাগজ ধরিয়ে বর্ষীয়ান ইমানুল বলে, 'ইডা একটা হক কথা বলিছ সদা ভাই। ছোটবেলায় তো আমাগের বাপ-চাচাদের দেখিছি, তেনারা দিনভর ক্ষেত-খামারে কাজ করি ভাটিবেলা মনিবের বাড়ি খেয়ে মজুরি নে ঘরে ফিরত। সে ছেল বটে দিনকাল।'

আলোচনা রাজনীতিতে মোড় নিয়ে সিনেমায় গিয়ে ঠেকে। বেলা বাড়ছে দেখে তারিণী শেষ পর্যন্ত বারবার তাগাদা দিয়ে সবগুলিকে বাড়ি পাঠায়। আসরে পানুর ভূমিকা নীরব শ্রোতার। সকলে উঠে গেলেও সে বসে থাকে। লক্ষ্য করে তারিণী বলে, 'হ্যাঁরে পানু, তোর তাড়া নাই তো?'

সায় দিয়ে মাথা নাড়ে পানু।

—তালি এক কাজ কর দিনি, কেটলি আর কড়াইটা কলতলাখে মেজে আন। এই ভর দুপুরে আর বাড়ি গিয়ে কাজ নাই। আমার জন্যি বাড়িখে ভাত পাঠাবে, তাই দে দুজনে মেরে দেবানে, বুঝলি।

পানুর হৃদপিণ্ড লাফায়। আনন্দে বুক চেপে কলতলায় ছোটে।

সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ডুবিয়ে পানু বাড়ি ফেরে। আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মধ্যেই বিদ্যুতের ঝলকানি। উঠোনের একপাশে কাঠের জ্বালে ভাত রাঁধে দুর্গা। গনগনে আগুনের আলোয় দুর্গার মুখ উদ্ভাসিত। তাপে মুখে বিনবিন ঘাম। ঐ মোহময়ী মুখে পানুর দৃষ্টি আটকায়। দুর্গা যে এত সুন্দর এর আগে সে এমন করে কখনো দেখেনি। হ্যাঁ, বিয়ের সময় ডে-লাইটের আলোয় দেখেছিল বটে, তবে সে ছিল সাজানো মুখ। আলো আঁধারি রহস্যমাখা অপরূপ মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে পানু। তবে

বেশিক্ষণ নয়। তার সমান উচ্চাতয় উঠোনময় চামচিকেগুলো ওড়াওড়ি করে। একটা তো প্রায় নাকের ওপর এসে পড়েছিল। হাত দিয়ে তাড়িয়ে কাছে এসে দুর্গাকে বলে, 'বউ, ভাত রাঁধতিছ?'

দুর্গা উত্তব দেয় না, মুখও তোলে না। মুখ থমথমে—আকাশের মতোই। তার এই নীরবতা পানুর বুকে বলির বাদ্যি বাজায়। সে বারান্দায় উঠে খুটিতে ঠেস দিয়ে বসে।

দুর্গা হাঁড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকে ছেলে দুটিকে ভাত দেয়। পানু দুর্গার ডাকের অপেক্ষায় থাকে। সময় কাটে। এক সময় অধৈর্য হয়ে বলে, 'বউ আমারে ভাত দেবা না?'

রাগে ফুঁসছিল দুর্গা। দত্তবাবুদের কথা দিয়েছিল পানু গিয়ে তাদের গোয়ালঘরের বেড়া বেঁধে দেবে। সেইমতো ছেলেটাকে বলেও গেছল। পানু যায়নি। দত্ত গিন্নি এই নিয়ে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়েছে। ভাত চাইতেই সে তেড়ে ওঠে, 'কেন দিনেরবেলা যে বাপের কাছে খেয়েছ, রাত্তিরের জোগাড়টাও সেখান থে করি আসতে পারলা না। নিমুরোদে, নিষ্কর্মা কুয়ানের। বসি বসি খাওনের যম। নিজির পেটেরটাও জোগাড় করতি পার না। তোমার শরীলে ব্যাটাছেলের রক্ত আছে, না নাই? লজ্জা করে না মাগের কামাই খাতি।'

পানু চুপ। সপক্ষে বলার কিছু খুঁজে পায় না। তবুও মিনমিন করে, 'চেষ্টা তো করতিছি কাজ না পালি কি করব।'

গলা নামিয়ে পানুকে নকল করে দুর্গা, 'না পালি কি করব।' পরক্ষণেই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে, 'কি করবা না করবা তার আমি কি জানি। সংসার করিছ, বউ-ছলপুলে খাওয়াবার দায় তোমার। কিছু না করতি পার চুরি করি আনবা। আমি বসায়ে বসায়ে তোমারে খাওয়াতি পারব না।'

পানুর বিপন্ন সুর, 'চুরি করব? ধরা পড়লি মার খাতি হবে।'

—খাবা।

—জেলে নে যাবে।

—তাই যাও। তালি আমার হাড়ে বাতাস লাগে।

সমস্তটাই কথার কথা ভেবে দুর্গার মন ভেজাতে পানু মোলায়েম সুরে বলে, 'না বউ, ও কথা বলতে নি। চুরি করলি শুনিছি জেলে খুব মারে। যদি মারের চোটে মরে যাই, তবে তুমি বেধবা হবে। তখন কি হবে।'

শুকনো খড়ে আগুন লাগে। 'ওরে আমার দরদীরে। বলি, সধবা হয়ে কোন সুখে আছি শুনি? সেই তো আমারে গতর খাটায়েই খাতি হয়। মরলে তবু জানব সোয়ামী নাই খাটতি তো হবেই। মুখপোড়া ঢ্যামনা কুয়ানের। মরণ তোমার এমনি এমনি হবে না। গলায় দড়ি দে মর। তালি আর কিছু না হোক সংসারে তোমার খাই খরচটা বাঁচবে।'

অভাবী মানুষ পানু। জীবনে ঘরে বাইরে অনেক কটু কথা শুনেছে। গায়ে মাখেনি। পানুর মতো লোকেদের হয়তো সূক্ষ্ম অনুভূতি বলে কিছু থাকে না, থাকলেও মোটা চামড়া ভেদ করে ঐ পর্যন্ত পৌছায় না। কিন্তু এখন দুর্গার শেষ কথাগুলি শেল হয়ে বুকে

বাজে। পানু প্রতিবাদ করে না। শুধু চোখ ফেটে জল আসতে চায়। দুর্গা লম্ফ নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

মাঝরাতে অঝোরে বৃষ্টি নামে। পানু দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। যতবার চেষ্টা করে চোখের পাতা ভিজে যায়।

বৃষ্টি থেমেছে শেষ রাতের দিকে। সকালের আকাশ পরিষ্কার। বর্ষণ-স্নাত গাছপালার গা বেয়ে কিশোর সূর্যের নরম রোদ চুঁইয়ে পড়ে মাটিতে। গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত দুর্গা উঠোনময় ঘোরাফেরা করে। অনেকক্ষণ থেকে কিছু একটা বলি বলি করেও পানু সাহস করে বলতে পারে না। অথচ না বললেও নয়। তাই, 'বউ, তালি না হয় আমি দিন কতক কুটুম বাড়িখে ঘুরে আসি।'

দুর্গা জবাব দেয় না। তবে ঘাড় ঘুরিয়ে এমন মুখ বাঁকায় যার অর্থ পানুর কাছে একটাই—তুমি যমের বাড়ি গেলেও আপত্তি নেই।

কাজে বেরিয়ে যায় দুর্গা। জীর্ণ জামাটা কাঁধে ফেলে পথে নামে পানু। হাঁটতে হাঁটতে বেলা যখন প্রায় ডুবুডুবু সীমানা পেরোতেই পানু পুলিশের হাতে। অনাহার আর পথশ্রমে সে এমনিতেই ক্লান্ত, এখন প্রাণ পাখি খাঁচা ছাড়ার জোগাড়। হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির গা বেয়ে নামে সাঁঝের আঁধার। বিব্রত পুলিশ পানুকে একটা রুলের গুঁতো মেরে সখেদে বলে, 'হারামিগুলো কেন যে ঝামেলা বাঁধাতে আসে। এখন চল মাস দুয়েক ঘানি টানবি।'

কথাটা কানে যেতেই পানু চমকায়। তিন বছর আগের স্মৃতি চোখে ভেসে ওঠে। সংসার যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত পানু, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুলিশের পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কান্না জড়িত অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'হুজুর আপনি মা-বাপ। দয়া করে মেয়াদটা ইট্টুসখানি বাড়ায়ে দেন হুজুর।'

মুষল ধারায় বৃষ্টি পতনের শব্দেই হোক অথবা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে নিরাপদ আস্তানায় ফেরার ব্যস্ততার জন্যই হোক পানুর করুণ আর্তি পুলিশ কর্মীটির কানে যায় না। সে ওপরওয়ালার নির্দেশ পালন করতে পানুর চুলের মুঠিতে হাত রেখে বলে 'চল শুয়োরের বাচ্চা।'

তবুও পাতালে

বৃষ্টি এখনো টিপটিপ ঝরছে। সারারাত অঝোর বর্ষণে রাস্তাঘাট ডুবলেও কদিনের সৃষ্টিছাড়া গরমের কোনো হেরফের হয়নি। ভোরের খুব বাকি নেই। এই সময় যেখানে গাঁ গেরামে আঁধার ফিকে হয়ে আলো ফুটে ওঠার কথা, আকাশে মেঘ বিছানো থাকায় অন্ধকার সরবার জায়গা পায়নি।

কাঁচা রাস্তা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলের স্রোত। তারই ওপর দিয়ে ক্বচিৎ দু-একটা ডাম্পার গোঁ গোঁ শব্দে তীব্র হেডলাইটে আঁধার ফালা ফালা করে চলেছে হাম্প, ডিচ পেরিয়ে। রাস্তায় জমা জলে চাকা পড়তেই চিত্তির। ছিটকে উঠছে কাদা সমেত। বিজলির টিমটিমে আলোয় কাদার রঙ কয়লাকালো।

সারারাত দল বেঁধে বাতিল খাদান থেকে কয়লা সংগ্রহের পর সোনারা যখন পাতাল থেকে উঠে এসে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ায়, তখন অনেকেরই আর দাঁড়িয়ে থাকার মতো ক্ষমতা থাকে না। বিশেষ করে মহিলা এবং কমবয়সীদের। ইচ্ছে করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিতে।

ছেলের কষ্টে বুকটা টনটনায়। যে বয়সে ঘরে থেকে লেখাপড়া করার কথা, সেখানে সারারাত খাদানে কয়লা কেটে দুমুঠো ভাতের যোগাড় করা যত বাস্তবই হোক তবুও মায়ের বুকে বাজে। অবসন্ন শরীরেও সোনা বারো বছরের ছেলের পরনের ইজেরটা ঝাড়ে। ইজের থেকে কয়লাকুচিগুলো বাতাসে উড়তে দেখে সস্নেহে বলে, 'তুই কেনে মোদের সঙে খাটান দিতে আসিস বাপ। কাল থাইকতে ঘর থাইকবি, দাদুর সেবা কইরবি, বাবুদের নুনার পারা লিখাপড়া শিখ্যে বড় হইবি। ই ট বুঝলি কি না হঁ।'

মায়ের কথায় গণেশ কতটা আমল দিল বোঝা গেল না। উপরন্তু ভোরের ফিকে অন্ধকারে কয়লামাখা মুখে যদি কোনো অভিব্যক্তি ফুটেও ওঠে, ঠাহর হয় না। এ ধরনের কথা মার মুখে বহুবার শুনেছে এবং এগুলি যে কথার কথা গণেশ তা জানে। কারণ, অভাব যেখানে খনিগহ্বরের মতই হা-মুখ, সেখানে লেখাপড়া শেখা নয়নটাড়ের বস্তিবাসী মানুষগুলির কাছে বিলাসিতা। নইলে গণেশ তো ইস্কুলেই পড়ত, ছাড়িয়ে দিল তো সোনাই। বলে, 'হঁ রে গণশা, ইস্কুলে পইড়ে কি হবেক বাপ! চার কেলাস তক্ক ত পইড়ে লিলি— ইবার বাপের সঙে খাদান যা, দুইটা পয়সা মিলবেক। তাথে পেটের ভাতট জুটবেক— পরার কাপড়ট মিলবেক। গ্যাটম্যাট পইড়ে কি হবেক বাপ গরিবের!'

অভিমানে মায়ের হাত ছাড়িয়ে গণেশ বাড়িমুখো দৌড়ায়।

ঝাপসা আঁধারে মোড়া এলোমেলো কুঁড়েঘরের সারি। খড়, খাপড়া, টালির ছাউনি। বেশির ভাগই মাটির, ক্বচিৎ ইটের গাঁথনি। ঘর তৈরির সরঞ্জাম কাঠ, খুঁটি, খড়, বাঁশ,

টিন, টালি, ইঁট, পাথর, পাইপ, রেল ইত্যাদি যে যা পেরেছে কলিয়ারি থেকে বেশিরভাগটাই হাতিয়ে এনে ঘর বেঁধেছে। তৈরি করেছে বসতি—নয়নটাড়ের নূতন বস্তি। ভুইয়া, মশহর, নুনিয়া, পাশমন, সাঁওতাল, বাউরিদের সব পাশাপাশি বাস। এরা কেউ শ্রমিক, কেউ ছাঁটাই খনি শ্রমিক, কেউ ক্ষেত মজুর কেউবা হাটেবাজারে খাটা জনমজুর। তাছাড়া ঠেলাওলা, ফেরিওলা, ড্রাইভার, খালাসিও আছে এবং এই হাড়ভাঙা খাটুনির মানুষগুলিকে কেন্দ্র করে আছে চোলাইয়ের কারবারও। তবে সব কারবারকে ছাপিয়ে এ অঞ্চলে রমরমা কয়লার চোরা চালানের কারবার। বিনা পুঁজির কারবার। পাতালে যাও, গতর খাটাও—পয়সা কামাও। এমন কাঁচা পয়সার হাতছানি উপেক্ষা করা হতদরিদ্র মানুষগুলির পক্ষে কঠিন। ফলে সোনা ছেলেকে যতই লোক-দেখানো বকাঝকা করুক, আড়ালে প্রশ্রয়টাই কাজ করে বেশি।

সরকারি পরিত্যক্ত কলিয়ারি চিতিয়ে রয়েছে অনাদরে অবহেলায়। ওপরে ঘাস গজিয়ে সাধারণের চোখের আড়ালে। নিচে ধরণীর বুক ভরা সম্পদ। সেখান থেকে খুঁটে নিতে পারলেই হল। যে পরিবারের সদস্য বেশি তাদের আয়ও বেশি। কাজেই শুধু সোনার ছেলেই নয় নয়নটাড়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও মা-বাবার সঙ্গে খনিতে নামে।

সার সার সাইকেলে কয়লার বস্তাগুলি লোড হচ্ছে। স্ব-উদ্যোগে উত্তোলিত কয়লার বিপণনের প্রস্তুতি। কয়লা ভর্তি বিশালকায় দুটি বস্তা সাইকেলের দুপাশে ঝুলিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দশ-বারোজনের দলটি রওনা দেয়। এদের গন্তব্য বিভিন্ন। কেউ দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে দালালের ঘরে দিয়ে আসবে। কেউ যাবে দূরের রেলস্টেশনে, যা পরে যাত্রীবাহী ট্রেনে ছোট ছোট বস্তায় সিটের তলায় আশ্রয় নিয়ে পাড়ি দেবে আসানসোল বর্ধমান হয়ে আরো দূরদূরান্তে, নিরাপদে, রেল পুলিশের সহায়তায়। আটকায় না কোথাও। সব জায়গাতেই বন্দোবস্ত।

কালো কালো মানুষগুলির গা বেয়ে ঘাম ঝরে। দশ পনেরো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। ইচ্ছে থাকলেও পথে জিরনোর উপায় নেই, যতক্ষণ না বস্তাগুলি স্ব স্ব স্থানে খালাস করতে পারছে। হাঁটতে হাঁটতেও চোখ ঘুরছে চরকির মতো। লক্ষ্য, অজানিত বিপদ কোথাও ওঁত পেতে আছে কিনা। কয়লার চোরা চালানের কারবারে পয়সা যেমন আছে, ঝক্কিও সামলাতে হয় দেদার। খোলা খনিমুখেই তোলা আদায়ের লোক ভোরবেলা এসে বসে থাকে। দক্ষিণা না পেলে সাইকেলে বস্তা লোড করতে দেবে না। থানা থেকেও পুলিশের লোক নিয়ম করে এসে হিস্যা নিয়ে যায়। না দিলেই ঝামেলা। এমনকি পরিত্যক্ত খনির যে ভূতপূর্ব ম্যানেজার তারও পাওনা মেটাতে হয়। তিনি অবশ্য নিজে আসেন না। আদায়ের লোক আছে। এসবই গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সাইকেল নিয়ে চলার পথের ঝুঁকিটাই বেশি। প্রায়ই সি আই এস এফ টহল দেয়, রেইড করতে আসে। তখনই হয় বিপদ। তবে যতটা পারে ওদের এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করে সবাই। ডাম্পারের ঘরঘর শব্দে ওরা এদিক ওদিক গা ঢাকা দেয়। ধরা যে দু-একজন পড়ে না তা নয়। তখন ওই খাজনার থেকে বাজনা বেশি—সেদিনের রোজগারটাই বরবাদ।

পরিশ্রমটা গায়ে মাখবে না বলে বংশী চলতে চলতেই অদ্ভুত কায়দায় এক হাতে বিড়ি ধরায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনে জাগে কত কথা। সাত বছর ধরে সে এই পেশায় জড়িয়ে আছে। আগে অবশ্য সাইকেলে কয়লা বইত না—নিচে থেকে ঝোড়া বয়ে তুলে এনে ওপরে দালালদের কাছে বেচে দিত। কিন্তু সাইকেলে বয়ে দূরে মহাজনদের ঘরে বেচে এলে পয়সাটা একটু বেশি পাওয়া যায়। হাঁটার পরিশ্রমটাকে ওরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। মূল কাজের সঙ্গে ওটা ফাউ।

কিন্তু আগে যখন সরকারি কয়লাখনিগুলির রমরমা ছিল বংশী তখন ঠিকা শ্রমিক হিসেবে খনিতে কয়লা কাটার কাজটাই করত। সে এক জীবন বটে। কোম্পানির ডুলিতে সোঁ সোঁ করে খাড়া পাতালে নেমে যেত আরো অনেকের সঙ্গে। ওভারসিয়াববাবু মাপজোক করে দিত, ওরা টিমটিমে আলোয় আধিভৌতিক অন্ধকারে গতানুগতিক কয়লা কাটত। যখন টিফিনের ফুরসত মিলত, বংশীর নেশা ছিল ঘুরে ঘুরে পাতাল দেখা। দেখত, কয়লা কাটার পর লোডাররা কয়লাগুলিকে ধাতব বাক্সজাত করে হলেজে চলা ছোট রেলের খাঁচায় বসিয়ে দিত। আর সেগুলি চলমান হলেজের প্রতিক্রিয়ায় চোখের সামনে নাচতে নাচতে ওপরে উঠে আসত। ওখান থেকে ট্রাকে লোড হয়ে চলে যেত বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে। আরও দেখত কিভাবে পাতালগর্ভে ব্লাস্টিং করে কয়লার স্তর ফাটানো হত। এখনো কানে বাজে, কয়লার নিরেট দেয়ালে সরু সরু গর্ত করে বারুদের সেলগুলি পুরে ফাটানোর আগে চৌকিদারের চেতাবনী 'হুঁ.....শি.....য়া.....র.....।' গা ছমছম করা ডাক।

পেরিয়ে আসা দিনগুলির কথা ভাবলে এখনও বংশীর শরীরে সুখানুভূতি হয়। কিন্তু কথায় বলে, দিন সমান যায় না। লোকসান দিতে দিতে এমন একদিন এল যেদিন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে বাধ্য হল, কয়লা তুলতে কোম্পানির খরচ বেশি হয়ে যাচ্ছে। লোকসানে খনি চালানো যাবে না। শিল্প বাঁচাতে গেলে প্রাথমিক আবশ্যিক কর্তব্য শ্রমিক ছাঁটাই। দুর্ভাগ্য, সে দলে বংশীও ছিল। এ নিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলন যে করেনি তা নয়, লাভ হয়নি কিছুই।

চিন্তায় ছেদ পড়ে। পেছন থেকে ডাক শুনে বংশী থমকায়। ডাকছে ওদের থেকে বয়সে বড় হারু বাউরি—ওরা হারুকাকা বলেই সম্মান দেয়। হারু বলে, 'বংশী মন লিছে টুকদু চা খাঁয়ে লিতে। চল না কেনে দুকানকে।' সামনেই চায়ের দোকান। হারুর ইঙ্গিত সেদিকে।

চা খেয়ে সময় নষ্ট করে সি আই এস এফ এ-র খপ্পরে পড়তে বংশী রাজি নয়. তাই বলে 'এখুন লয়, বস্তাগুলান মহাজনের জিম্মা কইরে টেশনেই খাঁয়ে লিব।'

স্টেশন মানে এখনও দুঘন্টার পথ। কারুরই পেটে সকাল থেকে কিছু পড়েনি। এদিকে গরম সিঙ্গাড়া ভাজার গন্ধ নাকে এসে লাগতেই গজেন উসখুস করে। পেটে ছুঁচো দৌড়াদৌড়ি করে। বংশী হাঁটছে সর্বাগ্রে, তাকে থামাতে মিনতির সুরে বলে, 'বংশীদাদা, একটুন সবুর কর না কেনে। সিঙ্গাড়া আর টুকদু চা খাঁয়েই যাই না কেনে। শরীলে তাকত পাইলে জইল্দি হাঁটা যাবেক।'

বংশীর মতকে অগ্রাহ্য করে চা খাওয়াটাকেই মেনে নিয়ে রাস্তার ঢালে সাইকেলগুলিকে শুইয়ে দিয়ে ওরা দোকানের সামনে ফালি বাঁশের বেঞ্চিতে এসে কোমরের গামছা খুলে ঘাম মোছে।

চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই, এখন চা খেতে বসে সেটাই জোরালো হয়ে বংশীকে তাড়া করে। তার ইচ্ছে, সুযোগ সুবিধা পেলে, হাতে কিছু পয়সা জমিয়ে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেবে। পুলিশ-দারোগার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আর ভালো লাগে না। তা ছাড়া ভবিষ্যতে হয়তো নয়নটাঁড়ের বস্তি ছেড়ে সবাইকেই অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। খনির বাবুরা বলে, লোকেও বলে, চুরি করে কয়লা কাটার ফলে মা ধরিত্রী নাকি তলে তলে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কোনদিন যে ধসে সব তলিয়ে যাবে কেউ জানে না। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বংশী দেখে তো এখানে ওখানে ধস নেমে মানুষ মরেছে। তখন নিজের জীবনের অনিশ্চয়তায় বাঁশপাতার মতো তিরতির করে কেঁপে যাওয়া ছাড়া করার কিছু থাকে না। আর যেখানে ধস নামে, তখন ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলে হাঁকডাক, ছোটাছুটি। খনি মালিকরা বলে পরিত্যক্ত খাদানগুলি বালি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। পুলিশ, ডি এম-ও বলে অবশ্যই করতে হবে। বলে, করে না কেউ। কে করবে? কেনইবা করবে? লোকসানের ঘরে কার দায় পড়েছে আরো লোকসান দেবার। ফলে যেমনকার খাদান তেমনিই থাকে।

বংশীর মনে আছে, এক শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে গ্রামের ভরা পুকুর শুকিয়ে খটখটে, জল নিপাত্তা। বাড়ি, জমিতে বড় বড় ফাটল। ওপর মহলে তখনো একবার কথা উঠেছিল, এখান থেকে লোকালয় সরিয়ে দিতে হবে। নচেৎ বড় অঘটন ঘটে গেলে করার আর কিছু থাকবে না। তবে এতদিনেও যেমনকার গ্রাম তেমনিই আছে, মরণ-বাঁচনের দোলাচলে গ্রামবাসীরাও আছে—সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

বংশী চা খায়। এসব ভাবনায় চা-টাও জুত লাগে না। নিজের কথা, পরিবারের কথা, নিজের অনিশ্চিত রোজগারের কথা যত ভাবে ততই চায়ের দোকান দেবার ইচ্ছাটা আরো জোরালো হয়ে মাথায় চেপে বসে। ঘরে আধা অন্ধ বাপ, মাও বয়সের ভারে জর্জরিত। সংসারটাকে ভালোভাবে দেখতে, মা-বাবার একটু যত্ন করতে সোনার বাড়ি থাকাটাই ঠিক। তা ছাড়া সোনা আর বেশিদিন খাদানের কয়লা তোলার কাজটাও করতে পারবে না। বংশীই করতে দেবে না। কেননা তার পেটে আরেকটা প্রাণ বেড়ে উঠছে। এ কাজ যারা করে তারাই বোঝে পাতালে নামতে উঠতে কি পরিশ্রম।

দেড়শো ফুট খাড়া দেওয়ালের খোলা প্রথম কয়লা কাটা স্তরের পরিত্যক্ত এলাকার থরে থরে সাজানো কয়লাস্তর চোখের সামনে লোলুপ হাতছানি দিলেও নিচে গভীর জলাধার। খাঁড়া দেওয়ালে মানুষ চলতে পারে না, এমনকি যারা সরকারিভাবে খনিতে কাজ করতে অভ্যস্ত তারাও না। কিন্তু বংশীরা পারে। ওরা ওভাবেই চলে। সরু সরু রাস্তা, শুধু পাটুকু রাখার মতো খাঁজ কেটে তার ওপর অবলীলায় হেঁটে যায় ঝোড়া ভর্তি

কয়লা মাথায় ঝাপসা অন্ধকারে অথবা টর্চের আলোয়। অনেকেই অসাবধানে পা পিছলে জলে পড়ে। হাত পা ভাঙে—কখনো কখনো সলিল সমাধিও ঘটে।

সামনে সরু সুরঙ্গের মুখ। কয়লা কাটতে কাটতে ক্রমশ চওড়া করে এগিয়ে যায় চোরাই কয়লা কাটার দল। মাথার ওপর ঝুলতে থাকে ছাদের পাথর। যে কোনো সময় ছাদ ভেঙে জীবন্ত সমাধি হতে পাবে। সবাই সব জানে। জেনে বুঝেও বংশীরা জীবন হাতে করেই নামে—পেটের জন্য, কোনোমতে বেঁচে থাকার জন্য।

নানা ভাবনায় জর্জরিত বংশী উঠতে গিয়ে টাল খায়। মাথাটা বোঁ করে ওঠে। পড়তে পড়তেও ঝাঁপের খুঁটি ধরে নিজেকে সামলে, অবসন্ন শরীরে আবার বেঞ্চিতে বসে।

বুঝতে না পেরে বুধন মজা করতে বলে, 'বংশী, টুকদু চা খাঁইয়ে তুর কি লিসা লাইগল নাকিরে'।

বংশী উত্তর দেয় না। বসে থাকতেও পারে না, শুয়ে পড়ে।

সঙ্গীরা উসখুস করে। বেলা বাড়ছে, এখনই রওনা না দিলে বিপদে পড়তে পারে। একা বংশীর জন্য এতগুলি মানুষ অপেক্ষা করতে পারে না। হারু বলে, 'বংশী মোরা যাছি ভাই, তুই পঁরে আয়।'

বাঁশের বেঞ্চিতে শুয়ে বংশী দেখে একে একে সঙ্গীদের চলে যাওয়া। পিছন ফিরে কেউ চেয়েও দেখে না। কারো জন্য কারো দায় নেই, মমতা নেই। এরকম জীবনেই বংশীরা অভ্যস্ত। ফলে কোনো তাপ উত্তাপও নেই। অসুস্থ শরীরে চোখ দুটো ধীরে ধীরে আপনা থেকেই বুঁজে আসে।

কতক্ষণ এভাবে ছিল বংশী খেয়াল করতে পারে না। একসময় সে চোখ খোলে। তবে নিজের ইচ্ছেয় নয়, রুলের গুঁতোয় এবং চোখেব সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সি আই এস এফ অফিসারের মুখনিঃসৃত বচনে, 'এই শুয়োরের বাচ্চা, নবাবের মতো ঘুমাচ্ছিস যে বড়। তোর সঙ্গীরা কোথায়?'

বংশী দেখে অফিসারের সঙ্গে রয়েছে আরো দুজন সাকরেদ। গালাগাল খেয়ে বংশী যথেষ্ট উত্তেজিত। ইচ্ছে করে অফিসারটাকে জোড়া পায়ে লাথি মারতে। খাদানে কয়লা কাটতে কাটতে তার যা বলিষ্ঠ চেহারা তাতে একাই তিনজনের মহড়া নিতে পারে। শুধু বাধ সাধে সরকারি উর্দি। রাগ চেপে বংশী বলে, 'শুদুমুদু গালি পাইড়ছেন কেনে?'

চার অক্ষরের একটি অশালীন শব্দ উচ্চারণ করে অফিসার বলে, 'শালা কয়লা চোর তার আবার ফুটানি।'

আঁতে লাগে বংশীর। সে অফিসারের মুখের উপর বলে, 'চোর কে লয় বটে! ই কামের জন্য চৌকিদার পয়সা লেয়, উ চোর লয়! থানা থিক্যে বাবুরা এসে পয়সা লিয়ে যায়, উয়ারা চোর লয়! খাদানের মানিজার আমাদিকে পয়সা লিয়ে খাদানে নাইমতে দেয়, উ চোর লয় বটে। আপনারা...।'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে অফিসারের। বংশীর পেটে একটা রুলের গুঁতো মেরে সঙ্গীদের

উদ্দেশ্যে বলে, 'তোল তো শালাকে গাড়িতে, হাজতে না পাঠালে এর তেল মজবে না।'

কি ঘটতে চলেছে, কি ঘটতে পারে পূর্ব অভিজ্ঞতায় বংশীর তা জানা। কাকুতি মিনতিতে কাজ হবে না। এখন ছাড়া পেতে হলে নগদ সেলামি দিতে হবে। পকেটে পয়সা নেই, কয়লা বিক্রি না হলে আসার সম্ভাবনাও নেই। জেল হাজতের হাত থেকে বাঁচতে সাইকেলটাকে পরিচিত মুদিখানায় বাঁধা দিয়ে শ তিনেক টাকা সি আই এস এফ অফিসারের হাতে গুঁজে দিয়ে, জীবনে আর কয়লা চুরি করবে না, এই কড়ারে ছাড়া পায়। বয়ে আনা কয়লার বস্তা উঠে যায় সি আই এস এফ-এর গাড়িতে। নগদ তিনশর সঙ্গে ওগুলো ফাউ। বংশী জানে যেতে যেতে কয়লার বস্তা ওরাই কোথাও কম দামে ঝেড়ে দেবে। ওতে অন্যায় নেই। এত কষ্টেও বংশীর ঠোটের কোণে হাসি।

অসময়ে বংশীকে ঘরে ফিরতে দেখে সোনা অবাক হয় না। সঙ্গে সাইকেল নেই—তবুও না। কেননা এরকম ঘটনা বস্তি জীবনে অনেকবার অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কদিন একটু অসুবিধায় কাটে, আবার সব ঠিক হয়ে যায়। ব্যস্ততায় একদিন ঘটনার কথা সকলে ভুলেও যায়।

বিকেল থেকেই আবহাওয়ার চরিত্রটা পাল্টাতে শুরু করেছে। গত রাতে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছিল। সোনারা টের পায়নি খনির ভিতরে ছিল বলে। আজকে বৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। খবরে বলেছে নিম্নচাপ।

মাদুরে শুয়ে রয়েছে বংশী। রাত বাড়লে অভ্যাসবশেই খাদানে নামার প্রস্তুতি হিসেবে গাঁইতি, ঝোড়া নিয়ে সোনা সামনে এসে দাঁড়ায়। কুপির স্বল্প আলোয় সোনাকে দেখে বংশী বলে, 'মাথাট বড় দুখাইছেরে গনার মা, আমি যাইতে লারব।'

—হুঁ, তুমি রেস লাও। আমি নুনাকে সঙে লিয়ে যাচ্ছি।

—নুনা! বংশীর গলায় বিস্ময়! রাত বিরেতে সোনা খাদানে কয়লা কুড়োবে তাতে ভয় নেই, সঙ্গী অনেক থাকে। তবে কয়লার দেয়াল বড় নিরেট, পুরুষালি বাহু ব্যতিরেকে চাঙর ভাঙতে চায় না। তাই বলে, 'নুনা দমে কয়লা কাইটতে লারবেক। থইক্যে যাবে বটে।'

—উ ঠিকেই পাইরবে। সোনার গলায় প্রত্যয়ের সুর।

অসুস্থ শরীরে কথা বলতে ভালো লাগে না। তাই বংশী আর কথা বাড়ায় না।

বৃষ্টি মাথায় করে অন্ধকারের মধ্যে সোনাদের দলটা গাঁইতি, শাবল, ঝোড়া হাতে যখন সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ায়, দেখে থানার হাবিলদার দাঁড়িয়ে ওদের অপেক্ষায়। মাথা গুনতি করে নামতে দেবে, ভোর হতে না হতে আবার এসে মাথা গুনে পাওনা নিয়ে যাবে। হিসেবের হেরফের হবার যো নেই।

গণেশের উৎসাহই বেশি। আজ সে বাবার প্রতিনিধি। নিজের শারীরিক অক্ষমতা বা দুর্বলতা যাতে অন্যের চোখে পড়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ না হতে হয়, মায়ের বারণ সত্ত্বেও সে সুড়ঙ্গের আরো গভীরে ঢুকে যায়।

সকলে যে যার কাজে ব্যস্ত। কারো খোঁজ কেউ রাখে না। ঠিক এইরকম অবস্থায় খনির ভেতরটা হঠাৎই ভীষণভাবে দুলতে শুরু করে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পানীয় জলের বোতল গড়াতে গড়াতে খাদানের জলে গিয়ে পড়ে। কেউ কিছু বোঝার আগেই ভীষণ শব্দে মাথার ওপর ঝুলতে থাকা কয়লার চাঙর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। গণেশ যেখানে কাজ করছিল ছাদ ভেঙে পুরো রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনায় সকলেই দিশেহারা। ভয়ে বীভৎস অবস্থা। আবছা অন্ধকারে প্রাণ বাঁচাতে সকলেই উল্টো দিকে খনিমুখ লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে। শোক কান্নার অবকাশ নেই। বলিষ্ঠ কেউ একজন সোনাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ওপরে এনে তোলে। খাদানের অতলে পড়ে থাকে চাপা পড়া গণেশের দেহ।

মিশকালো অন্ধকারে সারা বস্তি ভেঙে পড়েছে বংশীর উঠোনে। হাড় জিরজিরে কালো কালো মানুষগুলি সোনাকে সান্ত্বনা দেয়। অর্ধচেতন সোনার কানে কোনো সান্ত্বনার বাণী পৌঁছয় না। পুত্রশোক তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া ডাক ছেড়ে কেঁদে যে বুকটাকে একটু হালকা করবে তারও উপায় নেই। যত বড় অঘটনই সোনার জীবনে ঘটুক এই মুহূর্তে তা জানাজানি হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে পুলিশ ছুটে আসবে, উপরমহলে জানাজানি হবে, খবরের কাগজে উঠবে। তখন কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার জন্য বস্তিবাসীদের দায়ী করে হেনস্থা করবে, এমনকী নিরাপত্তার কারণে বালি দিয়ে খনিমুখ হয়তো চিরতরে বন্ধ করে দেবে। যদি দেয়, ছেলেমেয়েসহ বস্তির মানুষগুলি না খেয়ে মরবে। সোনা থম মেরে বসে থাকে।

একরকম সারারাত জেগে ভোরের দিকে মানুষগুলি যখন যে যার ঘরে সবে একটু চোখ বুঁজেছে অমনি হাবিলদারের হাঁকাহাঁকি দাপাদাপিতে তন্দ্রা ভাঙে। হিস্যার টাকা আদায় করতে এসে খাদানে কাউকে না দেখে, মাথা গরম করে ছুটে এসেছে। তার হিস্যা ফাঁকি দেয় বস্তিতে এমন হিম্মত কারো নেই। কারও উসকানিতে কয়লা কাটিয়েরা তার পাওনা ফাঁকি দিয়েছে ধরে নিয়ে সে বস্তিসুদ্ধ লোককে মা-মাসি তুলে গালাগাল করতে শুরু করে।

অপরাধবোধে অনুতপ্ত, পুত্রশোকে জর্জরিত বংশীকে হাবিলদারের অকারণ গালাগাল ক্ষিপ্ত করে তোলে। সে শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে উঠোনের এককোণে পড়ে থাকা কয়লা কাটার গাঁইতিটা হাতে নিয়ে বলে, 'ভগবান উয়ার মিত্যু আমার হাথেই লিখালে শেষ তক্ক। শালোকে আইজ জন্মের হিস্যা চুকায়েঁ দিব।'

পুত্রশোক সোনাকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও, বেঁচে থাকা এবং ভবিষ্যতের অন্ন সংস্থানের নিরাপত্তার আশ্বাসটাই এই মুহূর্তে তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় —নিজের জন্য, অনাগত উত্তরসুরীর জন্য এবং বস্তিবাসী সকলের জন্য। এই তাগিদই তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে প্রবৃত্ত করায় এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় সে বংশীর পথ আগলে দাঁড়ায়। কান্নাজড়িত মৃদুস্বরে বলে, 'মাথাট গরম কইর নাই। আমার কথাট শুন। আমরা গরিব বটি। উয়ারা গরমিন্টের লোক, উয়াদের খ্যাপাইতে নাই। খ্যাপাইলে জানে মাইরে দিবেক

তুমাকে। তা বাদে আমাদের ত বাঁইচতে হবেক। পেটে যে আইসছে উয়ার কথাট ত ভাইবতে হবেক। তুমি ঘর যাও, আমি দেইখছি।' একরকম ঠেলেই বংশীকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

হাত পেতে পেতে হাবিলদারের নুলো বেড়ে গেছে। পয়সা ছাড়া কিছুই বোঝে না। গত রাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা জানলেও ওর কিছু আসবে যাবে না। বরং পাঁচ কান করে বিপদ বাড়িয়ে তুলবে।

হিসেব করে লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে হাবিলদারের এক রাতের পাওনা মিটিয়ে দেয় সোনা। অবাক হয়ে বংশী সোনাকে দেখে। তার এক চোখে পুত্রশোকের অবদমিত কান্না, অন্য চোখে অনাগত জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস। বেঁচে থাকার অবলম্বন।

এতক্ষণ বুক ফাটলেও প্রাণপণে চেপে রাখছিল সোনা। কিন্তু হাবিলদার চোখের আড়াল হতেই উদ্গত অশ্রু বাঁধভাঙা জলের মতো দুগাল বেয়ে নেমে আসে। সে গলা ছেড়ে কাঁদে।

কাঁদে বংশীও। নীরবে।

এক চিলতে রোদ্দুর

ছুটির ঘন্টা বেজেছে কি বাজেনি অমনি কচিকাঁচাগুলি পড়িমড়ি ছুট লাগায় শিরিষ গাছটা লক্ষ্য করে। দেখে মনে হয় বুঝি কেউ এইমাত্র নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছে, আর বাঁধকাটা জল যেমন কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই কলকল করতে করতে ছোটে তেমনি মুখে নানা কথার খই ফুটিয়ে কে আগে লক্ষ্যে পৌঁছবে এ যেন তারই প্রতিযোগিতায় ভ্রুক্ষেপহীন দৌড়। ওদের আচমকা সমবেত চিল-চিৎকারে ভয় পেয়ে গাছে বসে থাকা পাখপাখালি কিচিরমিচির শব্দে কতকগুলি উড়ে যায় নিরাপদ দূরত্বে অন্য গাছের ডালে, আর অন্যগুলি শূন্যে কয়েক পাক চক্কর খেয়ে যখন বোঝে বিপদের সম্ভাবনা নেই, তখন আবার নিশ্চিন্তে ডালে এসে বসে।

এমনিতেই স্কুল ছুটির খবর শিশুদের কাছে বয়ে আনে কয়েদখানা থেকে মুক্তির আনন্দ। বদ্ধ ঘরে প্রকৃতির হাতছানি মনকে ব্যাকুল করে তোলে খোলা আকাশের নিচে লুটোপুটি খাওয়ার জন্য। আর আজকের ছুটির আনন্দ তো ওদের কাছে আরও খুশির, কেন না বিশেষ কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ আজ দু' পিরিয়ড আগেই ছুটি ঘোষণা করেছে। ফলে কেউ কেউ বাড়িমুখো হলেও বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই একটু বেশি সময় খেলতে পাওয়ার আশায় পড়ে পাওয়া সময়টাকে কাজে লাগাতে শিরিষ গাছটার তলায় গিয়ে জড়ো হয়। এটা বাচ্চাদের খুব পছন্দের জায়গা।

পঞ্চায়েত শাসিত ডালিমপুরের একেবারে প্রান্তের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত শ্রেণির ছেলেমেয়েরাই পড়তে আসে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায় যতটা না অক্ষর জ্ঞানের জন্য, বেশিটাই মিড ডে মিলের টানে। ফলে কোনো বাবা-মায়েরই শহর বা আধা শহরের বাবা-মায়েদের মতো ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে আসা বা নিয়ে আসার বিলাসিতা দেখাবার মতো সময় নেই। উৎসাহও নেই। নিজেরাই দূরের স্কুলে কখনও একা, কিন্তু বেশিরভাগটাই দল বেঁধে যাতায়াত করে। অভিভাবকদের ভাবটা এরকম, তাদের ছেলেমেয়েরা তো আর লেখাপড়া শিখে লাটবেলাট হবে না, কাজেই স্কুলে গেলে ভালো না গেলেও ক্ষতি নেই। তাছাড়া, বর্ষাকালে তো অনেক ছেলেমেয়েকেই মাঠের কাজে বাবা-মাকে সঙ্গ দিতে হয়। তখন স্কুলের সঙ্গে দীর্ঘদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

বহু পুরনো শিরিষ গাছটার গুঁড়ি দুহাতে বেড় আসে না। তারই ডালে মোটা দড়ি দিয়ে দু-তিনটে দোলনা টাঙানো। দোলনা চড়ার লোভেই ছেলেমেয়েরা এখানে এসে হাজির। যারা দৌড়ে আগে এসে পৌঁছেছে তারা দোল খাচ্ছে। যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল তারা অপেক্ষা করছে যে চড়েছে তার বদান্যতার ওপর ভরসা রেখে, কতক্ষণে সে ছাড়বে।

তাতে রাগ বা অভিমান যে হয় না এমন নয়, তবে কেউ জায়গা ছাড়ার নামটি করে না। দোলনা চড়ার এমনই টান।

ওদিকে গুটিকয়েক মেয়ে শিরিষ ছায়ায় এক্কাদোক্কায় ব্যস্ত। সব খেলারই কিছু নিয়মকানুন থাকে। কিন্তু অনেক সময়েই অন্যের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, নিয়মকে কলা দেখিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে শুরু হয় বচসা। পরিণতিতে কখনও খেলা ভণ্ডুলও হয়ে যায়। বোধহয় তেমনই কিছু একটা ঘটেছে ওদের মধ্যে, যা নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে।

অপেক্ষাকৃত সবলদের মধ্যে যারা ডানপিটে তারা দোলনা চড়ার অপেক্ষায় না থেকে ফুটবলের অভাবে কোত্থেকে আধকাঁচা একটা বাতাবি লেবু জোগাড় করে তা নিয়ে মাঠ চষছে। যদিও ওরা বাতাবিতে লাথি মেরে যতটা না আনন্দ পাচ্ছে, তার থেকে বেশি উপভোগ করছে যখন কাউকে ল্যাং মেরে ফেলে এবং তাকে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ না দিয়ে ইচ্ছে করেই আরো কয়েকজন তার গায়ের ওপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। এমনি নিটোল আনন্দে ভরে গেছে জায়গাটা।

সময়টা মধ্য ডিসেম্বরের দুপুর। নিস্তেজ রোদের তাপ হিমেল হাওয়ার শীতকে সামাল দেওয়া তো দূরের কথা, গ্রামের মানুষের যথেষ্ট শীতকাপড় না থাকায় দুপুরেও কাঁথার নিচে ঢুকতে পারলে যেন ভালো হয় এমন পরিস্থিতি। রমেনবাবুর অন্দরমহলের অবস্থা তো অন্যদের তুলনায় আরো কাহিল। গাছগাছালিতে মোড়া গ্রামের শেষ প্রান্ত বলে শীত যেন ওখানে বাসা বেঁধেছে।

কদিন আগেই রমেনবাবুর নাতির অন্নপ্রাশনে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত আত্মীয়দের আগমনে বাড়ি সরগরম ছিল। কাছাকাছির লোকেরা সকলে চলে গেলেও রয়ে গেছে রমেনবাবুর ছোট বোন-ভগ্নিপতি ও বোনের শাশুড়ি। ওরা সম্বলপুর থেকে এসেছেন। বোনের শাশুড়ির খুব ইচ্ছে এতদূর যখন এসেই পড়েছেন তখন একবার কলকাতা ঘুরে মা কালীকে দর্শন করে যাওয়া। ডালিমপুর থেকে কীই বা এমন দূরত্ব—এক্সপ্রেস ট্রেনে ঘন্টা তিনেকের পথ। রমেনবাবুরও সায় আছে এই সিদ্ধান্তে—বোনের শাশুড়ির নাম করে এ যাত্রায় তাদেরও কালীঘাট দর্শনটা হয়ে যাবে, এই আর কি!

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সকলে এসে বসে গ্রিলঘেরা বারান্দায়। উদ্দেশ্য রোদে পিঠ দিয়ে আমেজ নেওয়া আর কালীঘাটে যাওয়ার প্রস্তুতিটা ছকে ফেলা। ততক্ষণে রমেনবাবুও স্কুল থেকে ফিরে আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন। কিন্তু আলোচনা তেমন জমে না। জমবে কি, শরীরের ভেতর থেকে ঠাণ্ডাই তো নড়তে চায় না। ওরা যে রোদটুকুর লোভে এখানে বসেছে, একটু পরেই তা শুষে নেয় শিরিষ গাছের ঘন ছায়া। বাড়ির পশ্চিম দিকটায় স্কুলের শিরিষ গাছটা ডালপালা মেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারই তলায় স্কুলের ছেলেমেয়েগুলি খেলায় মত্ত।

রমেনবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে উর্মিমালা অনুযোগ জানায়, 'ছোড়দা, আচ্ছা জায়গায় বাড়ি করেছিস বটে তুই। বাড়িটায় এক ফোঁটা রোদ্দুর পড়ে না। শিরিষ গাছটাকে রেখেছিস কি করতে? কেটে ফেলতে পারিস না? বাড়িটায় আলো-বাতাস খেলতো তাহলে।'

স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর যাতায়াতের সুবিধা হবে বলে স্কুলের গা ঘেঁষে জমি কিনে বাড়ি করেছেন রমেনবাবু। তিনি যখন এখানে বাড়ি করেন তখন এখনকার মতো জমজমাট ছিল না। বিস্তর খালি জায়গা যেমন ছিল পাল্লা দিয়ে ছিল গাছগাছালিও। কালে কালে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু গাছ কাটা পড়লেও রয়েও গেছে অনেক। তার মধ্যে শিরিষ গাছটাও পড়ে। ওটাকে কাটার কথা কারও মনেই হয়নি। মানুষের কাছে ওর আলাদা কোনো অস্তিত্বও ছিল না। যেন সংসারেরই আর পাঁচটা সামগ্রীর মতো রয়ে গেছে মাথা উঁচু করে।

বোনের কথায় হেসে উত্তর দেন রমেনবাবু, 'সে কিরে! কার গাছ কাটতে যাব আমি? ওটা তো সরকারি সম্পত্তি। গাছে হাত দেওয়া আইনে বারণ। কাটলে জেল-জরিমানাও হতে পারে। তাছাড়া স্কুলের ছেলেমেয়েরা তো ওটার নিচেই খেলে। গাছ কাটলে ওরা যাবে কোথায়?'

—ওরা কোথায় যাবে সেটা তো তোর দেখার বিষয় নয়। তাছাড়া, ঐ গাছটা না থাকলেও ওরা খেলার জায়গা ঠিক অন্য কোথাও খুঁজে নেবে। কিন্তু তোর বাড়ি নষ্ট হলে স্কুলের ছেলেমেয়েরা কিন্তু বাড়ি ঠিক করে দিতে আসবে না। না ছোড়দা, যত তাড়াতাড়ি পারিস তুই ওঁটার একটা ব্যবস্থা কর।

এবারও গা করেন না রমেনবাবু। বোনের কথায় মজা করে উত্তর দেন, 'আচ্ছা! তবে আমি তো তোর মতো করে ভাবিনি কোনোদিন, একটু বুঝিয়ে বল দেখি কিভাবে বাড়ি নষ্ট হবে।'

উর্মিমালা খুশি হয় ওর কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মনে করে। তাই গাম্ভীর্য ধার করে বলে, 'দেখ ছোড়দা, দুপুরের পর বাড়িটায় একেবারেই রোদ পড়ে না। দিনের পর দিন এমন চললে শ্যাওলা পড়ে ইঁটে নোনা ধরে যাবে। গাছের ডাল ছাদের উপর এসে পড়ায় পাতাছাতা পড়ে ছাদে বৃষ্টির জল দীর্ঘদিন জমে থাকলে ছাদ ড্যামেজ হবে। সবচেয়ে বড় কথা পাখির মলত্যাগে দেয়ালের গায়ে অশ্বত্থ-বটের চারা জন্মাবে, দেয়ালে ফাটল ধরাবে। তা ছাড়া মাটির নিচেও যে শিকড় চারিয়ে শিরিষ গাছ ভিতে ফাটল ধরাবে না তারই বা নিশ্চয়তা কে দেবে?'

রমেনবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই শৈলশ্রী বলেন, 'ঠাকুরঝি, তুমি মন্দ বলনি! তবে কি জানো! যে গাছের বাতাসে শরীর জুড়াব, অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকব, বদলে এটুকু তো মেনে নিতেই হবে। তাছাড়া ভাবতো, কবি নিজেই বলেছেন, 'হেথা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জাগি।' দিনরাত পাখির কিচিরমিচির শ্রান্ত মনে কি যে শান্তির পরশ বুলিয়ে যায়, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না ঠাকুরঝি। সত্যি, এমনটা তুমি কোথাও পাবে না। অনেক সুখ ভোগ করতে গেলে কিছু অসুখকে তো মানিয়ে নিতেই হবে।'

—তুমি থাম তো বৌদি। এটা কাব্যি করে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়। এখন আমার কথা শুনবে না ঠিক আছে। কিন্তু এত পয়সা খরচ করে বাড়ি করেছ, পরে পস্তাতে হবে।

কদিন বাদে উর্মিমালা চলে গেলেও রমেনবাবুর মনে পাকাপাকিভাবে গেঁথে রইল খচখচানিটা।

গাছের জন্য বাড়ির ক্ষতি হচ্ছে, অথচ এত বড় গাছ কাটারও সরকারি অনুমতি পাওয়া যাবে না। তাহলে কি করা যায় ভেবে যখন রমেনবাবুর মানসিক টালমাটাল অবস্থা তখনই ঘটল অঘটনটা। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখেন শিরিষ গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে একটি আদিবাসী মেয়ে। জানা গেছে পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ায় আগের রাতে বাবা-মা বকাবকি করাতেই এই পরিণতি।

ঘটনাটা গ্রামে সাময়িক তরঙ্গ তুললেও থিতিয়ে আসতে সময় লাগে না। তবে সেদিন থেকে শিরিষতলায় ছেলেমেয়েদের আনাগোনা আগের তুলনায় অনেক কমে যায়। কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনাটি গ্রামের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিশেষ ছাপ ফেলতে না পারলেও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটে যাওয়া আরও একটি ঘটনা ডালিমপুরের মানুষের মনে গভীর দাগ কেটে গেল।

একদিন স্কুলে ক্লাশ চলাকালীন একটি মেয়ে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে যখন কড়িডোরের মধ্য দিয়ে প্রস্রাবাগারের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, পাশেই পরিত্যক্ত একটি প্রায়ান্ধকার কামরার দিকে চোখ পড়তেই ' ও মাগো' বলে আর্ত চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার চিৎকারে প্রায় পুরো স্কুলই হামলে পড়ে। রমেনবাবু, আরও দু-একজন শিক্ষক মেয়েটিকে ঐ অবস্থায় স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। অল্পক্ষণের চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে মেয়েটি উঠে বসলেও কিছুক্ষণ আগে চোখে দেখা দৃশ্যটির কথা মনে হতেই তার চোখমুখ থেকে আতঙ্কের রেশ কাটে না। চিকিৎসকরা জানান কোনো কারণে মেয়েটি অত্যধিক ভয় পাওয়ায় এমন হয়েছে। তবে, এখন আর ভয়ের কোনো কারণ নেই।

সুস্থ হওয়ার পর মেয়েটি বলে, বাথরুমে যাওয়ার সময় পাশের অন্ধকার ঘরে সে সেই মেয়েটিকে দেখেছে যাকে কদিন আগে শিরিষ গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছিল।

গুজব বাতাসের আগে ছোটে। অপঘাতে মরা মেয়েটির আত্মা স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে, রটনাটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। সত্যি-মিথ্যার যাচাইয়ে না গিয়ে অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য এবং হাটে-বাজারে, ঘাটে-মজলিশে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ঘোর সন্ধ্যায় কিংবা রাতের অন্ধকারে দুর্বল মনের মানুষেরা প্রায়ই এখানে ওখানে ভূতের দর্শন পেতে শুরু করল। আর যেহেতু স্কুলের মাঠের গাছেই গলায় দড়ির ঘটনাটি ঘটেছে, তাই অনেক অভিভাবকই নিরাপত্তার কারণে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিল।

কিন্তু শিক্ষকদের তো স্কুলে না এসে উপায় নেই। প্রথমত আসতে হবে চাকরি বজায় রাখতে। দ্বিতীয়ত, ভূত বা অপদেবতা বলে যে কিছু নেই তা প্রমাণ করে ছাত্রদের মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে।

এরকম একটি দিনে রমেনবাবু টিচার্সরুমে যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে বসে রয়েছেন

তখন সাফাইকর্মী ফুলমতিয়া ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে হাত জোড় করে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে বলে, 'গোড় লাগি মাস্টারজী।'

রমেনবাবু তাকে দেখে বিষণ্ণ মনে বলেন, 'ভালো আছিস তো ফুলমতিয়া।'

—হাঁ মাস্টারজী। ভাল আছে। লেকিন....! ফুলমতিয়া ইতস্তত করে।

ফুলমতিয়ার হাবভাবে রমেনবাবুর মন সন্দিহান হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'তুই কি কিছু বলবি ফুলমতিয়া!'

—হাঁ মাস্টারজী। লেকিন আমার কোনো কসুর নেহী আছে। ও লেড়কি যো রোজ কামরাকে অন্দর ভূত দেখল না, তো উসি সময় ওহি কামরা সাফাইকে লিয়ে হাম কামরাকে অন্দর বইঠা থা। কা করে মাস্টারজী, লেড়কীলোগ চিল্লা চিল্লাকে ইতনা শোর মচায়া কি হাম ডরসে বাহার নিকাল না পায়ে। সব আদমি চলা যানে কা বাদ হাম অন্দরসে নিকালকে ভাগ গয়ি।

ফুলমতিয়ার কথা উড়িয়ে দেওয়ার নয়। আড়াইমণি আলকাতরানিন্দিত শরীরে, ওপরের পাটির কয়েকটি দাঁত মাড়ি ছেড়ে বাইরে দৃশ্যমান, তার ওপর তেল চুকচুকে চওড়া কপালে ভোরের সূর্যের মতো বিশাল সিঁদুরের টিপ দিনের বেলাতেই শিশুমনে ভয় জাগাতে যথেষ্ট। আলো-আঁধারিতে কম বয়সী মেয়েটি যদি ওকে দেখে ভূত ভেবে ভয় পেয়ে থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এতদিনে ভূতরহস্য রমেনবাবুর কাছে পরিষ্কার হয়। কিন্তু তিনি তখন মনে মনে অন্য অঙ্ক মেলানোর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। সামনে ফুলমতিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন, 'ঠিক আছে, আমাকে যা বলেছিস তা আর কাউকে বলিস না। তাহলে কিন্তু তোর চাকরি বাঁচানো মুশকিল হবে। জানিস তো, জানাজানি হলে হয়তো তোর জেলও হতে পারে। আমি কাউকে বলব না। তুই এখন যা।'

জেল কিংবা থানা পুলিশে ফুলমতিয়ার খুব ভয়। সে কম বয়সে দেখেছে তাদের গ্রামের মুখিয়া মিথ্যে সন্দেহের বশে তার ভাইকে চোর সাব্যস্ত করে জেলে পাঠিয়েছে। পুলিশ সত্য-মিথ্যার যাচাইয়ে গেলো না। মুখিয়ার কথাই বেদবাক্য ধরে নিয়েছিল। এখানেও মাস্টারজীকে তার মুখিয়া বলেই মনে হল। কাজে কাজেই যেচে কে আর নিজের বিপদ ডেকে আনতে যায়। আর কাউকে সে এ কথা বলে? বরং আধ বিঘত জিহ্বা কেটে মা কালী হয়ে দিব্যি খেয়ে বলে, 'নেহী মাস্টারজী, রামজীকা কসম। আমি আর কাউকে বলবে না।'

সময় নষ্ট না করে সেদিন বিকালেই রমেনবাবু ছোটেন পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি। প্রধান বাড়িতেই ছিলেন। রমেনবাবুকে দেখে বলেন, 'আরে, মাস্টার যে। আসো আসো, অসময়ে?'

দাওয়ায় বসে রমেনবাবু বলেন, 'একটা বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। স্কুলের খবরটা তো আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

স্কুলের অনেক বিষয় নিয়ে প্রায়ই রমেনবাবু প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন।

আজকে কোন প্রসঙ্গে কথা বলতে এসেছে বুঝতে না পেরে বলেন, 'কোন খবরটা মাস্টার?'

—ঐ যে, স্কুলে ভুতের উপদ্রবের কথাটা।

রমেনবাবুর কথা শেষ হতেই প্রধান হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বলেন, 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐরকমই একটা কথা কানে এসেছে বটে। তা খুলে বল দিকি মাস্টার আসল বিত্তান্ত কি?'

গুছিয়ে বলতে রমেনবাবু একটু সময় নেন এবং পুরোটা বলা হলে বলেন, 'এমনিতেই তো স্কুলে ছাত্র কম। তারপর ভুতের ভয়ে বাপ-মায়েরা তো ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতেই দিতে চায় না। বলে, ভুতে নাকি ঘাড় মটকাবে।'

—কথাটা চিন্তার বটে। তা তুমি কি করতে বল?

—আমি বলি কি যত নষ্টের মূল ঐ শিরিষ গাছটা। ঐ গাছেই তো মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। এখন ঐ গাছেই ওর আত্মা বাসা বেঁধেছে। আর মাঝে মধ্যে স্কুলে ঢুকে বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছে। এখন উচিত ভুতে পাওয়া গাছটাকে কেটে ফেলা।

কথাটা শুনে আঁতকে ওঠেন প্রধান। বলেন, 'কি আজগুবি কথা বলছো? তাই কখনও হয় নাকি? এটা কিন্তু মাস্টার তোমার উপযুক্ত কথা হল না। তোমরা লেখাপড়া জানা লোক, কোথায় তোমরা গ্রামের মানুষদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভুতের ভয় থেকে মুক্ত করবে, তা নয় নিজেরাই ভুতের ভয় পেয়ে বসে আছো। ভাবতো কত লোক রোজ রেললাইনে গলা দিয়ে অপঘাতে মরছে, তারা কি সব ভূত হয়ে রেললাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে? নাকি সরকার ভুতের ভয়ে রেললাইন তুলে ফেলছে? খবরের কাগজে তো হামেশাই পড়ছি শহরের অনেক উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়ে মানুষ আত্মহত্যা করছে। সেই মৃত মানুষের আত্মা কি সেই ফ্ল্যাটে ভুত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, না ভুতের ভয়ে ঐ ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে মানুষ অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে! সেজন্যই বলছি মাস্টার গাছ কাটা যাবে না। গাছে ভুত বাসা বেঁধেছে এই হাস্যকর অজুহাতে সরকারি আইন আমায় ছাড়বে না। পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে আমি ফেঁসে যাবো।'

প্রধানের যুক্তিপূর্ণ কথায় মুখ খুলতে না পারলেও হাল ছাড়েন না রমেনবাবু। তিনি বলেন, 'এটা আমার বা আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। কথাটা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের। প্রশ্নটা স্কুল বাঁচানোর। যদি স্কুলে ছাত্রই না আসে তবে স্কুল চলবে কাদের নিয়ে? সরকার তো মাসে মাসে স্কুলের জন্য টাকা দিচ্ছে। জবাবদিহি তো আপনাকেই করতে হবে।' এটুকু বলে আড়চোখে একবার প্রধানের মুখের দিকে তাকায়। অনুমানে প্রধানের প্রতিক্রিয়া বুঝে নিয়ে আবার শুরু করেন, 'তাছাড়া সামনে পঞ্চায়েত ভোট। যদি গোঁ ধরে থেকে গাছ কাটার অনুমতি না দেন তো না দেবেন। তবে প্রতিপক্ষ কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। তারা এটাকেই ইস্যু করে প্রচারে নামবে। ভোটের বাক্সে কিন্তু এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। এবার আপনার জেতার সম্ভাবনা নিয়েও সন্দেহ দেখা দেবে। যদি তাই হয়, পার্টির কাছে কিন্তু আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্যই বলছি, ব্যাপারটা আর একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন।'

নির্বাচন লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রধান নিজেও প্রার্থী। এমন সময় উটকো ঝামেলা ঘাড়ে এসে চেপেছে। সহজবোধ্য কারণেই প্রধান বিব্রত। দীর্ঘক্ষণ থম মেরে থেকে গাছ কাটার পক্ষে এবং বিপক্ষে নিজেকে দাঁড় করিয়ে মনে মনে চুলচেরা হিসাব করতে থাকেন। তার এখন ছুঁচো গেলার অবস্থা। মাস্টারের কথা যেমন গিলতেও পারছেন না, আবার ফেলে দিতেও পারছেন না। অন্তত এই মুহূর্তে। অথচ সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হবে। অনেকক্ষণ পর দ্বিধাগ্রস্ত প্রধান রমেনবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলেন, 'দেখ মাস্টার তুমি যা বলছ তা একদিকে ঠিকই। কিন্তু ভুত আছে বলে আমি নিজেই বিশ্বাস করি না। কাজেই যা করতে হয় তুমি নিজের দায়িত্বে কর। আমাকে আর এর মধ্যে টানবে না।'

পরদিন সকালে ডালিমপুর গ্রামের মানুষের ঘুম ভাঙে একটি দুঃসংবাদে। স্কুলের মাঠে ভুতে পাওয়া গাছটি আর নেই। কে বা কারা গাছটি মূল থেকে কেটে নিয়ে গেছে। এমনকি আশেপাশে একটা পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই। খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীদের একজন বলে, 'এটা নিশ্চয় গাছ চোরেদের কাজ।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তার কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'হতেই পারে না। সে ছোটবেলায় মামাবাড়িতে ভুত তাড়াতে দেখেছে। যাকে ভুতে ভর করেছিল, তাকে ছেড়েঁ যাওয়ার প্রমাণ হিসাবে কাছাকাছি গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে গেছে। নিয্যস এটাও ঐরকমই কিছু একটা হবে।'

বারান্দা থেকে শূন্য চোখে স্কুলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শৈলশ্রী। তার মনে হচ্ছিল গাছ নয়, যেন কোনো অদৃশ্য ঘাতক তাকেই কেটে ফেলেছে। মর্মবেদনায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রায় আর্তনাদের গলায় বলেন, 'হায় ভগবান, এমন কাজও মানুষ করতে পারে? স্কুলের ছেলেমেয়েগুলির কথা একবারও ভাবল না।'

পাশে দাঁড়ানো রমেনবাবু স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে স্বগতোক্তি করেন, 'বাড়িটা এবার রোদ পাবে।'

লাল গাড়ি

কম-বেশি ঘণ্টা দেড়েক তাস পিটিয়ে প্লাটফর্মে নেমেও তর্ক থামে না। 'চিড়িতনের বিবি চেপে লিড দিলি কেন? ওখানে কি তোর ডবল হয়? বে-ফালতু গেমটা করে দিলি।' উত্তেজিত স্বরে নিজেদের মধ্যে কথাগুলি নাড়াচাড়া করে হাঁটতে গিয়ে রতন থমকাতে বাধ্য হয়। এগিয়ে দেয়া প্রসারিত হাতে চোখ পড়তেই বুকে পাইলিং-এর কঠিন ধাতব শব্দ। ভূত দেখার আতঙ্কে শিউরে ওঠে সে। লোকের ভিড়ে এতক্ষণ খেয়াল করেনি—সামনে পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে চারদিকেই কালো কোটধারী টিকিট পরীক্ষক। স্পেশ্যাল মোবাইল চেকিং।

—টিকিট?

রতনের হিম হয়ে আসা শরীরের হাঁটু দুটোয় বে-সামাল ঠক্‌ঠকানি। চৈত্রের রোদভরা সকালেও চোখে অমাবস্যার অন্ধকার। এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারে পালানো মুশকিল। তবুও মরীয়া রতন জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সপ্রতিভ হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে জবাব দেয়, 'মান্থলি।' কিন্তু উচ্চারিত শব্দটি নিজের কানেই গোঙানির মতো শোনায়।

—দেখান।

উভয় সঙ্কটে রতন। চটজলদি রেহাই পেতে আগুপিছু না ভেবে বলে ফেলেছে, 'মান্থলি।' ভেবেছিল হয়তো দেখতে চাইবে না, সাধারণত চায়ও না। কিন্তু বিধি বাম। দেখাতে না পারলে কপালে দুর্ভোগ আছে—ভাবতে গিয়েই তলপেট গুড়গুড় করে ওঠে, বড় বাইরে যাবার তাগিদ অনুভব করে। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সে মনে মনে ঠিক করে শেষ চেষ্টাটাই এবার করতে হবে। পকেট থেকে অ-দরকারি পুরনো টুকরো কাগজ, বাতিল ক্যাশমেমো সরকারি হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি বের করে আড়চোখে টিকিট কালেক্টরের দিকে চেয়ে মান্থলি খোঁজার ভান করে। ট্রেনটি ততক্ষণে প্লাটফর্ম ছেড়ে শিয়ালদামুখী। টিকিট চেকারের মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় লাইনে লাফিয়ে নেমেই উল্টোমুখে প্রাণপণ দৌড়তে শুরু করে। দেখাদেখি বিনা টিকিটের আরো কয়েকজন তাকে অনুসরণ করে। কিন্তু যাবে কোথায়? প্লাটফর্ম থেকে উল্টোডাঙা ব্রিজ পর্যন্ত রেললাইনের দুধারে ইতস্তত দাঁড়ানো রেল পুলিশের জাল কেটে কারো পক্ষেই পালানো সম্ভব হয় না।

মাঝখান থেকে দৌড়তে গিয়ে পাজামায় জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে লাইনের ওপর পড়ে পাজামাটা ফর্দাফাঁই—হাঁটু দুটোও ছড়ে গিয়ে রক্তারক্তি।

আপ ডাউন দুটি লাইনের, ডাউনটির দখল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাল রঙের বগিওয়ালা বিশেষ ট্রেন—বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা। বগির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'আগে টিকিট কাটুন, পরে ট্রেনে চড়ুন।'

বলিষ্ঠ একটি হাত হ্যাঁচকা টানে রতনকে টেনে তুলে বলে, 'ছোঁড়া, পালাচ্ছিলি কেন? টিকিট দেখা।'

ঝাঁটাগুঁফো, মুখে বসন্তের দাগযুক্ত লোকটির পেশিবহুল চেহারা নজর করতেই শরীর অবশ হয়ে আসে। রীতিমতো ব্যায়াম করা চেহারা। রতনের অনুমান, সাদা পোষাকের কোনো অফিসার-টফিসার হবে নিশ্চয়। সে আমতা আমতা করে, 'আজ্ঞে, তাড়াতাড়িতে টিকিট কাটতে পারিনি।'

—'খুব ভালো কাজ করেছিস। বাড়ি কোথায়?'

রতন অবলীলায় মিথ্যা বলে, 'বিরাটী।'

বলিষ্ঠ লোকটি সহকর্মীকে ডেকে বলে, 'সরকারদা, এর ফাইনটা নিয়ে নিন।' রতনের দিকে ঘুরে, 'পঞ্চান্ন টাকা দে।'

টাকার অঙ্ক শুনে রতনের মাথা ঝুলে পড়ে। সে মিন মিন করে, 'আজ্ঞে আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।'

কথা না বাড়িয়ে কর্তব্যপরায়ণ লোকগুলি আতিপাতি রতনের শরীর হাতড়ায়। পকেটে পাঁচ টাকার একটা কয়েন ছাড়া কিছু না পেয়ে হতাশ গলায় বলে, 'স্যার, কিছুই তো নেই।'

—'কিরে, টিকিটও কাটবি না, ভাড়াও দিবি না অথচ রোজ ট্রেনে চাপবি। বাপের গাড়ি পেয়েছিস নাকিরে? রেলমন্ত্রি তো তোদের জন্য পনের টাকার মান্থলির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেটাও তো অন্তত কাটতে পারিস।'

হ্যাঁ, ঐ রকম একটা কথা লোকমুখে শুনেছে বটে, তবে সে যে দেখতে কেমন, কোথায় পাওয়া যায় তার হদিশ রতন জানে না। কেউ কেটেছে এমনও দেখেনি। পনেরো টাকার মান্থলির সুযোগ এ যাবত তার অধরাই রয়ে গেছে। তা বাদে ঠাকুরনগর থেকে যাতায়াত করা তার মতো অনেক স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে রোজ টিকিট কাটা বা মান্থলি করা, পেটে কাপড় বেঁধে বিলাসিতারই নামান্তর। ফলে, টিকিট না কাটাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর এই মুহূর্তে যদিও সে বিনা টিকিটের যাত্রী, দণ্ডনীয় অপরাধী, তবুও এতক্ষণ ধরে তুই তোকারি, বাপ তুলে কথা, তলে তলে শরীরে যে একটা মৃদু জ্বলন শুরু হয়েছে, রতন টের পায়। কিন্তু যতটা সম্ভব সংযত থেকে মোলায়েম স্বরে বলে, 'বাবু টিকিট কাটার পয়সা থাকলে, আপনার ট্যারা ট্যারা কথা শুনতে কে আসত? বলছি তো অন্যায় হয়ে গেছে, আর কোনোদিন বিনা টিকিটে আসব না—আজকের দিনটা মাফ করে দিন।'

রতন যতই গলা মোলায়েম করুক না, সহজাত কর্কশ স্বর সে ঢাকতে পারে না। ফলে তার প্রথম কথাতেই টিকিট চেকারের মেজাজ বিগড়ে যায়, শেষের কথাগুলি শোনার মতো ধৈর্য বা মানসিকতা কোনোটাই অবশিষ্ট থাকে না। প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলে, 'চল শালা, মজা দেখাচ্ছি' বলে একরকম ঘাড় ধরেই লাল গাড়ির কামরায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ক্ষণিকের ভুলে বচসায় জড়িয়ে রেহাই পাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হতে দেখে রতন হতাশায় ভেঙে পড়ে। ইচ্ছে হয় নিজের হাত কামড়াতে অথবা টেনে চুল ছিঁড়তে। উপরন্তু পরিণতির কথা ভেবে কান্না পেয়ে যায়। কামরার এক কোণে বসে নিরুপায় রতন নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে।

বাইরে তখনো ধরপাকড় চলছে সমানে। কেউ কেউ অর্থদণ্ড দিয়ে রেহাই পায়। যাদের অর্থবল কম, তারা চেকারের সঙ্গে সমঝোতায় এসে চার পাঁচজনে মিলে একটি টিকিটের ভাড়া এবং ফাইন দিয়ে পার পেয়ে যায়। যারা কিছুই দিতে পারে না তাদের ঠাঁই হয় লাল গাড়ির ভেতর।

প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে উঠে রতন চারদিকে ভালো করে তাকায়। ভেতরটা দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রামের কামরার মতো। দু'পাশে বেঞ্চ পেতে বসার জায়গা, মাঝখানে ফাঁকা। যারা জায়গা পেয়েছে বেঞ্চিতে বসেছে, বাকিরা মেঝেতে।

বিনা টিকিটে ধরা পড়া রতনের কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগেও দুবার ধরা পড়েছিল শিয়ালদায়। প্রথমবার প্লাটফর্মের অবাঙালি সিগারেট বিক্রেতার কাছে শাল বন্ধক রেখে ফাইনের টাকা জোগাড় করেছিল। পরে এসে ছাড়িয়ে নিয়েও গিয়েছিল। এখন সে-সব সুবিধা আর নেই। রেলের চৌহদ্দির মধ্যে বিড়ি-সিগারেট বিক্রিই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়বার জরিমানার টাকা দিতে না পারায় সোজা হাজতবাস—পাঁচদিনের। সে-সব অনেক দিনের কথা। তবে এবারের অভিজ্ঞতাটাই আলাদা। লাল গাড়ি এনে বিনা টিকিটের যাত্রীদের এমন ফাঁদে ফেলতে রতন আগে দেখেনি—কল্পনাও করেনি।

একটা তর্কাতর্কির আওয়াজ কানে আসতেই রতন সেদিকে মুখ ফেরায়। চারজন মহিলার সাথে চেকারের তর্ক হচ্ছে। আপাত নজরে মহিলাদের দুঃস্থ পরিবারের বলেই মনে হয় রতনের। অন্তত পোষাক-আশাক সেই ধারণাই দেয়। ওরা তর্ক করলেও সেটা কখনোই চড়া মাত্রায় ওঠে না, বরং তরলতায় গড়িয়ে যায়। চেকার বলে, 'টিকিট না কেটে তোরা গাড়িতে চড়িস কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে মুখরা মেয়েটি জবাব দেয়, 'মামার গাড়িতে চড়তি গেলে টিকিট লাগে নাকি?'

—লাগে কি লাগে না যখন চালান করে দেব টের পাবি। চেকার ভয় দেখায়।

সঙ্গিনী হেসে লুটোপুটি। যেন সে একটা আজব কথা এই প্রথম শুনল এমনভাবে চোখ ফেড়ে বলে, 'তালে কি মজা হবে বল দেখি! খাটতি হবে না, বসে বসে খাতি পাব। আবার যেদিন ছাড়া পাব তোমাদের নাকের ডগা দিয়েই বিনা টিকিটে ড্যাং ড্যাং করি চলি যাব।'

—তোরা জ্বালাতে আসিস কেন বলতো!

—তোমরাই বা ধর কেন?

—ওটা তো আমাদের ডিউটি। চাকরি করতে গেলে ডিউটি দিতেই হয়।

—তালি চাকরি কর কেন?

চেকার ভদ্রলোক এবার হেসে ফেলে। হেসেই উত্তর দেয়, 'কেন আবার, পেটের জন্য।'

চেকার হাসলেও মুখরার কালো মুখ আরো কালো হয়। খেদ নিয়ে বলে, 'বাবুগো, আমরাও এই পেটের জন্যিই রাইত থাকতে উঠে ডিউটি দিতি আসি। পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালাগো, বাবু।'

চেকারের গলা খাদে নামে। জিগ্যেস করে, 'কি কাজ করিস রে তোরা?'

—বাড়ি তৈরির কাজে জোগালি খাটি।

—দিনে কত পাস?

আবার শব্দ করে হেসে ওঠে মেয়েটি। বলে, 'শুনবা, তালি শোনো। আমাগের রেট ষাইট ট্যাকা, হাতে পাই চল্লিশ। বাকিটা, যে কাজে লাগায় তার দালালি।'

—তোদের স্বামীরা কী করে?

এবার দু'জনেরই কামরা-ফাটানো হাসি। রতন ভেবে অবাক হয়, অভাব যাদের পিছু ছাড়ে না, এত হাসির জোগান তারা পায় কোথা থেকে! বড়লোকদের সে কখনও এমন হাসি হাসতে দেখেনি— কোনো অভাব না থাকা সত্ত্বেও। অথবা বড়লোদের কি হাসতে মানা? হবে হয়তো। চেকারের প্রশ্নের জবাবে হাত দুটো একসাথে গালের পাশে জড়ো করে মাথা হেলিয়ে শোবার ভঙ্গি করে হাসতে হাসতে বলে, 'সোয়ামীরা খায় আর ঘুমায়।'

এমন নাটুকে হাবভাবে কথাগুলি বলে যে, চেকারও হেসে ফেলে। ওরা চারজন বে-কসুর খালাস পেয়ে যায়।

ট্রেনের কামরায় ধূমপান নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও পরিচিত ব্রান্ডের সিগারেটের গন্ধ নাকে এসে লাগতেই রতনের চমক লাগে। গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে তার চোখ বড় হয়ে ওঠে। সিগারেট টানছে তার নিত্যকার সহযাত্রী ধোপদুরস্ত বাসুদা—বাসুদেব ভট্টাচার্য। সেন্ট্রাল ডেয়ারির উচ্চপদস্থ চাকুরে। এতক্ষণ রতন যে হীনম্মন্যতায় ভুগছিল, বাসুদেবকে দেখে সে নিজেকে তার সমান উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে তৃপ্তি পায়। লাল গাড়ির দৌলতে দুজনেই আজ একাসনে ঠাঁই পেয়েছে। অথচ কম বজ্জাত এই বাসুদেব, যা রতন প্রায় প্রত্যেকদিন টের পায় হাড়ে হাড়ে। দত্তপুকুর থেকে উঠেই কাউকে না কাউকে সিট থেকে তুলে দিয়ে নিজে বসবে। নাক সিটকে বলবে, ডব্লিউ টিগুলো কেন যে সিট অকুপাই করে থাকে আমার মাথায় আসে না। সামান্য সিভিক সেন্সটুকু পর্যন্ত নেই।'

রতনের জিব সুড়সুড় করে। এই মুহূর্তে বলতে ইচ্ছে করে, 'আবে, সিভিক সেন্সের বাচ্চা, ননসেন্সের মতো আজ আমাদের দলে কেন?' সে পায়ে পায়ে বাসুদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

রতনকে দেখে বাসুদেব চমকে ওঠে। ইজ্জত বাঁচাতে দেঁতো হাসি দিয়ে অপ্রস্তুতের গলায় বলে, 'এই যে রতন, আচ্ছা বলতো মানুষের কি ভুল হয় না? মান্থলিটা কাটতেই

ভুলে গেছি। কবে যে শেষ হয়ে গেছে নানা কাজে খেয়ালই করিনি। এরা কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে চাইছে না। দেখ দেখ তুমিই দেখ।' নিজের সততার প্রমাণ রাখতে খাপসুদ্ধ মাস্থলি টিকিটটা রতনের সামনে মেলে ধরে।

রতন দেখে দু-সপ্তাহ আগেই টিকিটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং চমক লাগে মান্থলি টিকিটটা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিধাননগর অবধি দেখে। রতন মনে মনে হিসেব কষে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরের মাইনে এখনকার দিনে কত হতে পারে? পাঁচ হাজার, সাত হাজার কিংবা দশ হাজার, সে আর এগোতে সাহস পায় না। এগোতে দেয় না তার সীমাবদ্ধতা। সে যে পরিবেশের মানুষ দশ হাজারের ওপর মাইনে সে ভাবতেই পারে না। তবুও তার মনে হয় পাঁচ-দশ যাই হোক না কেন ঐ টাকাটা কি দেড়শ টাকার মান্থলি কাটার পক্ষে খুব কম? অথবা জরিমানা দেবার মতো টাকাও কি এই মুহূর্তে বাসুদেবের কাছে নেই? সবটাই তবে বারফাট্টাই? ভদ্রলোকদেরই চরিত্র যদি এই হয় তবে তার মতো নুন আনতে পান্তা ফুরায় গোছের মানুষদের সততা নিয়ে এত কূটকচালি কেন?

রতন যখন আপন মনে এসব ভাবছে নিরুদ্বেগ বাসুদেব তাকে অবাক করে টিফিনের কৌটো খুলে খাবার খেতে শুরু করে। রতন লক্ষ্য করে শুধু বাসুদেব নয়, অনেকেই তাদের সঙ্গে আনা টিফিন খেতে শুরু করেছে।

উদ্বেগে ছিল বলে এতক্ষণ বোঝা যায়নি, কিন্তু এবার সবাইকে খেতে দেখে রতনেরও খিদে পায়। ভীষণ খিদে। সকালে খেয়ে বেরোয়নি, রোজ যেমন টিফিনের গুড়-রুটি নিয়ে আসে আজ তাও আনেনি। আসলে, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শ্যামলীকে বলে বেরিয়েছিল হাফ রোজ ডিউটি করেই চলে আসবে। আজ যে তিতলি সোনার জন্মদিন। স্বজনবিহীন স্বামী-স্ত্রীর পর্বতপ্রমাণ অভাবের সংসারে দু-বছরের তিতলিই জীবনের একমাত্র চিরাগ হয়ে বিরাজ করছে। আয়োজন আহামরি কিছু নয়, তার যা সঙ্গতি তাতে সম্ভবও নয়; তবুও নিত্যদিনের ডালভাতের সঙ্গে একটু অন্য স্বাদের ব্যঞ্জন আর তিতলির জন্য একটু পায়েস। কিন্তু বাদ সেধেছে লাল গাড়ি। এই মুহূর্তে কার্যত সে বন্দি।

পাশের ছেলেটির হাতঘড়িতে চোখ পড়তেই রতন ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে। তিনটে বেজে গেছে। আর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে শ্যামলী নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘর-উঠোন করছে। বেলা যত গড়াবে শ্যামলীর চিন্তা ততটাই দ্রুতগতিতে দুশ্চিন্তায় বদলে যাবে। আজকাল পথে-ঘাটে চলতে ফিরতে হাতে প্রাণ নিয়ে বেরোতে হয়। খবরের কাগজে তো আকছার দেখছে নানা দুর্ঘটনার খবর। আর যদি বিনা টিকিটের দায়ে হাজতবাস হয়— লোকমুখে শুনেছে এখন নাকি কম করেও পনের দিন। তাহলে? স্ত্রী-কন্যার নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে মনটা বিষাদে ছেয়ে যায়।

মন যত খারাপই লাগুক খিদে কিন্তু রতনের পিছু ছাড়ে না। অন্যকে খেতে দেখে পেটে যেন দ্বিগুণ জ্বালা শুরু হয়। তার মনে হয়, এই যে এত লোক খাচ্ছে অথচ সে খাচ্ছে না—এমন কি কেউ নেই যে তাকে বলবে, নাও রতন আমরাও খাচ্ছি তুমিও দুটো

মুখে দাও। অথবা কারো তো পেট ব্যথাও শুরু হতে পারে—খাবারটা নষ্ট না করে রতনকে দেয়। কিংবা নেতারা তো হামেশা বলে থাকেন স্বেচ্ছায় না দিলে ছিনিয়ে নিতে হয়। নেবে না কি? তাহলে অবশ্য হাটুরে মার একটাও মাটিতে পড়বে না। সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই সবাই খাওয়া শেষ করে। অগত্যা এক জনের কাছ থেকে চেয়ে আধবোতল জল খেয়ে রতন খিদে সামাল দেয়।

আপাতত ভাবনা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ফলে ভাবনা ভাবতে গিয়ে আজকের দুর্গতির জন্য রতনের যত রাগ গিয়ে পড়ে মালিকের ওপর। গতকাল অনেক করে পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিল জন্মদিনে মেয়েটাকে একটা জামা কিনে দেবে বলে। মালিক দেয়নি। তার বক্তব্য, শনিবারেই তো হপ্তা পাবে আবার মাঝে টাকা কেন? কিন্তু রতন জানে ওটা বাহানা। আসলে কাজের চাপ—রতনই একমাত্র মেশিনম্যান, কামাই করলে মালিক বিপাকে পড়ে যাবে। ছোট ছাপাখানার এটাই আদত, মরতে মরতেও কাজ তুলে দিতে হবে, নইলে খদ্দের বিগড়ে যাবে। শেষে রতন এই কড়ারে রাজি হয়েছিল হাফ বেলা ডিউটি করে ফেরার পথে হাতিবাগানে চৈত্র-সেলের দোকান থেকে মেয়েটার জন্য একটা জামা নিয়ে যাবে। কিন্তু কপাল যদি মন্দ হয়, লোকে শুকনো মাটিতেও আছাড় খায়।

একদিকে বাড়ির চিন্তা অন্যদিকে পেটে ছুঁচোবাজি—রতন কাহিল হয়ে পড়ে। রেল কম্পানির ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়। যেন নিজেকে শোনাতেই বলে, 'বেলা তো শেষ হতে চলল আর কখন চালান দেবে। যা করার তাড়াতাড়ি কর না বাবা, খিদেয় যে মরে গেলাম।'

একটু পরেই ট্রেন চলতে শুরু করে। দুলুনিতে ক্লান্ত চোখ দুটো বুজে আসে রতনের, একসময় গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে। ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে— সে হাজতে বসে আছে। সামনে ধবধবে বিছানা, লোভ হয় একটু গড়িয়ে নিতে। বিছানায় উঠতে গিয়েও পারে না চাদর নোংরা হবার ভয়ে। তার সারা শরীরে যে কাদা। ফের সে মেঝেতে এসে বসে। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখে, বাইরে গোঁফওয়ালা বর্ষীয়ান পাহারাদার টুলে বসে একমনে খইনি ডলছে আর গুনগুন করে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম—' গাইছে।

পাহারাওয়ালা যেন এতক্ষণ দোসর খুঁজছিল। রতনকে দেখে গরাদের ফাঁক দিয়ে খইনি বাড়িয়ে বলে, 'লে বেটা খা লে।'

রতনের অভ্যেস নেই, মুখে দিতেই বিষম খায়। থুথু ছিটিয়ে পাহারাওয়ালার জামাকাপড় নষ্ট করে।

—'আরে সিয়ারাম, সিয়ারাম, সব বরবাদ কর দিয়া। তু ধক গয়া। জারা পানি পি লে বেটা।' পাহারাওয়ালা সান্ত্বনা দেয়।

খেঁকিয়ে উঠে রতন, 'পানি পি লে! আরে পেলে তবে তো পিব। দাও না এক গ্লাস জল।'

পাহারাওয়ালার কেমন যেন মায়া হয় রতনের ওপর। একটু অপেক্ষা করতে বলে ঝকঝকে পেতলের রেকাবিতে চারটে জলভরা সন্দেশ আর এক লোটা জল নিয়ে হাজির

হয়। একসঙ্গে চারটে জলভরা দেখে রতনের চোখ চকচক করে। সন্দেশের নাগাল পেতে তড়িঘড়ি গরাদের ফাঁক দিয়ে ধরতে গেলে সন্দেশসমেত থালা মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দ ওঠে।

রুলের গুঁতো খেতেই রতনের ঘুম ভাঙে। তাকে জাগাবার জন্য অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে পুলিশটি লাঠি উচিয়ে গুঁতোতে গেলে ধাক্কা লেগে কারো টিফিন কৌটো মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দে এদিক-ওদিক গড়ায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে রতন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে বাইরে অন্ধকার। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'জন লোক রতনকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'এখানে নেমে যা শালা, তোকে ছেড়ে দিলাম।'

তখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি। রতন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। কামরা প্রায় খালি, অবশিষ্ট কজন নেমে যেতে পা বাড়ায়। ধন্দে পড়ে রতন। জরিমানা হল না, জেলও হল না, অথচ ছেড়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে কোনো মতলব আছে কি না সে বোঝার চেষ্টা করে। ছোটবেলায় বাপ-কাকাদের মুখে শুনেছে নকশাল আমলে বন্দিদের পুলিশের জিপে করে রাতের অন্ধকারে দূরের কোনো মাঠে নিয়ে গিয়ে বলত, 'যা তোদের ছেড়ে দিলাম, আর কখনো এমন কাজ করবি না। যা পালা, দৌড়ে পালিয়ে যা।' মুক্তির আনন্দে, পুলিশের কথা বিশ্বাস করে যেই সবাই দৌড়তে শুরু করত অমনি পেছন থেকে বুলেট এসে ঝাঁঝরা করে দিত। সেই ভয়টাই এই মুহূর্তে রতনের বুকে চেপে বসে।

কামরা খালি করতে একজন রতনকে দরজার দিকে ঠেলে দেয়। জল দেখলে ছাগল যেমন এক পাও এগোতে চায় না, রতনও দুহাতে শক্ত করে দরজার হাতল ধরে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। বিরক্ত রেল কর্মীটি এরপর সজোরে রতনের পশ্চাদ্দেশে লাথি কষায়। আচমকা আঘাতে ছিটকে গিয়ে রতন পাথরের ওপর পড়লে কপাল কেটে রক্ত গড়ায়। ঐ অবস্থাতেও সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণভয়ে দৌড়তে শুরু করে এবং উপায়ান্তর না পেয়ে হাতের নাগালে ঘন বাবলা কাঁটার ঝোপে আত্মগোপন করে।

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে সিটি বাজে এবং রতনকে অবাক করে ট্রেনটি চলতে শুরু করে। পেছনের লাল বাতিটি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই রতনের বুক থেকে ভয়ের জগদ্দল পাথরটা নেমে যায়। তবুও নিশ্চিন্ত হতে আরো খানিকটা সময় সে ঝোপের মধ্যে বসে কাটায়।

ঝোপে ঝাড়ে জোনাকির আলো। ঝিঁঝির ডাক ভিন্ন অন্য শব্দ নেই। বাতাসে, গুমোট, যে কোনো সময় ঝড় উঠতে পারে। সঙ্গীরাও কেউ নেই, যে যার গন্তব্যে চলে গেছে। আদিগন্ত অন্ধকারে রতন দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে শরীরের অবস্থাও সঙ্গীন। হাত-পা, বিশেষ করে কানের লতি মশাব কামড়ে ফুলে ঢোল। বাবলা কাঁটার আঁচড়ে গাল-মুখ ফালা ফালা। বিন বিন রক্তের সঙ্গে ঘামের নুন মিশে জ্বলুনি শুরু হয়েছে।

এখন রাত কত, সে কোথায় দাঁড়িয়ে কিছুই অনুমান করতে না পেরে 'যা থাকে কপালে' ভেবে নক্ষত্রের আলোয় লাইন বরাবর সে একদিকে চলতে শুরু করে। প্রায়

আধ ঘণ্টা চলার পর সিগনালের লাল আলো দেখতে পেয়ে উজ্জীবিত হয় এবং আর একটু এগিয়ে কেবিনের গায়ে লেখাগুলি বিজলির আলোয় বানান করে পড়ে—সাতবেড়িয়া পশ্চিম কেবিন। এত দুঃখের মধ্যেও মনটা লাফিয়ে ওঠে। আরে সে তো বাড়ির প্রায় কাছাকাছি। কোণাকুণি হাঁটলে আট কিলোমিটার—কতক্ষণ আর লাগবে!

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-পথশ্রমে বিধ্বস্ত শরীরটাকে হিঁচড়ে এনে গভীর রাতে রতন যখন বারান্দায় ফেলে তখন কথা বলার শক্তিটুকুও প্রায় লোপ পেতে বসেছে। সে সটান মাটিতে শুয়ে হাঁপায়।

শ্যামলী জেগেই ছিল। হ্যারিকেনের আলোয় স্বামীর অবস্থা অনুমানে বুঝে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেয়। ধাতস্থ হয়ে কৈফিয়তের ঢঙে রতন ক্লান্ত স্বরে বলে, 'আসলে আজকেরে আমার...।'

—সন্ধ্যাবেলা রবিজ্যাঠার কাছে সব শুনিছি। শান্ত স্বরে শ্যামলী কথাগুলি বলে।

শ্যামলীর শীতলতা রতনকে দমিয়ে দেয়। মনের গভীরে একটা কাঁটা খচখচ করে। সে আশা করেছিল বাড়ি ফেরা মাত্র উদ্বিগ্ন শ্যামলী হয়তো ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করবে। অর্থাৎ সে আরো একটু বাড়তি গুরুত্ব পেতে চেয়েছিল। কিন্তু...। আচ্ছা শ্যামলী কি তার ওপর রাগ করেছে? মেয়ের জন্মদিন পালন করা হল না বলে মনে ক্ষোভ জমেছে? জমাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে সারাদিন ধরে যা যা ঘটেছে তাতে তো তার কোনো হাত ছিল না। কষ্ট তো শ্যামলীর একার নয়, যন্ত্রণা সে-ও তো কম ভোগ করেনি। চোখ বুজে রতন এসব ভাবে।

গালে ভিজে গামছার স্পর্শে রতন চোখ মেলে। শ্যামলী আলতো করে রক্ত মুছতে মুছতে শিউরে উঠে বলে, মাগো, কত রক্ত! কি করে কাটলো গো?'

রতন উত্তর দেয় না—নীরবে স্ত্রীর পরিচর্যাটুকু উপভোগ করে।

শ্যামলী নিবিষ্ট হয়ে রক্ত মোছে। তার হাতের ছোঁয়ায় রতনের সারাদিনের লাঞ্ছনা, অপমান, ক্লান্তি, হতাশা সব এক এক করে মন থেকে মুছে যেতে থাকে। ভারমুক্ত মনে আলতো করে একটা হাত শ্যামলীর পিঠে রাখতেই এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা উদ্বেগ কান্না হয়ে শ্যামলীর দুচোখ বেয়ে নামে। কান্নাজড়িত গলায় বলে, 'আমাদের যা জোটে তাই খাব, না জোটে না খাব—তুমি আর বিনা টিকিটে যাবা না। রবি জ্যাঠার কাছ থে শোনা ইস্তক আমার যে কি করে সময় কাটতিছে সে ভগমান বিনে কেউ জানে না।'

শ্যামলীর ভরসা জাগানো কথা কয়টি রতনকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে লতানে গাছ যেমন মাচার অবলম্বন খোঁজে, তেমনি রতনও শ্যামলীর একটি হাত শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে নিজেকে নিশ্চিন্তে সঁপে দেয়।

রক্তের টান

দুপুরের পর থেকেই মেজাজটা খিঁচড়ে রয়েছে সুধাংশুর। নিজের পেটের ছেলে, সুধাংশু অবশ্য ঔরস না বলে পেটেরই বলে। তা সে পেটের ছেলে যে কিনা বাপের বিয়ে তুলে পাঁচজনের সামনে এমন খিস্তিখামারি করল এবং প্রায় একরকম গলাধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিল, নিজের ক্ষেত্রে এমন না ঘটলে সুধাংশু এ কথা বিশ্বাসই করতে চাইতো না। সেই অপমানের জ্বালাটা এখনও বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছে। আর সেই ভাবনায় ডুবে গিয়ে বিকেল থেকে থম মেরে বসে রয়েছে বারান্দায়। কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে, আধো অন্ধকারে মশারা ছেঁকে ধরেছে সুধাংশুর সে হুঁশ নেই। থেকে থেকেই দুপুরের কথা যত মনে পড়ছে সুধাংশুর বেঁচে থাকার আকাঙ্খাও যেন তত কমে আসছে। চির দারিদ্র্যময় জীবনে কম অপমান তো তাকে হজম করতে হয়নি, আজকেরটা যেন এতদিনের সব অপমানকে ছাড়িয়ে গেছে।

বিকেল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। কয়েক ঘন্টার বর্ষণে জল পুকুর ছাপিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছে। নর্দমা আর পুকুরের জল মিলেমিশে একাকার। নিচু জমির বাড়ির উঠোনে হাঁটুজল। যদি নাগাড়ে আরো কয়েক ঘন্টা এমন বৃষ্টি হয়, তবে অনেককেই বাড়ি ছেড়ে স্কুল দালানে অথবা অন্য কোনোখানে আশ্রয় নিতে হবে।

ঘরের ভেতর থেকে নমিতা বারকয়েক ডাকলেও সে আওয়াজ আত্মবিস্মৃত সুধাংশুর কানে যায় না। বিরক্ত নমিতা এবার গলা চড়ায়, 'কি, হল কি! কথা কি কানে সেঁধোচ্ছে না? তখন থেকে ডেকে যাচ্ছি, বসে বসে কি নামাজ পড়া হচ্ছে?'

খনখনে উচ্চকিত গলা কানে গেলে অনেক দুঃখেও সুধাংশুর হাসি পায়। ভালোই বলেছে নমিতা। সে নামাজই পড়ছে বটে। 'আরে বাবা, নামাজ পড়লে যদি পেটের জোগাড় হতো তবে আমিও নামাজই পড়তাম, বুঝলে।' কথাটা জিভের ডগায় এলেও অশান্তির ভয়ে দু ঠোঁটের ফাঁক করে না। এই সময় মনে পড়ে বলাইয়ের কথা। এককালে কাচ-কারখানার সহকর্মী ছিল। বাসুলডাঙা না ডায়মণ্ডহারবার কোথা থেকে যেন আসতো। সে খ্রিস্টান হয়েছিল কি না নিজের মুখে কোনোদিন বলেনি। তবে, সে কিন্তু ওদের গাঁয়ের গির্জা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেতো। ফি রবিবার বলাইয়ের বউ গির্জা থেকে চাল-আটা-গম, কখনো কখনো জামাকাপড়ও আনতো। ওর ছেলেমেয়েরাও মিশনারি স্কুলে পড়তো। ভিনধর্মীদের কল্যাণে বলাইয়ের সৌভাগ্যকে নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে সুধাংশু বলাইয়ের প্রতি একটা চোরা বিদ্বেষ অনুভব করে।

আরেকবার নমিতার গলা কানে আসতেই রাগে দুমদাম পা ফেলে ঘরে ঢুকে সুধাংশু বিরক্ত গলায় বলে, 'কি, হয়েছেটা কি? ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন?'

সুধাংশুর উগ্রতাকে গায়ে মাখার পরিস্থিতি এখন নয়। নমিতা আপন বেগে বয়ে চলে। সে আরো এক পর্দা গলা চড়িয়ে বলে, 'কি হয়েছে মানে? চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? বলি, রাত্রে শোবে কোথায় সে খেয়াল আছে? নাকি সারারাত জেগে কাটাবে?'

এরকম প্রশ্নের জন্য সুধাংশু আদৌ তৈরি ছিল না। সে থতমত খেয়ে কুপির থিরথিরে আলোয় ঘরের চারদিকে চোখ বোলায়। টালির চালের ফুটো বেয়ে ঘরে জল পড়ছে। বিছানা গুটিয়ে তক্তাপোষের এখানে ওখানে হাঁড়ি-বালতি-গামলা বসিয়ে নমিতা বৃষ্টির জল ধরছে যাতে ঘর না ভেসে যায়। সুপারি পাতার শুকনো খোল কেটে চালের বাতায় টালির নিচে গুঁজে দিয়ে জল ঠেকানোর চেষ্টা করছে। তাতে বেগ খানিকটা কমলেও জল পড়া একেবারে বন্ধ হয় না।

আড়াই বছরের ছেলেটি গায়ে জল পড়ার হাত থেকে বাঁচতে গুটিসুটি এককোণে বসে জুলজুল চোখে মায়ের জল আটকানোর কায়দা দেখছে। মায়ের দেখাদেখি সেও দু-একবার ঘটি-বাটি নিয়ে আসরে নামতে গিয়েছিল, কিন্তু ধমক খেয়ে এখন চুপ।

অসহায় দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে নিজের অক্ষমতাকে নমিতার কাছ থেকে আড়াল করতে সুধাংশু অদৃশ্য বাড়িওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে গাল পাড়তে শুরু করে, 'হারামির বাচ্চা, শালা নিজে তো কোঠা ঘরে আরাম মারাচ্ছিস, বেধড়ক বৃষ্টিতে ভাড়াটে মরলো কি বাঁচলো সে খেয়াল আছে? ভাড়া তো শালা কম নিস না। ঘর সারানোর কথা বলতে গেলেই উঠে যাও, অন্য জায়গায় ঘর দেখ—কত পাঁয়তাড়া। যাবোই তো। সময় হলে ঠিকই যাবো। তোর বাড়িতে কি শালা চিরকাল থাকতে এসেছি?'

গাল পেড়ে সুধাংশুর মনের জ্বালার উপশম হয়তো খানিকটা হয়। তবে গাল পাড়লেও পাড়তে হয় গলা খাদে নামিয়ে। কেন না ঘরের লাগোয়া বাড়িওয়ালার একতলা দালান।

বৃষ্টির শব্দে এই ঘরের কথা ও ঘরে পৌঁছোবে না। তবুও সাবধানের মার নেই, কথাগুলি বাড়িওয়ালার কানে গেলে অশান্তি বাড়বে সেই আশঙ্কা থেকে নমিতা সুধাংশুকে নিবৃত্ত করতে কড়া চোখে তার দিকে তাকায়। তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যে বিশেষ কায়দায় ঠোঁট বেঁকিয়ে স্বরে ব্যঙ্গ বজায় রেখে কেটে কেটে বলে, 'তোর সঙ্গে না পারি, তোর গুঁয়ের সঙ্গে তো পারি। হুঁ, যত ক্যাদরানি ঘরের মধ্যে বউয়ের সামনে। বাইরে বলার তো মুরোদ নেই।'

খোঁচাটা দুর্বলতম জায়গায় গিয়ে লাগে। প্রত্যুত্তরে সুধাংশু কিছু বলতে পারে না। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে মরে। নমিতার তথাকথিত মুরোদ যদি সত্যিই সুধাংশুর থাকতো তবে হয়তো আজকের এই পরিস্থিতিই তৈরি হতো না। বাড়িওয়ালার লাথি-ঝাঁটাও খেতে হতো না।

একটা আধটা মাস তো নয়। নয় নয় করেও সুধাংশু ছটা বছর ভাড়াবাড়িতে বাস করছে। বলতে গেলে নমিতাকে নিয়ে ঘর বাঁধার পর থেকেই। সুমনের জন্মও এই বাড়িতেই। এতদিন তেমন অসুবিধা হয়নি। আয় ছিল, বাড়িভাড়া মেটাতেও বেগ পেতে

হয়নি। তখন খাতিরই আলাদা। বাড়িওয়ালার ভালো ব্যবহারের জন্য নমিতা নিজেও অনেক সময় গতরে খেতে দিত। বিনিময়ে মাঝে মধ্যেই রান্নার ভালো-মন্দ, এটা সেটা সুধাংশু যখন অনেক রাত্রে খেতে বসতো তার পাতে পড়তো। কিন্তু বছর দুই কি যে গেরো লেগেছে, সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না।

কলকাতার ফুটপাতে সুধাংশুর হরেকমালের ব্যবসা। ইদানিং পুলিশ খুব ঝামেলা করছে। এমনিতেই তো পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। হাত পেতেই রয়েছে। শুধু দাও আর দাও। দিতে পারলে নিশ্চিন্তি, না পারলেই ফুটপাত ছাড়ো পাবলিকের হাঁটার অসুবিধা হচ্ছে। ওঃ, তখন যেন পাবলিকের জন্য পুলিশের দরদ উথলে ওঠে। একেকটা যেন শিবের চ্যালা, জায়গামতো প্রণামী দিলেই আবার কিছুদিনের মতো সব ঠাণ্ডা।

হালে সংসার চালিয়ে সুধাংশু ঠিকমতো ঘরভাড়া গুনতে পারে না। প্রায় বছরখানেক বাকি পড়ে গেছে। ফলে বাড়িওয়ালার সঙ্গে সম্পর্কেও চিড় ধরেছে। এখন উঠেপড়ে লেগেছে তুলে দেওয়ার জন্য। ঘরের ইলেকট্রিক লাইন তো অনেকদিন আগেই কেটে দিয়েছে। এখন দেখা হলেই পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া। বাড়িওয়ালার সাফ কথা, বকেয়া না মেটালে ঘর সারাবে না। সুধাংশুও আজকাল পারতপক্ষে বাড়িওয়ালার সামনে পড়তে চায় না। দুজনের যেন চোর-পুলিশ খেলা চলছে।

শুধু সুধাংশু কেন, মানমর্যাদা থাকলে যে কোনো মানুষেরই বাড়িওয়ালার বর্তমান ব্যবহারে সম্মানে লাগার কথা। কিন্তু কাজের সুবাদে যেহেতু সুধাংশু প্রায় সারাদিনই বাড়ির বাইরে কাটায়, ঠেসমারা কথাগুলি নমিতাকেই শুনতে হয় বেশি। সে কারণেই গত রাতে সুধাংশুকে খেতে দিয়ে নমিতা বলেছিল, 'বাড়িওয়ালার অপমান হজম করার চেয়ে বরং বাড়ি ছেড়ে দাও। এমন তো নয় যে, এ বাড়ি ছেড়ে দিলে আমরা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াব। তোমার তো যাহোক নিজের একটা বাড়ি রয়েছে।'

সুধাংশুর কাছে বাড়ি বলতে তিন ভাইয়ের শরিকি বাড়িতে ইটের দেওয়াল, টালির ছাওয়া এক কামরার একটি ঘর মাত্র। তা হোক, তবুও তো নিজের—স্বাধীন। তা সত্ত্বেও সুধাংশু বাড়িতে ফেরার উৎসাহ বা হক কোনোটারই তাগিদ অনুভব করে না। কেন না, কর্মদোষে বাড়ি ফেরার রাস্তাটা সুধাংশু নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। তাই নমিতাকে সামাল দিতে বলে, 'আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরো, আমি ঠিকই বাড়িওয়ালার দেনা শোধ করে দেবো।'

অনুকূলে উত্তর না পেয়ে খেঁকিয়ে ওঠে নমিতা, 'বলি, এখানে তোমার কোন মধু আছে যে এখান থেকে নড়তেই চাও না? আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি যাবে কি না সাফ সাফ বলো।'

নমিতার উগ্র ব্যবহারে সুধাংশুও মনে মনে মেজাজ হারায়। তবে তাতে অশান্তি বাড়বে মনে করে সে সাধ্যমতো শান্ত থাকার চেষ্টা করে বলে, 'তুমি যাই বলো, আমার পক্ষে এখন ও বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়।'

—কেন? কেন নয়? ও বাড়িতে কি তোমার কোনো অধিকার নেই? তোমার আর

দুভাই যদি বাড়ি ভোগ করতে পারে, তুমি যাবে না কেন? তোমাকে তো কেউ তাড়িয়ে দেয়নি।'

সুধাংশুও জানে তাকে কেউ তাড়ায়নি। কিন্তু সত্যিই কি তাড়ায়নি? দাদাদের তো চেতাবনী একটা ছিলই। তবুও সুধাংশু মনে করে সে নিজেই সব ছেড়েছুঁড়ে চলে এসেছে। যদি তাড়াতো তাহলে তো আইনি সাহায্য নিতেই পারতো। আসল কথা, যে বাপ নিজের শরীরী সুখ খুঁজতে গিয়ে একটি প্রায় দুধের শিশুকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে, সে আর যাই পারুক, বাড়ির হক দাবি করতে পারে না। সুধাংশুও পারছে না। বিবেক তাকে দংশন করছে। নমিতা যে তার যন্ত্রণা একেবারে বুঝতে পারছে না তা নয়, তবে বাড়িওয়ালার গঞ্জনা সহ্য না হওয়ায় এসব বলছে।

সুধাংশুকে চুপ থাকতে দেখে নমিতা বলে, 'আচ্ছা, তুমি এত কি ভাবছ বলো তো। আর এতে ভাবাভাবিরই বা কি আছে।'

কি যে ভাবছে তা একমাত্র সুধাংশুই জানে। প্রথম বউয়ের সুখ সুধাংশুর কপালে স্থায়ী হয়নি। আসলে বউয়ের ব্যাপারটা সুধাংশু অতটা তলিয়ে দেখেনি। বন্ধুর সঙ্গে বউয়ের মেলামেশা করতে দেওয়াটাই কাল হয়েছিল। একদিন শিকল কেটে পাখি উড়ে গেল। তবে রেখে গেল দাম্পত্যের চিহ্ন চার বছরের বাবনকে।

প্রথম কয়েকটা মাস সুধাংশু মনমরা হয়ে কাটালেও ধীরে ধীরে তা সয়ে যায়। বাবনকে নিয়ে সে তখন বিব্রত। কথায় বলে ভাগ্যবানের বউ মরে। কিন্তু যার বউ পালায়? পূর্ণ যুবক সুধাংশুর বুকে তখন প্রেমের হড়পা বান। আর সেই বানে হাবুডুবু খেতে খেতে পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। অবস্থা যখন চরমে পৌঁছায় তখন বাবনের মায়া ত্যাগ করে একদিন নমিতাকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

দাদারা আগেই আঁচ পেয়েছিল। সতর্ক করেছিল এই বলে, যদি সে ঐ ঝি মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তবে তার এ বাড়িতে ঠাঁই হবে না। সুধাংশু পরোয়া করেনি। নমিতাকে নিয়ে অন্যত্র সংসার পেতেছিল। এতদিন বাদে কথাগুলি মনে পড়তে সুধাংশুর মনটা যেন কেমন কেমন করে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। পাশে থেকেও নমিতা সুধাংশুর মনের এত কথার খবর রাখে না। সে আগের সুরে বাজে, 'কিগো, যাবে তো?'

—দেখি।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে শুধু নমিতার কথা রাখতেই সুধাংশু দুপুরে গিয়েছিল মায়ের কাছে। আর গিয়েই চিত্তির।

একটি দশ বছরের ছেলে—যার মা থেকেও মা নেই, বাপ থেকেও বাপ নেই। মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা কাকে বলে, সে স্বাদ কেমন যা সে কোনোদিনই বুঝতে পারল না। জ্যেঠাদের সংসারে তাদের ভাগের মা, যাকে ছেলের বউয়েরা অবাঞ্ছিত বুড়ি বলে সম্বোধন করে, তো সেই বুড়ির আঁচলের তলায় থেকে অনাদরে অবহেলায় বেড়ে উঠেছে। এ বয়সেই হাতটানে পাকা। পড়শিদের ফুল, ফলপাকুড় তার হাতের জাদুতে নিমেষে

উধাও। এমনকি বয়স অনুপাতে কথাবার্তাতেও চৌখস। কেমন আছিস জিগ্যেস করলে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখে বিশেষ কায়দা করে উত্তর দেয়, 'বিন্দাস।'

এহেন বাবন যখন শুনল তার পালিয়ে যাওয়া বাপ ফিরে এসেছে ঘরের দখল নিতে, তখন স্বাভাবিক কারণেই তার ভেতরের অধিকারবোধ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। যে বাপ এতদিন তার কোনো খোঁজখবর নেয়নি, তাকে সে ঘরের দখল দিতে নারাজ। সুধাংশুকে দেখেই রাগে ফেটে পড়ে। উঠোনময় দাঁড়িয়ে থাকা পাড়ার লোকের সামনে চেঁচিয়ে বলে, 'ফোট শালা এখান থেকে। মাগ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মনে ছিল না বাড়ির কথা? দুধের বাচ্চাটা কার কাছে থাকবে, মনে ছিল সে কথা? তখন যখন ভাবিসনি, এখন আমি বড় হয়েছি, এখানে তোকে থাকতে দেবো না। যদি আসিস পোঁদে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।'

সুধাংশু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। খিস্তির তোড়ের সামনে দাঁড়ানো সম্ভবও ছিল না। সে মাথা নিচু করে ছুটে পালায়। সে ভেবে পায় না ঐটুকু ছেলের মুখে এসব কথা জোগাল কোথা থেকে। মনে হয়, তার প্রতি সংসারের নির্দয়তা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য তাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই বয়সে যার স্কুলে যাওয়ার কথা, তাকে কেউ স্কুলে যেতে বলেনি। বাচ্চারা যেখানে আদর পেতে অভ্যস্ত, তার কপালে গঞ্জনা ছাড়া কিছু জোটেনি। বাবনের উপর সাময়িক রাগ হলেও এসব কথা ভেবে সুধাংশুর মনটা নরম হয়। কিন্তু তার করার কিছু নেই। ভাবছে না এলেই হতো।

তক্তাপোষের ওপর আরেকটা বাটি বসিয়ে দিয়ে আগের কথার খেই ধরে নমিতা বলে, 'কিগো, তখন তো কিছুই বললে না। মা কি যেতে বলল?'

ছেলের কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর থেকে সুধাংশু ঘটনার জন্য নমিতাকেই দায়ী করছিল মনে মনে। তার ধারণা নমিতার কথায় না নাচলে এমন অপমান সইতে হতো না। রাগে গা জ্বলছিল আগে থেকেই, নমিতার কথায় তা আরো বাড়ে। বলে, 'তা আর বলেনি। বলেছে যেদিন যাবে খবর দিয়ে যেতে, বরণকুলা সাজিয়ে রাখবে!'

নমিতা বোঝে হাওয়া খারাপ। সুধাংশুকে শান্ত হতে সময় দেয়। যখন মনে হয় রাগ কমে এসেছে, তখন বলে, 'ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না। আমি নাহয় একবার যাব। দরকার পড়লে পায়ে পড়ব। মেরে তাড়াতে তো আর পারবে না।'

গোঁ তখনও কমেনি। চড়া সুরেই সুধাংশু বলে, 'হ্যাঁ, যেতে হয় তুমিই যাও। আমি আর এর মধ্যে নেই।'

পরদিন ছেলেকে কোলে নিয়ে নমিতা শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। যত অন্যায়ই করুক শত হলেও ছেলের বউ, সব ছেলে তো আর সমান হয় না—সুধাংশুর মা নমিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। পুলিশ যেমন চোর ধরে নিয়ে যায়, সুধাংশুরও এখন সেই অবস্থা। পালাবার উপায় নেই। সে নমিতার আড়ালে দাঁড়ায়।

নমিতাকে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও সুধাংশুকে দেখে বাবনের গতকালের

পুষে রাখা রাগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুমি আবার এসেছো? বারণ করলাম না তোমাকে এ বাড়িতে ঢুকবে না। এক্ষুনি চলে না গেলে কিন্তু....একটা অশ্রাব্য খিস্তি পাড়ে।

মাঝখানে ঠাকুমা। বাবনের বাড়াবাড়ি দেখেও স্নেহে অন্ধ, কিছু বলতে পারেন না। আবার তিনি সুধাংশুরও মা—সামনে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বিপন্ন, তাকেও ঠেলতে পারেন না। তাই বুঝিয়ে যদি বাবনকে ঠাণ্ডা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে বলেন, 'ছিঃ ভাই, বাবাকে এরকম বলতে নেই। লোকে মন্দ বলবে।'

বাবন আরো জোরে চেঁচায়, 'বলুক লোকে যা খুশি। আমার কোনো বাবাটাবা নেই, আমি কাউকে চিনি না, আমার কেউ নেই।' বলতে বলতে যেহেতু ঠাকুমা বাপের হয়ে সাফাই গাইছে সেই রাগে উঠোনের একপাশে ঠাকুমার লাগানো তুলসি গাছটাকে শিকড়সুদ্ধ টেনে তুলে দুমড়ে মুচড়ে কুটি কুটি করে উঠোনময় ছড়িয়ে ফেলে।

ঠাকুমার কাছে তুলসি নারায়ণের প্রতীক। গাছটির হেনস্থা বুকে বাজে। রাগ সামলাতে না পেরে তিনি 'শয়তান, তুই বড় বাড় বেড়েছিস' বলে বাবনকে একটি চড় মারেন। মার খেয়ে অমানুষিক কণ্ঠে বীভৎস কর্কশ চিৎকার করে ঠাকুমাকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের দাওয়ায় চেপে ধরে বাবন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, 'ছিঁড়েছি বেশ করেছি। আরো ছিঁড়বো। কিন্তু তুই আমাকে মারলি কেন? বল, আমাকে মারলি কেন?' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে যায় এবং এতদিনের পিতৃমাতৃ স্নেহবঞ্চিত বুভুক্ষু মন, পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে বিছানার বালিশ, মশারি, চাদর একটা একটা করে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে।

কোথায় ঘা ঠাকুমা ভালো জানেন। বাবনকে একটু শান্ত হওযার সুযোগ দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'ঠিক আছে বাবাকে এ বাড়িতে থাকতে দিবি না, দিস না। কিন্তু ভাইটা? সে কোথায় যাবে? সে তো তোরই ভাই। আমার কাছে থাকতে তোর যেমন ভালো লাগে, সেও তো তোর কাছে থাকবে বলেই এসেছে। দেখ দেখ, তোকে দেখে কেমন হাসছে। আর তুই কিনা তাকে তাড়িয়ে দিবি।'

'তোরই ভাই' কথাটায় বাবন এমন চমকায়, মনে হয় যেন আচমকা তাকে কেউ ছাদ থেকে ঠেলে দিয়েছে। এতদিন একা থাকার পর সে তো ভাবতেই পারে না তারও নিজের ভাই থাকতে পারে। উরিব্বাস, চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত শিশু যে কি না তার ভাই, তার দোসর—খেলার সঙ্গী। সে ইচ্ছে করলেই ভাই কাঁদলে তাকে কোলে নিতে পারবে, দুষ্টুমি করলে বকতে পারবে, রথের দিনে ভাইকে সঙ্গে করে মেলায় গিয়ে দুজনে নাগরদোলায় চড়বে। অবশ্য ভাই যদি ভয় পায় তবে কাঠের ঘোড়ায় চড়বে। এতসব ভাবতে গিয়ে বাবনের মনটা নরম হয়ে আসে। সে নিজের অজান্তে ভাইয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় ভাই যাতে খুশি হয় সে তাই করবে। বয়ামে জমিয়ে রাখা সমস্ত গুলিগুলি ভাইকে দিয়ে দেবে, ঘুড়ির সময় ঘুড়ি তৈরি করে দেবে। আর এবার থেকে চুরি করা পেয়ারা একা খাবে না, ভাইকেও দেবে।

পড়ে পাওয়া এতগুলি খুশি একসঙ্গে হওয়ার আনন্দ বাবনকে উদ্বেল করে তোলে।

খুশিতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সে মুগ্ধ চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায়। সুমন তখনও হাসছে। সেদিকে তাকিয়ে বাবনের বুকটা গুরগুর করে ওঠে। একটি শিশুর সরল হাসির কাছে বাবনের সমস্ত রাগ নিমেষে জল হয়ে যায়। তার ইচ্ছে করে ভাইকে একবার কোলে নেয়। কিন্তু সংকোচ এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে শুধু অস্ফুটে, 'তাহলে ভাইকে রেখে যাক', বলেই ছুট।

যতক্ষণ বাবনের দস্যিপনা চলছিল, সুধাংশু সবার পেছনে সেই যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল, তোলার সাহস হয়নি। কিন্তু যখন আর কোনো শব্দই কোনোদিক থেকে আসছিল না, তখন ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকায়। সে দেখে সুমন তার ঠাকুমার কোলে। ঠাকুমা হাসতে হাসতেই সুধাংশুর দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝলি বাবা একেই বলে 'রক্তের টান'।

আগাছা

ঘরবন্দি অবস্থা থেকে রাজু যেদিন মুক্তি পেল ততদিনে মাসখানেক সময় পেরিয়ে গেছে। আর রাজুর হিসেবে এই একমাসে বুড়ির মাঠের তিন কাঠির ভিতর দিয়ে কত যে বল গলে গেছে কে জানে! ভাবতেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কেননা ফুটবলপাগল ছেলেটি দলের হয়ে গোল আগলায়।

গাছের মাথায় বিকেলের মরা রোদ্দুর। গুটিগুটি পায়ে অবসন্ন শরীরে রাজু রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তার দীর্ঘদিনের অতৃপ্ত দৃষ্টি ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করে, প্রাণভরে শ্বাসযন্ত্রে ভরে নেয় মুক্ত বাতাস।

রাজু বেরিয়েছে ঠিকই তবে মায়ের কতগুলি অনুশাসন সঙ্গে নিয়ে। যেমন, রোদে হাঁটা বারণ, বেশি ছোটাছুটি করা চলবে না—আর যখন-তখন বাইরের হাবিজাবি খাওয়া বিশেষ করে ভাঁজাভুজি, কিছুতেই না। এবং এই বারণগুলি ছেলের মনের মধ্যে গেঁথে ফেলতে কল্পনা রাজুকে পাখি পড়ান পড়িয়ে বুঝিয়েছে, সে ছাড়া তার আর অবলম্বন নেই। শিবরাত্রির সলতে রাজুর ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে তার মরা ছাড়া গতি থাকবে না।

কল্পনার এই আকুতির প্রভাব রাজুর মনে কতটা পড়েছে বোঝা না গেলেও সে কিন্তু বাধ্য ছেলের মতোই মায়ের প্রত্যেকটি কথায় একদিকে মাথা কাত করে সায় দিয়েছে। কিন্তু মনে মনে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে মায়ের অগোচরে যেন ঘরের ছলোটাকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, 'বাব্বা, মা-টা যেন কি? এটা করিস না, ওটা করতে নেই। করলে কি হয়? ন্যাবা যেন আর কারো হয় না। হলে যেন সবাই খালি মরেই যায়। এমন তো নয় যে, সে মার কথা শোনে না। এই যে অসুস্থ থাকাকালীন ইচ্ছে না করলেও নিয়ম করে দুবেলা মায়ের হাতে অড়হর পাতার রস, গেলাস গেলাস আখের গুঁড়ের জল গিলতে হয়েছে—তখন কি বায়না করেছে? করেনি। এখন তো সে সুস্থ, আর এখন কি না...।' দশ বছরের রাজু নিজের মতো করেই মায়ের শাসনের বিশ্লেষণ করে। পরক্ষণেই চোখ ঠেরে মনকে প্রবোধ দেয়, 'যাকগে, মা তো আর সবসময় ঘরে থাকবে না। তাকে তো কাজে বেরোতে হবেই—তখন?' চোখ দুটো খুশিতে নাচে।

একটা চেনা আওয়াজ কানে আসতেই রাজু ঘাড় ঘোরায়। হ্যাঁ, ঠিক সময়েই সে ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। বারো-চোদ্দ জনের দলটা বল হাতে কলরব করতে করতে বুড়ির মাঠের দিকে চলেছে। রাজুকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ায়।

অনেকদিন পর সঙ্গীকে পেয়ে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু পল্টু যেহেতু ক্যাপ্টেন, সে-ই প্রথমে জিজ্ঞেস করে, 'কি রে রাজু যাবি নাকি?'

ইচ্ছে তো ষোলো আনা, কিন্তু পিছু টানে মায়ের বারণ। রাজু ঢোক গিলে বলে, 'এখন খেললি মা বকবে।'

তাচ্ছিল্যে ঠোঁট উল্টে পল্টু বলে, 'ধুস, তুই খেলবি কেন? আমাদের সঙ্গে মাঠে চ। বসে বসে খেলা দেখবি। আর মাসি তো? সে আমি ম্যানেজ করে নেবানে।'

হই হই করে দলটি মাঠে নেমে সমান দুদলে ভাগ হয়ে খেলা শুরু করে। মাঠের বাইরে বসে রাজু নিজের দলকে উৎসাহ জোগায়। খেলা শেষ হলে নিত্যকার মতো ছেলেরা মাঠ লাগোয়া পুকুরে ঝাঁপায়। এবার আর মন মানে না। উঃ, কতদিন যে পুকুরে সাঁতরায় না। যা হবে হবে, ভেবে রাজুও ঝপাং।

রাতে মায়ের বুকের কাছে শুয়ে রাজু মৃদু ধমক খায়। কল্পনা বলে, 'তোরে যে এত করি বারণ করলাম, তবুও তুই অবেলায় নেয়ে এলি?'

—নাইলে কি হবে মা? সরল জিজ্ঞাসা রাজুর।

কি হবে, কি হতে পারে কল্পনা এটা কি করে বোঝাবে এই অবোধকে। এটা তো সত্যি, সংসারে কোনো বিপদ আপদ এলে তার একার পক্ষে সামলানো মুশকিল। বাপ তো থেকেও নেই। হপ্তায় দু হপ্তায় শনিবার করে আসে, রোববার থেকে সোমবার ভোরেই পালায়। তাব কারখানার নাকি এমনই কাজের চাপ। আসে স্বামিত্বের দাবি নিয়ে, রাত কাটায়, কিন্তু স্ত্রী পুত্রের দায়িত্ব নেয় না। প্রতিবাদ করলে মত্ত হাতের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। সব না জানলেও কল্পনা এটা জেনেছে যে, রাজুর বাপ দক্ষিণদাঁড়িতে আরো একটা সংসার পেতেছে। স্বামীর ব্যবহারে মনটা ভেঙে গেলেও শুধু শাঁখা সিঁদুরের মান রাখতে এবং লোক জানাজানির ভয়ে সে এসব মেনে নিয়েছে। পেট চালাতে বাধ্য হয়েছে ঝিগিরি ধরতে।

স্বামীর প্রতি কল্পনার আকর্ষণ তলানিতে এসে ঠেকলেও রাজু মাঝে মধ্যে বায়না ধরে, 'ওমা, বাবার কাছে চলো। বলো না, বাবা কবে আসবে?'

—আসবে। দু চারদিনের মধ্যিই আসবে। কারখানায় মেলা কাজের চাপ তো সেজন্যি আসতি পারতেছে না। ঠোঁট কামড়ে কল্পনা ছেলের কথার উত্তর ফেরায়।

সঠিক জবাব না পেয়ে রাজুর জেদ বাড়ে। আর পাঁচটা শিশুব মতো বাপের আদর না পেয়ে পেয়ে আক্রোশে মায়ের শরীর লক্ষ্য করে হাত পা ছোঁড়ে।

কল্পনা তখন শিবের মাথায় বেলপাতা দেয়। বলে, 'আচ্ছা রাজু বল দিনি এবার মেলা থেকে কত নম্বর বল নিবি? তোরে এমন একটা বল কিনে দেব না দেখবি বন্ধুরাও চমকে যাবে।'

ওষুধে কাজ হয়। হাসি মুখে রাজু বলে, 'নাগরদোলাও চড়বানে কিন্তু।'

ছেলের মাথায় স্নেহের হাত বোলাতে বোলাতে কল্পনা বলে 'হ্যাঁ তো।'

ছেলে ঘুমায়। নিঃঘুম রাত কাটে কল্পনার। ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবনাই তাকে বিনিদ্র রাখে। গরিব ঘরের সন্তান— লেখাপড়াও তেমন কিছু হল না। হবেই বা কি করে? বিনা

বেতনে সরকারি স্কুলে ফোর পর্যন্ত পড়েছে। পাশ ফেলের বালাই ছিল না। অন্য স্কুলে ফাইভে ভর্তি হতে গিয়ে চৌকাঠ ডিঙোতে পারেনি। ভর্তির পরীক্ষায় আটকে গেছে। ঘরে পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। মাস্টার রেখে পড়াবে সে সামর্থ্যও তো নেই।

তবে বেশি চিন্তা, রাজু বড় অভিমানী আর গোঁয়ার বলে। কেউ কিছু বললে অনেকদিন মনে পুষে রাখে। কোনোদিন রাস্তায় মার খেয়ে এসে মার কাছে নালিশ করে না। বরং এক ঘা খেলে যতক্ষণ তিন ঘা দিতে না পেরেছে ততক্ষণ যেন এ ছেলের শান্তি নেই। এরজন্য কল্পনার যেমন উদ্বেগ, আবার পড়শিদের কাছে কথাও শুনতে হয় ঢের। এই তো কদিন আগে দত্ত বাড়ির ছোট বউ এসে দু কথা শুনিয়ে গেল। কী, না ওর ছেলেকে নাকি রাজু বেদম মেরেছে এবং সঙ্গে দত্ত বউ-এর খোঁচা, 'আর মারামারি করবে নাই বা কেন? ছাড়া গরু কত আর ভালো হবে।'

দত্ত বউ চোখের আড়াল হতেই রাজুর চুলের গোছায় কল্পনার হাত। শরীর অপমানে জ্বলে। পিঠে একটি কিল মেরে সক্রোধে বলে, 'শয়তান, তোর জন্যি আমি কি এট্টুস শান্তিতে থাকতি পারব না? দোরে এসে মান্ষি কথা শুনায়ে যাবে। কী করিছিস বল?'

নির্বিকার রাজু উত্তর দেয়, 'এট্টুস ক্যাপসুল দিলাম।'

ছেলের উত্তরে কল্পনার হাসি পেলেও কপট রাগে বলে, 'তুই দেবুরে মারিছিস কেন?'

—দেবুই তো আগে আমারে ধাক্কা দিল। আমি কি আগে মারিছি?

— সে তো শুদুমুদু ধাক্কা দেয়নি। নিশ্চয়ই তুই কিছু করেছিলি?

—আমি গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তিছেলাম। ও আমারে চোর বলল, আমিও বলেছি তুই চোর, তোর বাপ চোর। তাতেই আমারে ধাক্কা মারলো।

—ছি! পরের গাছে হাত দিতি নাই। লোকে তো মন্দ বলবেই।

—পরের গাছ কেন? ওটা কি ওদের গাছ? রাস্তার ধারে সরকারি গাছ। ওরা বড়লোক বলি গাছে হাত দিলি কিছু হয় না। আমরা হাত দিলিই দোষ। আমরা চোর। বেশ করেছি হাত দিয়েছি। আরো দেব। বলেই ঝটকা মেরে মায়ের হাত ছাড়িয়ে রাজু পালায়।

স্বাধীনতা দিবসে দিনরাতের ফুটবল টুর্নামেন্টে নাম দিয়েছে পল্টুর টিম। জোর মহড়া চলছে কদিন। আজকে ফাইনাল টাচ দিতে মাঠে আসতেই গেরো। মাঠের এখানে ওখানে নতুন ইঁটের পাঁজা। লরি থেকে এখনও খালাস হচ্ছে। মনটা দমে যায় পল্টুর। গেল, মাঠের একচ্ছত্র আধিপত্য গেল। নিশ্চয়ই এখন মাঠে ঘরবাড়ি উঠবে, অন্যান্য জায়গায় আর যেমন বহুতল উঠেছে। এমন ভাবনার মধ্যেই পল্টুরা স্বল্প পরিসরে খেলা শুরু করে।

রাজু গোলে দাঁড়িয়ে। মানে শেষ সীমানায়। ওখানে যে লোকগুলি ইঁট সাজাচ্ছিল কৌতূহলী রাজু একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'কাকু, ইঁট দিয়ে কি হবে গো?'

যে লোকগুলি কাজ করছিল—অবাঙালি। তাদেরই একজন রাজুর প্রশ্নের উত্তরে সোৎসাহে বলে, 'পারেক্ হোগা বেটা, বহোত বড়া পারেক্। তেরে যেইসা বাচ্চালোগোকে লিয়ে আউর বহোত কুছ হোগা।'

বহোত কুছ না বুঝলেও ওখানে যে বাউন্ডারী ওয়াল গেঁথে শিশুদের জন্য পার্ক হবে এটা রাজু তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝে গেছে। এবং এরপর যতদিন পার্কের কাজ চলেছে পল্টু-রাজুদের দলটি নিয়ম করে দুবেলা কাজের অগ্রগতি কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বসে বসে দেখেছে। কষ্ট যে হোত না তা নয়, একে তো ফুটবল খেলার জমিটুকু বে-দখল হওয়ার দুঃখ মনে ছিলই তার সঙ্গে পুকুরটি পার্কের পেটে ঢুকে যাওয়ায় যখন তখন জলে দাপানোর স্বাধীনতাটুকুও চলে যাওয়াতে কষ্ট আরো বেড়েছে। তবে এই ভেবেই মন খারাপ বেশিক্ষণ থাকতো না কেননা, পার্কটি তো শিশুদের—তাদেরই জন্য।

একদিন ঢাকঢোল পিটিয়ে পার্কের উদ্বোধন হল। মন্ত্রি-সান্ত্রিরা গাড়ি করে এলেন, উদ্বোধনী সঙ্গীত হল, প্রদীপ জ্বলল, উদ্যোক্তারা, বিশেষ আমন্ত্রিতরা ভাষণ দিলেন। আর সবার দেখোদেখি পল্টু-রাজুরা অনেক আশা নিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখবে বলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে গেটে প্রহরীর হাতে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে মুখ কালো করে গাছের ছায়ান্ধকারে বসে রইল। মাইকে তখন ভেসে আসছে, 'এই শিশু উদ্যান এলাকার তো বটেই, আশপাশের গ্রামের শিশুদেরও মানসিক, দৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। ওরাই ভবিষ্যতের দিশারী। তাই আমরা চাই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর মিলনভূমি হউক এই 'শিশু প্রগতি উদ্যান।' ভাষণ শেষে হাততালি।

পার্কে ঢুকতে নজরানা মাথাপিছু পাঁচ টাকা। পার্কের বাইরে গেটের গায়ে বিজ্ঞপ্তি—হলুদে রাঙানো টিনের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লাল রঙে লেখা। পল্টু-রাজুরা বানান করে করে পড়ে। টয় ট্রেন দু টাকা, বোটিং দু টাকা, রোপওয়ে দু টাকা, চিচিং ফাঁক দু টাকা। সাকুল্যে পাঁচ আর ছয়ে মিলে তেরো টাকা। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। না, সম্ভব নয়। আর নয় বলেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে খেলাশেষে ব্যাজার মুখে প্রায় রোজই গেটের বাইরে বসে থাকে এবং বাবা মার হাত ধরে কলরব করতে করতে ছোটরা যখন পার্ক থেকে বেরিয়ে ভেতরে দেখা জিনিসের গুণকীর্তন করতে থাকে তখন ওদের কথাগুলি রাজুরা কাঙালের মতো গোগ্রাসে গেলে।

একদিন সবাইকে ডেকে পল্টুই পথটা বাতলায়। 'জানিস তো, আমি এট্টা বুদ্ধি বার করেছি।' কৌতূহলী দৃষ্টিতে সবাই পল্টুর দিকে তাকায়।

যেহেতু ক্যাপ্টেন সেই সুবাদে, সমবয়সী হলেও পল্টুর বুদ্ধির ওপর সকলের আস্থা আছে। অতএব ক্যাপ্টেন যখন বুদ্ধি বের করেছে তখন দারুণ কিছু একটা না হয়েই যায় না।

পল্টু বিজ্ঞের মতো বলতে শুরু করে, 'তোরা সবাই শোন।' কাল থেকে আমরা সবাই কিছু কিছু করে পয়সা জমাব। সেটা বেড়ে বেড়ে যেদিন তেরো টাকা হবে আমাগের মধ্যি থেকে একজনারে ভিতরে পাঠাব। সে তোরা যাকে পছন্দ করিস। সে দেখে এসে আমাদের সব বলবে।

পছন্দ তো যার যার নিজেকেই। তবুও প্রস্তাবটা সকলের মনঃপূত হয়। তবে যতদিন না পয়সা যোগাড় হচ্ছে ততদিন পল্টু-রাজুর দলটি মন কেমন করা দুঃখ নিয়ে গ্রিলের ফাঁকে গাল চেপে পুকুরের জলে ছেলেমেয়েদের বোটিং দেখে। যে পুকুর এতদিন ওদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল—মাত্র কুড়ি গজ দূরের পুকুরটা এখন শত যোজন দূরে। কখনো বা দূরে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপর দিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে রোপওয়ের ছোট ছোট বাক্সে মানুষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে আনাগোনা দেখে। আর ট্রয়ট্রেনের শব্দ শুনে বাইরে বসে কল্পনার জাল বোনে।

ছুটির দিনে ভিড় বেশি। এমনিতেই ওদের খেলার পরিসর কমে গেছে, রোববার বাইরে থেকে আসা লোকেদের গাড়ি রাখার ফলে জায়গা আরো কমে গেছে। তবু ওরই মধ্যে ওরা ফুটবল খেলা শুরু করে। খেলতে খেলতেই ঘটনাটা ঘটে যায়। পল্টুর সজোরে মারা বলটা গিয়ে লাগে দু-আড়াই বছরের খেলতে থাকা একটা বাচ্চার গায়ে। টাল সামলাতে না পেরে বাচ্চাটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে সংজ্ঞা হারায়।

শিশুটির অভিভাবকদের একজন ছুটে এসে পল্টুর কান টেনে বলে, 'এই শূয়োরের বাচ্চা এটা কি ফুটবল খেলার জায়গা।'

কানের যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে পল্টু জবাব দেয়, 'তালি কোথায় খেলব? এটা তো আমাগেরই খেলার জায়গা। তোমরাই তো গাড়ি রেখে জায়গা আটকে দিয়েছ?'

একটা হতদরিদ্র গ্রাম্য বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে ধোপদুরস্ত গাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে এমন জবাব শুনতে হবে ভাবেননি তিনি। তার নাগরিক অহমিকায় আঘাত লাগায় তাকে আরো খেপিয়ে তোলে। ফলে দ্বিগুণ জোরে কান টেনে বলেন, 'এখানে গাড়ি রাখব না তো কোথায় রাখব? এটা কি তোর বাপের জায়গা?'

পল্টুর কান এখনও পরের হাতে। আক্ষরিক অর্থেই তার যন্ত্রণা, গালাগাল উপরন্তু বাপ তুলে কথা। সে আর সামলাতে পারে না। হ্যাচকা টানে কান ছাড়িয়ে সমান তেজে বলে, 'তোমার বাপের জায়গা?'

যিনি কান ধরেছিলেন সম্ভবত তার বাবাই হবেন, সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন, 'খোকা, তুই এই বেজন্মা ছোটলোকগুলোর সঙ্গে পারবি না। ওরা তোর সম্মান রাখবে না। আয়, চলে আয়। তুইতো জানিস না, এই আপদগুলো হচ্ছে সমাজের একেকটা আগাছা।'

বাপের কথায় কান না দিয়ে অপমানতাড়িত খোকা হাতের কাছে পেয়ে রাজুকে একটা চড় কষায় এবং দেখাদেখি ভদ্রলোকের দল বীরত্ব দেখাতে ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো পল্টুদের তাড়া করে।

পল্টুরা ওখান থেকে সরে আসে, কিন্তু পালায় না। পল্টুর প্রতি ভদ্রলোকদের আচরণ ওদেরও খেপিয়ে তোলে। শোধ নিতে দশ বারোজনের দলটি রাস্তার ধারে জমানো খোয়া তুলে তেড়ে আসা লোকগুলিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে শুরু করে।

যেহেতু রাজুরা আপাতদর্শনে নিম্নশ্রেণির এবং ওদের গায়ে হাত দিয়ে তাড়ালেও কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না, এই ভেবে উপস্থিত দর্শনার্থীরা এবং উদ্যানের দেখভালে নিয়োজিত লোকগুলি পন্টুদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। কার্যত জায়গাটি খণ্ডযুদ্ধের চেহারা নেয়।

লোকমুখে খবর পেয়ে আর সবার মতো কল্পনাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। রাজুকে নিরস্ত করতে এগিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরে। রাজু তখন বেপরোয়া। নিজেকে ছাড়াতে সজোরে মায়ের হাত কামড়ে ধরে।

যন্ত্রণায় 'উঃ মাগো' বলে চেঁচিয়ে ছেলেকে মারার জন্য কল্পনা যখন অন্য হাতটি তোলে, রাজুর চোখে চোখ পড়তেই শিউরে ওঠে। চির চেনা ছেলের মুখটা আজ যেন তার কাছে বড় অচেনা ঠেকে। সে সহ্য করতে না পেরে অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

সরাসরি ছেলের দিকে না তাকিয়েও কল্পনা বুঝতে পারে রাজুর চোখে ধিকিধিকি জ্বলছে বঞ্চনার আগুন। আর সেই আগুনের আড়ালে একটু একটু করে জন্ম নিচ্ছে শ্রেণি ঘৃণা।

উৎসাদন

ভারী বর্ষণ মাথায় নিয়ে মৃত্তিকা যখন চালতাবাগানের মোড়ে বাস থেকে নামল, তখন সমস্ত পাড়াটাই জলে থৈ থৈ। এক ঘণ্টার তুমুল বৃষ্টিই যে কলকাতা ভেসে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট এই সত্যটা সে জ্ঞান হবার পর থেকেই জেনে গেছে। রাস্তার বৃষ্টি জমা জলে দাপাদাপি করতে ছোটবেলায় কি ভালোই না লাগত। তখন থেকেই শুনে আসছে শহরের আর কোথাও যদি জল নাও জমে, ব্যাঙে হিসি করলেই নাকি ঠনঠনে ভেসে যায়— এমনই বদনাম এই এলাকার। সে যাকগে, কিন্তু সকাল দশটায় সে যখন বান্ধবীর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে বরানগরেব উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, আকাশ দেখে বোঝার উপায় ছিল না বিকেলে এমন ঢালবে। অন্তত একটু আভাস পেলেও ছাতাটা হাতে করে বেরোতে পাবতো। মৃত্তিকা মনে মনে আক্ষেপ করে, 'কপালে দুর্ভোগ থাকলে ঠেকায় কে।'

যতটা গোটালে শালীনতা বজায় থাকে ঠিক ততটাই কাপড় গুটিয়ে জলের মধ্যে বড় বড় পা ফেলে মাথা বাঁচাতে মৃত্তিকা একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়ায়। মাথা বাঁচলেও ঝাপটায় কাপড় বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টির ঘনত্বে দূরের কিছু ভালো করে দেখাও যায় না। এই মুহূর্তে সে একটা রিক্সার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। না হলে গলির মধ্যে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। আর জলের যা চেহারা পা ফেলতেও গা ঘিন ঘিন করে। আশেপাশে বেশ কয়েকটা মোটর গ্যারেজ, গলির দুপাশে সার দিয়ে লোহালক্করের দোকান, তারই তেলকালি জলে ধুয়ে এসে রাস্তায় ভাসছে। তা ছাড়া জলের নিচে লোহার টুকরো-টাকরা পড়ে থাকাটাও বিচিত্র কিছু নয়। এমনিতে শুকনো দিনেই রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরি থেকে লোহা ওঠানো নামানোর সময় নিরাপদে রাস্তা চলা দায়। তাছাড়া যে কোনো সময় রাস্তায় বসে কাটতে থাকা লোহার টুকরো ছিটকে এসে পথচারীদের গায়ে লেগে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। আর এখন তো দুর্যোগই চলছে।

সন্ধ্যা উতরে গেছে অনেকক্ষণ। রিক্সার জন্য অপেক্ষা করে করে মৃত্তিকা অধৈর্য হয়ে ওঠে। রবিবার ছুটির দিন বলে দোকানপাটও বন্ধ। তার ওপর প্রবল বর্ষণ। রিক্সাওয়ালারাও সম্ভবত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরোতে ভরসা পায়নি। জায়গাটা এমনিতেই নির্জন, দুর্যোগে রাস্তায় মানুষজনও কম। তার কেমন ভয় ভয় করে। সবচেয়ে বড় ভয় একা গলি পেরোবে কি করে। তবুও আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না ভেবে, উদ্বেগ নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ফুটপাথ ধরে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সে জল ভাঙতে শুরু করে।

কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। অর্থাৎ সে মনে মনে যে ভয়টা করছিল সেটাই সত্যি হতে চলেছে। তবুও ক্ষীণ একটা আশা ছিল এই দুর্যোগে হয়তো রকবাজ ছেলেগুলি থাকবে না। কিন্তু না, রক ডুবে গেলেও ওরা চায়ের দোকানে গুলতানি মারছে। অন্যদিন সকাল-সন্ধ্যা রকে বসে আড্ডা দেয় আর সুন্দরী মেয়েদের দেখে টিপ্পনী কাটে। কলেজ যাতায়াতের পথে মৃত্তিকাকেও একই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এ একরকম গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবু তখন বান্ধবীরা সঙ্গে থাকে বলে ততটা ভয় করে না। কিন্তু এখন যে একেবারে নিঃসঙ্গ। এই ভাবনা মনে আসতেই মৃত্তিকার কেমন যেন শীত শীত বোধ হয়।

চলতে চলতে শরীরের দিকে অপাঙ্গে তাকাতেই মৃত্তিকা চমকে ওঠে। একরাশ লজ্জা তাকে জড়িয়ে ধরে। এই মুহূর্তে সে ক্যালেন্ডারের সিক্তবসনা সুন্দরীর প্রতিচ্ছবি। বৃষ্টিভেজা শরীরে লেপটে থাকা কাপড়ের শাসন অগ্রাহ্য করে তার স্বাভাবিক যৌবন তাকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় এনে ফেলে। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে ভিজে আঁচল দিয়ে যতটা সম্ভব সে বুক পিঠ আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

নির্জন রাস্তায় এমন একটা অভাবনীয় চলমান দৃশ্য চোখে পড়তেই চায়ের দোকানের ছেলেগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। শুরু হয় মুহুর্মুহু সিটি, সঙ্গে রসালো মন্তব্য। প্রায় হাঁটু জলে দাঁড়ানো মৃত্তিকা আশেপাশে নজর করে দেখে রাস্তায় সে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। সাহায্যের জন্য গলা ফাটালেও কেউ আসবে না। জিব শুকিয়ে এলেও মনে সাহস সঞ্চয় করে. এদের হাত থেকে রেহাই পেতে এই জলের মধ্যেও সে যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

প্যান্ট গুটিয়ে ছাতা হাতে তড়িঘড়ি একটি ছেলে এগিয়ে আসতে আসতে দূর থেকেই উচ্চস্বরে মৃত্তিকাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'হ্যালো ডার্লিং, শুধুমুদু ভিজছো কেন? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। আমার আমব্রেলার তলায় চলে এসো, দেখবে ঠিক গরম হয়ে যাবে।' বলে হাতের মুদ্রায় একটা অশোভন ইঙ্গিত করে। তার কথায় এবং ভঙ্গিতে চায়ের দোকানে অপেক্ষারত ছেলেগুলি হেসে পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

ছেলেটির যা বয়স তাতে মৃত্তিকা অনায়াসেই তার কাছ থেকে আপনি সম্বোধন দাবি করতে পারে। তার অশোভন ইঙ্গিতে ভেতরটা জ্বলতে শুরু করে। ইচ্ছে হয় ঠাস করে একটা চড় মেরে ছেলেটির ঔদ্ধত্যের জবাব দেয়। কিন্তু উপায়হীন মৃত্তিকা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা না করে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সংযত রাখে।

মৃত্তিকাকে নীরব দেখে ছেলেটির সাহস বাড়ে। শরীর জরিপ করে বলে, 'ক্যায়া বলু মাইরি, একদম সিলসিলাকা স্মিতা পাতিল।' কিছুটা পাশাপাশি হেঁটে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতেই মরিয়া মৃত্তিকা ফুঁসে ওঠে 'এই, হচ্ছেটা কি শুনি, মেয়েদের পেছনে লাগা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো কাজ নেই? ভালোয় ভালোয় যাবে, নাকি এক্ষুনি চিৎকার করে আমি পাড়ার লোক জড়ো করব।'

মৃত্তিকার চড়া গলার ধমকে ছেলেটি সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গিয়ে ঝাঁকের কই ঝাঁকে

ফিরে যায়। ছেলেটিকে ফিরে যেতে দেখে মৃত্তিকা যখন, 'যাক বাবা খুব ফাঁড়া কাটল' বলে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে কি ফেলেনি মুহূর্তের ব্যবধানে দুই আরোহী সমেত একটি বাইক তাকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে খেতে অনবরত কানগরম করা খেউর আওড়াতে থাকে। বাইক চলার ধাক্কায় রাস্তার জল আন্দোলিত হয়ে মৃত্তিকাকে স্নান করিয়ে দেয়। ততক্ষণে সে বাড়ির দোড়গোড়ায় এসে পড়েছে। আবর্তিত হতে থাকা বাইক থেকে একটি ছেলে মৃত্তিকার আঁচল ধরে টানতেই ভয়ে সে 'ঠাম্মি গো' বলে অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। বেগতিক বুঝে বাইক নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

হঠাৎ চিৎকার কানে যেতে ত্রস্ত হাতে দরজা খুলে ঠাকুমা কাকভেজা মৃত্তিকাকে দেখে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'কি হইছে রে মুন্নি, চিৎকার করস কিসের লাইগ্যা?'

সত্তরোর্ধা বিধবা ঠাম্মিকে দেখে ভীত, অপমানিতা মৃত্তিকা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'ওই বদমাশ ছেলেগুলি আবার আমার পেছনে লেগেছিল ঠাম্মি।'

চারজনের সংসারে মা-মরা নাতনিটির কাছে তিনিই একাধারে মা, ঠাকুমা, বন্ধু, অভিন্নহৃদয় সঙ্গী। মৃত্তিকার প্রায় সব কথাই ঠাকুমার জানা। এর আগেও কয়েকবার মৃত্তিকা এই ছেলেগুলির বিষয়ে ঠাকুমাকে বলেছিল। এই মুহূর্তে মৃত্তিকার কথায় বৃদ্ধার কপালের ভাঁজ আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়। তিনি প্রবোধ দিয়ে মৃত্তিকাকে স্নান ঘরে পাঠিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বিড়বিড় করেন, 'ভগবান! মাইয়া মাইন্‌সের জীবনটাই হইল গিয়া একটা অভিশাপ।'

দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে রাতে সকলেই যখন একসঙ্গে খেতে বসে, তখনই কথাটা তোলেন অণিমাদেবী। ছেলেকে বলেন, 'হারে পানু, তরে কতদিন ধইর‍্যা কইতাছি মাইয়াডার জন্য একটা পাত্র দ্যাখ। তুই আমার কথা তো কানেই তোলস না। আমি কইকি, আমি বাঁইচ্যা থাকতে থাকতে মাইয়াডার একটা গতি কইর‍্যা থুইয়া যাই। নাইলে তো মইর‍্যাও শান্তি পামু না।'

মায়ের কথায় পান্নালাল মেয়ের দিকে তাকায়। মৃত্তিকা মাথা নিচু করে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তার একমাত্র সন্তান মৃত্তিকা। তাকে শিক্ষায় দীক্ষায় স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে চান তিনি। মেয়েরও তাতে সায় রয়েছে। কিন্তু মায়ের গলায় যে ভিন্ন সুর। দ্বিধাগ্রস্ত পান্নালাল জিগ্যেস করে, 'হঠাৎ এ কথা বলছ কেন? মুন্নি তো বলেছে এম. এ. কমপ্লিট করে রিসার্চ করবে।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অণিমা দেবী ঝেঁজে ওঠেন, 'ফালাইয়া থো তর লেখাপড়া, দিনকাল যা পড়ছে, শেষকালে একটা অঘটন ঘইট্যা গেলে কাইন্দা কুল পাবি না।'

মুন্নির দিক থেকে কোনো বেচাল হবে না এ বিশ্বাস পান্নালালের আছে। তবে কী এমন হতে পারে, যাতে মায়ের মন এমন উচাটন হয়ে পড়েছে। অনেক ভেবে হদিশ করতে না পেরে সে মায়ের কাছেই প্রশ্ন রাখে, 'আহা মাথা গরম না করে কি হয়েছে আগে সেটা তো বলবে, নাকি!'

অপেক্ষাকৃত একটু নরম গলায় অণিমাদেবী বলেন, 'হইব আর কি! কলেজে যাইতে আইতে দুইবেলা পাড়ার ছ্যামরাগুলি মাইয়াডারে যে জ্বালাইয়া মারে, সেই কথাটা তো একবার ভাববি।'

এবার সত্যিই বিস্মিত হবার পালা পান্নালালের। মৃত্তিকা ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন এসব কথা তাকে বলেনি। আর বলবেই বা কখন, মেয়ের সঙ্গে তার কথাবার্তাই বা কতক্ষণ হয় খাওয়ার এই সময়টুকু ছাড়া। ততোধিক বিস্ময়ে পান্নালালের জিজ্ঞাসা, 'জ্বালাইয়া মারে? কারা?'

ছেলের অজ্ঞতায় মায়ের উষ্মা বাড়ে। গলায় শ্লেষ ঢেলে অণিমাদেবী বলেন, 'কারা আবার? আইচ্ছা, তুই যে পাড়ায় ঢোকস-বাইরস তর চোখে কিছু পড়ে না?'

চোখে যে পড়ে না তাই বা বলে কি করে, সে তো আর অন্ধ নয়। আজকাল রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করা, তুলে নিয়ে যাওয়া, এমন কি শ্লীলতাহানি সবই খবরের কাগজের নিত্যকার খবর। তা ছাড়া এমন কোনো ঘটনা রাস্তাঘাটে যদি চোখে পড়েও কোনো ছা-পোষা মানুষ আগ বাড়িয়ে বলতে গিয়ে সাধ করে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা যখন নিজের মেয়ের বেলায় ঘটছে এবং পাড়ার ছেলেরাই যখন জড়িত তখন বাপ হয়ে পান্নালাল চুপ থাকে কি করে। সমস্যাটা সত্যিই তাকে ভাবিয়ে তোলে।

এই পাড়ায় পান্নালালের নয় নয় করেও চার পুরুষের বাস। দিদিরা, বোনেরা এই বাড়ি থেকেই তো স্কুল-কলেজে যাতায়াত করেছে। কই কখনও তো তাদের এমন অপ্রীতিকর অবস্থার সামনে পড়তে হয়নি। সত্যিই বোধহয় দিনকাল পালটে যাচ্ছে। মানুষ আব মানুষ থাকছে না। দিনকে দিন মানুষের মন থেকে মানবিক বোধগুলি কমে গিয়ে কেমন যেন অপরাধপ্রবণ, পাশব হয়ে উঠছে। মেয়েকে নির্ভরতা দিতে গলায় সোহাগ ঢেলে পান্নালাল মৃত্তিকাকে জিগ্যেস করে, 'কোন্ ছেলেগুলিরে মুন্নি?'

—লোহাপট্টির। কথাটা বলেই মৃত্তিকার মনে হয়, বাবাকে বলাটা হয়তো ঠিক হলো না। কেননা, বাবা যা গোঁয়ার প্রকৃতির মানুষ হয়তো এখনই তেড়ে যাবে ছেলেগুলিকে শায়েস্তা করতে। তাই পরক্ষণেই তরাসে বলে, 'বাপি তুমি কিন্তু কিছু বলতে যেও না। ওরা ভীষণ বাজে ছেলে। ওরা সব পারে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'দেখি কি করা যায়' বলে মাকে আশ্বস্ত করে পান্নালাল খাওয়া শেষ করে।

রাত প্রায় দুপুর। পান্নালালের চোখে ঘুম নেই। মেয়ের চিন্তাই থেকে থেকে তাকে উতলা করে তুলছে। স্ত্রী বেঁচে থাকলে হয়তো মেয়ের জন্য এই ভাবনা তাকে ভাবতে হতো না। পয়সা রোজগার করা ছাড়াও যে সংসারের প্রতি খুটিনাটি দায়িত্ব থাকে সেই বোধ এতকাল ছিল না। অথচ আজ খেতে বসে অণিমাদেবী যা বললেন, মেয়ে বড় হয়েছে—এই ভাবনাটা তার নিজেরই আরও অনেক আগে ভাবা উচিত ছিল। রাস্তাঘাটে কত রকমের বিপদ মেয়েদের জন্য ওঁত পেতে থাকে। যদি সত্যি সত্যি কোনো অঘটন

ঘটে যায়? কিন্তু কি ভাবেই বা সে এই ঘটনার মোকাবিলা করবে! ভাবতে গিয়ে প্রথমেই পান্নালালের মনে আসে পুলিশকে জানানোর কথা। কিন্তু পুলিশই বা কতখানি সুরক্ষা দিতে পারবে? পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, খবরটা জানাজানি হলে মাঝখান থেকে পাড়ায় একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে। এক হয়, পাড়ার মাতব্বরদের জানালে। কিন্তু জানাবে কাদের? এককালে যাদের এই তল্লাটে মাতব্বর বলে গণ্য করা হতো, যাদের কথা একবাক্যে পাড়ার সকলেই মেনে নিত, সেই মল্লিক, লাহা, দত্তবাবুদের বিশাল বাড়িগুলি আছে, কিন্তু লোক নেই—সব লোহার আড়ত। কালোয়ারদের কাছে বাড়িগুলি বিক্রি হয়ে গেছে। এই ক'বছরে গলির নাড়ি পর্যন্ত লোহার দোকান ঢুকে পড়েছে। অনেক ভেবে সে স্থির করে কাল সকালেই ক্লাবের ছেলেদের জানাবে।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে কিছুটা হালকা মনে হয় নিজেকে। সিগারেট ধরিয়ে পান্নালাল ছাদে এসে দাঁড়ায়। বৃষ্টিও ধরে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে প্রাক্-পূর্ণিমার চাঁদ। ভরা জোছনা শহরকে মুড়ে দিলেও মাটির নাগাল খুব বেশি পায় না। তার আগেই বিজলি বাতির দাপটে হারিয়ে যায়। যা থাকে তা সুউচ্চ বাড়ির ছাদে, নারকেল অথবা তালগাছের মাথায়। এত রাতে কোনোদিনও পান্নালাল ছাদে ওঠে না। তাই ছাদ থেকে রাতের আলোয় নিত্য দেখা শহরটাকে নিজের কাছেই কেমন রহস্যময়ী, অচেনা লাগে। তিনি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

যে মানুষটাকে কোনো কাজে ডাকলে কখনও পাওয়া যায় না, কাজ আছে বলে এড়িয়ে যায়, সেই পান্নালালকে সাত সকালে ক্লাবের দরজায় দেখে ছেলেরা অবাক। এ-কথা সে-কথার পর পান্নালাল সরাসরি অনুযোগ করে, 'তোমরা থাকতে পাড়ার মেয়েরা রাস্তায় চলতে ফিরতে বেইজ্জত হবে এ কেমন কথা। আমি তো ভাবতেই পারি না এর মধ্যে নাকি পাড়ারই কেউ কেউ জড়িত। আমার মেয়ে বলে বলছি না, অন্য কারো মেয়ের ক্ষেত্রে এমন ঘটলেও তো পাড়ার বদনাম। আর পাড়ার বদনাম মানে তো তোমাদেরও বদনাম।'

ছেলেগুলি নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। পান্নালালের কথা তাদের যে খুব একটা প্রভাবিত করেছে তেমন মনে হয় না। তবুও তাদের মধ্যে রঞ্জন নামের ছেলেটি বলে, 'এমনটা যে হচ্ছে তার কিছু কিছু আমাদের কানেও আসে, তবে ওরা আমাদের চেয়ে এতই জুনিয়র যে, ওদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে আমাদের নিজেদেরই খারাপ লাগে। ঠিক আছে আপনি বললেন তো, আর যাতে এরকম না হয় আমরা দেখছি।'

—দেখছি মানে? আজকেই সব কটাকে আচ্ছা করে ক্যালাব। না শোধরালে এরপর ওদের বাপদের ধরে প্যাঁদাব। কিছু বলি না বলে মাজাকি পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ যুবক রঘু কথাগুলি বলে।

পান্নালাল চলে যাওয়ার পর রঘুকে নিয়ে পড়ে রঞ্জন, 'আচ্ছা, পান্নালালবাবুর সামনে তোকে অত কথা বলতে কে বলল? মেয়েদের কথা শুনলেই তোর নোলায় জল আসে, না?'

—বাজে বকিস না তো। পাড়ার মেয়ে টিজ হবে আর আমরা চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকব?

রঘুর কথার ধরনে রঞ্জন অপমানিত বোধ করে। সেও গলা চড়িয়ে বলে, 'কারা করেছে তুই জানিস?'

—না জানার কি আছে। যারা গলির মুখে চায়ের দোকানে সকাল-সন্ধ্যা আড্ডা মারে, সেই চেতন, সুরেশ, আনন্দদের গ্রুপটাই এসব করছে।

দুজনেই চুপ। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না। অন্য ছেলেরা পরিণতি দেখার আশায় উসখুস করে। একসময় নীরবতা ভেঙে রঞ্জন শান্ত গলায় জিগ্যেস করে, 'বল তো রঘু ক্লাবের এই কালার টিভিটা কে ডোনেট করেছে?'

বেখাপ্পা প্রশ্নে রঘু খাবি খায়। এ ঘটনার সঙ্গে টিভির কি সম্পর্ক বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করে বলে, 'কেন, সুরেশের বাবা।'

—আর প্রতি বছর কালীপুজোর স্যুভেনিরের পাঁচ হাজার টাকার ব্যাক্ কভারটা কোন কোম্পানির?

—চেতনদের।

—ফি হপ্তায় ক্লাবে এসে বিনি পয়সায় বিলিতি মাল খাস। কার পয়সায় খাস সেটা ভালো করেই জানিস। তাহলে আর ন্যাকামি করলি কেন? যা করছিস কর, বেকার ছেলে মালপানি যাতে আসে সেই ধান্দা কর।

—কিন্তু তা বলে...। তা বলে...। রঘু তোতলায়।

ছেলের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে না পেরে সাবধানতা হিসেবে অণিমাদেবী দেওরকে অনুরোধ করেন কলেজ যাতায়াতের পথে তিনি যেন মৃত্তিকাকে গলির পথটুকু পার করে দিয়ে আসে। যদিও এইটুকুই যথেষ্ট নয় তবুও সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ থাকলে ভরসা পাওয়া যায়—এই আর কি!

একটু গাইগুঁই করলেও নাতনির নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্রায়-আশি ভূপতি মজুমদার নিমরাজি হন। সকালে দুধ আনা, বাজার করা, ফাইফরমাস খাটা এবং খবরের কাগজ পড়ার পর তিনি এই সময়টাতেই নিয়মিত আড্ডা দিতে বেরোন। এক সময়ের সরকারি চাকুরে এখন পেনশনভোগী। দাদা মারা যাবার পর সংসার সামলাতে গিয়ে তাঁর নিজের আর বিয়ে করার সময় হয়ে ওঠেনি। এখানে তার বয়সী মানুষজন অনেকেই মারা গিয়েছে, আবার কেউ কেউ পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। কমতে কমতে বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। তবুও মরে হেজে যে ক'জন আছে, স্মৃতি-চারণার সুখে তার আকর্ষণও বড় কম নয়। কিন্তু নাতনির নিরাপত্তার প্রশ্নটাই অগ্রাধিকার পায়।

মৃত্তিকা এবং আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে ভূপতিকে দেখে প্রথম কয়েকদিন রকবাজ ছেলেগুলি একটু সংযত থাকলেও ধীরে ধীরে স্বমূর্তি ধারণ করে। ভূপতিকে দেখলেই কোনোদিন সুর করে, 'চারো তরফ গোপিয়া বিচ মে কানহাইয়া'

বা মেয়েদের গলার অনুকরণে, 'হায় হায়, কা করু রাম মুঝে বুড্ডা মিল গয়া' বলে বিশ্রি রকম অঙ্গভঙ্গি করে। অথবা কোনো কোনোদিন ভূপতিকে একলা পেলেই ছাগলের ডাক, বেড়ালের ডাক ডেকে জ্বালাতন করে। কত আর সহ্য করা যায়? একদিন মেজাজ হারিয়ে চিরসঙ্গী লাঠিটি উঁচিয়ে তাড়া করলে ছেলেগুলি ভূপতিকে ঠেলে দেয়। বয়সের ভারে দুর্বল ভূপতি সামান্য ঠেলাতেই পড়ে গিয়ে চোট পান।

কাকার গায়ে হাত দিয়েছে কথাটা পাড়ায় রাষ্ট্র হতেই পান্নালালের আত্মসম্মানে লাগে। যা হয় হবে ভেবে একটা হেস্তনেস্ত করার অভিপ্রায়ে সে সোজা বলদেও সাউয়ের লোহার দোকানে গিয়ে ওঠে। বলদেও দ্রুত পানের পিক ফেলে একগাল হেসে শশব্যস্তে, 'আরে পান্নাবাবু? আসেন আসেন, বসেন। কেমোন আছেন বলেন।'

উত্তেজনায় শরীর কাঁপে পান্নালালের। কথাতেও তার আঁচ ফুটে বেরোয়। চড়া সুরেই তিনি বলেন, 'আমি বসতে আসিনি বলদেওবাবু। আপনি শুনেছেন নিশ্চয় আপনার ছেলে এবং তার দলবল কি করেছে?'

উদ্বেগহীন বলদেও যথেষ্ট নিরাসক্ত গলায় বলে, 'হা হা শুনবে না ক্যানো। লেকিন কসুর তো আপনার চাচাজীর আছে।'

—মানে? রোজ রোজ আপনাদের ছেলেগুলি মেয়েদের পথে ঘাটে বিরক্ত করবে, আর বলছেন দোষ আমার কাকার? আপনি জানেন, ইচ্ছে করলে ওই ছেলেগুলিকে টিজিংয়ের চার্জে আমি পুলিশে হ্যান্ডওভার করিয়ে দিতে পারি।

পান্নালালের আক্রমণাত্মক কথায় বলদেও রাগে না। কোনো ভাবান্তরও হয় না। বরং আগের চেয়ে আরও শান্ত গলায় বলে, 'আহাহা, আরামসে বসেন। এত্তো মাথা গরম করলে চলে। আগে বলেন কি খাবেন। ঠাণ্ডা না গরম?' এবং উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে গলা তুলে 'এ ভজুয়া, পান্নাবাবুকো লিয়ে এগো কোল্ড ড্রিংক্স মাঙুয়া দে।' তারপর ধূর্ত হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'ও বাত তো সহি আছে। পুলিশ আসবে, পাকাড়কে ভি লিয়ে যাবে, ডাণ্ডা ভি পিটবে, জাদা সে জাদা অন্দর করে দিবে। লেকিন পান্নাবাবু পুলিশ পয়সা ভি খাবে। ছোড়িয়ে ভি দিবে। পয়সা সে হোতা নেই এয়সা কোই কাম নেহী। আরে পান্নাবাবু, আমি বলছি কি ওসব ধান্দা ছোড়িয়ে দেন।'

কথাটির সারবত্তা অনুভব করে পান্নালাল চোঁক গেলে। তবুও না দমে বলে, 'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

বলদেও অন্য পথে হাঁটে। গলায় সহানুভূতি ঢেলে বলে, 'শুনিয়ে পান্নাবাবু, আপকা লেড়কি হামার ভি লেড়কি আছে। আছে না? হা কি না বলেন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পান্নালাল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মিটিমিটি হাসে বলদেও। প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমি একঠো বাত বলছি ধ্যানসে শুনেন। আমি বলি কি আপনি মকানটো ছোড়িয়ে দেন। ভাও যা আছে উসসে দশ বিশ বেশি লিবেন।'

চমকে ওঠে পান্নালাল। ঘোর কাটিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করে, 'মানে, বাড়ি বেচে দেব? আপনার কাছে?'

—তো কি হল! আপনি ভদ্রলোক আছেন। এ পাড়ায় আপনি থাকতে পারবেন না। যেখানে বাঙালি লোগ আছে উস মহল্লা মে মকান ঢুঁরে লিবেন। ব্যাস।

রক্ত গরম হয়ে ওঠে পান্নালালের। সে চেঁচিয়ে বলে, 'এটা তো বাঙালি মহল্লাই ছিল, আপনারাই তো উড়ে এসে...।'

হাত তুলে মাঝপথে পান্নালালকে থামিয়ে দিয়ে এবার বলদেও গলা চড়ায়, 'বাস, বাস। পুরানা বাত ছোড়কে আভিকা বাত সোচেন। আপনার ঘরে জোয়ান বেটি আছে, আর এ শালা কুওার বাচ্চা লেড়কালোগ বহোত হারামি আছে। আমার বাত ভি শুনবে না। কোনদিন না কোনদিন রাস্তাসে বেটিকো উঠাকে লিয়ে চৌপট হয়ে যাবে। তব তো বহোত দুখ্ কি বাত হবে। তখন আমাকে দুষবেন না যেন, হা।'

পান্নালালের ইচ্ছে করে শয়তানটার টুটি চেপে ধরে। কিন্তু শরীরে বিপরীত ক্রিয়া শুরু হয়। বলদেওয়ের কথায় শরীর আড়ষ্ট হয়ে আসে। সে বুঝতে পারে, অত্যন্ত সচেতনভাবে কথাগুলি বলেছে বলদেও। আর একবার যখন মুখ ফুটে বলেছে, পান্নালালকে পাড়া ছাড়া করবেই, সে যে ভাবেই হোক। তাকে শাসাতে এসে সে নিজেই এখন বলদেওয়ের ফাঁদে। এই মুহূর্তে বাবার বলা কথাগুলি মনে পড়ে, 'পানুরে দেখবি কইলকাতা একদিন বাঙালির হাতছাড়া হইয়া যাইব। অবাঙালিরাই কিন্যা নিব এই শহরটারে। তখন বাঙালিরাই হইব গিয়া নিজভূমে পরবাসী।' এত দুঃখেও হাসি পায় কথাটা তার জীবনে এমনভাবে ফলে যেতে দেখে।

চারপাশের লোকজন, হাঁকডাক, বাস-ট্রাম চলার শব্দ কোনোকিছুই পান্নালালের কানে যায় না। তার মনে হয় সে যেন কোনো নির্জন দ্বীপে বলদেওয়ের জালে বন্দী। বলদেও জাল গোটাতে শুরু করেছে। পান্নালালের দম বন্ধ হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে। তবুও, শুধু সংবাদটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে ভেবে বিবশ শরীরে সে এক-পা দু-পা করে চলতে শুরু করে।

তাবিজ

আপন মনে ছাতা সারে আনিস। এখনও অনেক ছাতা জমে আছে। বেলাও প্রায় দুপুর গড়িয়ে হাট ভাঙার সময় হয়ে এল। জমে থাকা ছাতাগুলির ওপর একবার নজর বুলিয়ে গেঞ্জির হাতায় কপালের ঘাম মুছে সে দ্রুত হাত চালায়। এমন সময় পাড়ার ছেলে মকবুল এসে ডাকে, 'চাচা, ও চাচা!'

মুখ তুলে তাকায় আনিস। মকবুলকে দেখে ভ্রূ কোঁচকায়। কাজের সময় খেঁজুরে আলাপ তার না-পসন্দ। শেষ হয়ে আসা বিড়িটা থুক করে ছুঁড়ে দিয়ে বিরক্ত গলায় জিগ্যেস করে, 'কি বলবি বল।'

—জানো চাচা, তোমার নামে একখানা পত্র এয়েচে।

—পত্র! আমারে পত্র দেলো কেডা? কপালে ভাঁজ ফেলে আনিস জানতে চায়।

পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড বের করে মকবুল বাড়িয়ে ধরে আনিসের দিকে। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে পোস্ট অফিস মাত্র একটি। রাস্তাঘাট সুগম নয় বলে পিওন সারা সপ্তাহের চিঠিপত্র হাটবারে বিলি করে। সুবিধাও আছে—হাটে প্রায় সবাই আসে। যারা আসে না তাদেরটাও পরিচিত জনেরা নিয়ে যায়।

পোস্টকার্ডটি হাতে নিয়ে নিরক্ষর আনিস বারকয়েক উল্টেপাল্টে দেখে মকবুলকে ফেরত দিয়ে বলে, 'পড় দিনি।'

চিঠির বয়ান শুনে আনন্দে 'ইনসাল্লা' বলে লাফিয়ে ওঠে আনিস। 'আজকেরে রবিবার।' চট করে আঙুলের কর গুনে বলে। 'তালে আর তো বেশি সোমায় নাইরে মকবুল।'

নিয়ামতপুরের 'আমরা কজন' ক্লাব তাদের গ্রামের বাৎসরিক শীতলাপূজা উপলক্ষে তিনদিনের মেলা. যাত্রাগান ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দুদিনের যে ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করেছে তাতে অংশ নেবার জন্য পত্র মারফত আনিসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই অঞ্চলে আনিস একজন বিখ্যাত ঘোড়দৌড়বিদ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার ঘোড়া ভেল্কি দেখিয়ে বাজি জিতে তাক লাগিয়ে দেয়। চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ এই ক'মাস নানা জায়গায় মঙ্গলচণ্ডীর মেলা, বিপত্তারিণী মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে ঘোড়দৌড় হয় এবং তাতে দূরদূরান্ত থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে।

—তালে চাচা, ইবারও কিন্তুক বাজি জেতা চাই। বিজ্ঞের ভঙ্গিতে উৎফুল্ল মকবুল বলে।

মকবুলের উৎসাহকে জিইয়ে রেখে রহস্যময় সুরে আনিস উত্তর দেয়, 'সবুর কর আগে। দ্যাকনা কি হয়।'

—যাবার সোমায় আমারেও নে যাবা কিন্তুক চাচা। আমি আগেই বলে রাখছি। মকবুলের গলায় আবদার।

দাঁড়ির ভাঁজে হাসি ঝুলিয়ে আনিস উত্তর দেয়, 'তা না নেবার কি হল।'

কথাবার্তার মাঝে একজন খদ্দের এসে তার ছাতার জন্য তাগাদা দিলে খদ্দেরটিকে অবাক করে আনিস খোলা ছাতাটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'খুব তাড়া থাকলি অন্যখান থে সাইরে লাও বাপু।'

অপ্রস্তুত খদ্দেরটি কথা না বাড়িয়ে 'ঠিকাচে, পরে এসে লিয়ে যাব' বলে সরে পড়ে।

ওরা আবাব নিজেদের আলোচনায় ফিরে আসে। মকবুল বলে, 'চাচা, তোমার ইবারকার ঘোড়াডা তো বিদেশি। না?'

আনিস উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসে।

—কুয়ান থিকে আনলে যেন চাচা।

—শোনপুর।

—সিডা কোন দিকি? এখেন থে কতদূর?

—সে মেলা দূর। ও তুই বুঝবিনে। আনিস নিজের কাজে মন দেয়।

বুঝবার কোনো দায়ও নেয় না মকবুল। শোনপুরের ভৌগোলিক অবস্থান জানা না থাকায় কথা বাড়ায় না। তবে লোকমুখে শুনেছে শোনপুরের মেলা নাকি খুব বড়। মেলায় হাতি-ঘোড়া-উট যেমন বিক্রি হয় তেমন নাকি মানুষও। এই আজব জায়গায় তার আনিস চাচা গেছে, ভাবতেই বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। চাচা গ্রামেরও গর্ব। দূর দূর জায়গা থেকে তার ডাক আসে। চাচার প্রতি শ্রদ্ধায় মনটা ভরে যায়। তার প্রকাশ জানাতে বলে, 'চাচা, ইট্টুসখানি চা খাবা নাকি?'

—হলি মন্দ হয় না। বল তালি।

সন্ধ্যের মুখে ঘরে ফিরে উঠানে পা রেখেই আনিস চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে। কাঁধের যন্ত্রপাতির ঝোলাটা বারান্দায় রেখে বলে, 'কোথায় গেলিরে তৈমুরের মা, একবার ইদিকে আয় দিনি।'

পুকুরপাড়ে তালগাছের গায়ে শেষ ঘুঁটেটি ধপাস করে সেঁটে আনিসের চিৎকারে গোবরমাখা হাতেই ছুটে আসে গুলাবজান বিবি। একহাতে পরনের কাপড় দিয়ে উদোম বুক-পিঠ সামলে বলে, 'অত চ্যাচানির কি হলো? কি বলবা তাই বল।'

—বাদশারে দানাপানি দিছিস?

প্রশ্ন শুনে চটে যায় গুলাবজান। এই হয়েছে এক জ্বালা। হাট থেকে তেতেপুড়ে এল মানুষটা। কোথায় বসে একটু জিরোবে, পানি খাবে, তা নয় এসেই এক কথা—। 'বাদশারে দানাপানি দিছিস?' এত আদিখ্যেতা অসহ্য লাগে। একেক সময় সন্দেহ হয় ওটা কি

ঘোড়া না, গুলাবজানের সতীন। সে মুখ ঝামটা দেয়, 'ক্যানো, তোমার কি মনে হয় অরে আমি খাতি দিই না? তাই যদি মনে কর তালে এখুন থিকে যেখেনে যেখেনে যাবা সাথে করে নে যাবা। অত ঝামেলা আমি পোয়াতে পারব না।'

আসলে হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথটুকু বাদশাব চিন্তায় এতটাই মগ্ন ছিল যে, কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারে এভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। সে ভালো করেই জানে বাড়ি না থাকলে গুলাবই বাদশার দেখভাল করে। যথেষ্ট দরদ দিয়েই করে। তাই গুলাবের মন ভেজাতে তোয়াজের সুরে বলে, 'শুদুমুদু রাগ করিস না, কথাটা আগে শোন। নিয়ামত পুর থেকে বাদশারে এত্তেলা দেছে।'

আনিস ভেবেছিল এবার বিবির মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু কথাটা শোনামাত্র গুলাবজানের মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিল। এত্তেলা পাওয়ার অর্থ তার অজানা নয়। আবার কদিন বাপ-বেটা ভিন গাঁয়ে ঘাঁটি গাড়বে। উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষায় দিন কাটবে তার। ঘোড়াপাগল মানুষটাকে নিয়ে তার হাড়মাস কালি হবার জোগাড়।

সাদি হওয়া ইস্তক গুলাবজান আনিসের এই ঘোড়াপ্রীতি দেখে আসছে। বাতিকটা ছিল বাপের, উত্তরাধিকার সূত্রে ছেলে পেয়েছে। ঘোড়া ঘোড়া করে জমিজিরেত যেটুকু ছিল সব গেছে। থাকার মধ্যে সামনের বাঁশ বাগানটা আর বাস্তুটুকু। শরিকদের সঙ্গে ভাগের পুকুর। সেটাও দেনার দায়ে বাঁধা পড়েছে শরিকদেরই একজনের কাছে। একটা ঘোড়া পোষার ঝক্কি তো কম নয়। সামনের জোড়া পা বেঁধে মাঠে চরতে ছেড়ে দেয় বটে, তবুও ছোলা এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী জোগাতেই হিমশিম খেয়ে যায় আনিস। প্রায় সারা বছরই বসিয়ে খাওয়ানো, মাঝে দু'তিন মাস মেলার মরসুম। তখন বাজি জিততে পারলে মেডেল আর কিছু নগদ। সে আর কতটুকু? এই তিন মাসে ডাক আসে অনেক জায়গা থেকেই, তবে সবখানে যে জিততে পারে এমন নয়। এখন তো তবু পুরস্কার নগদ অর্থ দিয়ে মেটায়। আর আগে? পেতলের কলসি, বদনা এমন আরো হরেক জিনিস দিয়ে।

গুলাবজান আপন মনে গজরায়। অবশ্য তাকে দোষও দেয়া যায় না। আনিসের গেঞ্জি গিট বাঁধা। কোথাও বেরোতে গেলে পরনের শাড়িতে গুলাবকেও নিয়মিত সূঁচ ফোটাতে হয়। সংসার টানতে আনিস হাটে হাটে ছাতা সারে, কখনও চাষে জনমজুর খাটে। অনেক দিনই বাড়িতে উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তবে হ্যাঁ, এত অভাবের মধ্যেও আনিস যখন বাজি জিতে বাড়ি ফেরে, 'আনিস চাচা জিন্দাবাদ, আনিস চাচা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সমর্থকরা যখন গ্রামের আকাশবাতাস মাতিয়ে দেয়, গুলাবজান বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার মিছিলের দিকে তাকিয়ে বিজয়ী বীরের স্ত্রীর গর্বটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। তখন সত্যিই সোয়ামীর সাফল্যে বুকটা ভরে ওঠে। তবুও সে যখন আনিসের মুখে বাদশার এত্তেলা পাওয়ার খবর শুনল, মুখটা গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

একটা কেন আনিস হাজারটা মেলায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেলেও গুলাবজানের মাথাব্যথা নেই। তার আপত্তি অন্যখানে। সে তার সোনামানিকেরে, একমাত্র ছেলে তৈমুরকে কিছুতেই প্রতিযোগিতায় সওয়ারি হতে দিতে চায় না। মায়ের মন অজানা আশঙ্কায় কাঁপে। তার মানিকের বয়স মোটে দশ। আট বছর বয়স থেকেই বাপের সঙ্গে বেরোচ্ছে। সে তো মহড়া দেওয়ার সময় দেখেছে কি দুরন্ত বেগে ঘোড়াগুলি ছোটে। আর ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। ভয়ডর বলতে কিছু নেই। প্রচণ্ড গতিতে কোনো অবলম্বন ছাড়াই ঘোড়া ছোটায়। দেখে ভয়ে মুখ ঢাকে গুলাবজান। বিভিন্ন জায়গা থেকে দুর্ঘটনার দু একটা খবর কানেও আসে। এই তো গেলবারই সংগ্রামপুরে—সবে ঘোড়াগুলি একসঙ্গে ছুটতে শুরু করেছে, ও পাশ থেকে একটি ছ-সাত বছরের বাচ্চা সঙ্গীদের ডাকে এ পাশে আসতে গিয়ে ঘোড়ার পায়ের চাপে মারা গেছে। খালি হয়ে গেছে কোনো অভাগিনী মায়ের কোল। অদেখা মায়ের পুত্রশোক যেন গুলাবের ভেতরেও চারিয়ে যায়। সে কাতর কণ্ঠে তৈমুরকে না নেওয়ার সমর্থনে ঐ প্রসঙ্গ দাঁড় করলে উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ে আনিস বলে, 'সত্যি তুই একটা পাগলি রে গুলাব।'

—সে তুমি ঝাই বল তৈমুরের বাপ, আমার ডর লাগে।

সান্ত্বনা দিতে আনিস বলে, 'তোর ডরের কোনো কারণ নাইরে গুলাব। তৈমুর কার ব্যাটা সিডা কি ভুলে যাচ্ছিস? তাপ্পর খোদাতালার রহমত থাকলি অর কিছু হবে না। কেউ কিচ্ছু করতি পারবে না। তার চে তুই এক কাজ কর দিনি। কালকেরে সকালে তুই ফুলজান খালার কাছে যা। বাদশার জন্যি পানিপড়া, তৈমুরের জন্যে তেলপড়া আর তাবিজ লিয়ে আসবি। এই ট্যাকাটা রাখ খালার সদগা মিটায়ে দিবি।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও আনিসের বাড়িয়ে ধরা নোটটি আঁচলে বাঁধে গুলাবজান।

ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগীরা একটা জিনিস খুব বিশ্বাস করে—'বাণমারা।' প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এই বিদ্যেটি গোপনে প্রয়োগ হয়। অনেক সময় দেখা গেছে, যে ঘোড়াটি দৌড়ে নিশ্চিতভাবে জেতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে পাশের ঘোড়াটি পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে এসে বাজি জিতে নেয়। সাধারণের কাছে এর গুরুত্ব নেই, কিন্তু যার ঘোড়া বাজি জিততে জিততেও হেরে যায় তার ধারণা এ আর কিছু নয় বাণের কেরামতি! সে জন্য ওরা এসময় খুব সতর্ক থাকে। পারতপক্ষে ঘোড়াকে খোলামাঠে চরতে দেয় না, লোকচক্ষুর সামনেও আনতে চায় না। আনিসের ভাষায়, 'অনেকের লজর খুব খারাপ।'

তুকতাক-এর ব্যাপারে ফুলজান বিবির খুব নাম ডাক। অসুখে-বিসুখে, আপদে-বিপদে তার টোটকা অব্যর্থ। এলাকার মানুষ ডাক্তার বদ্যির চেয়ে ফুলজান বিবির ওপর ভরসা রাখে বেশি। ছেলেটার জ্বর ছাড়ছে না ছোটো ফুলজান বিবির কাছে। কাকে বে-মিনসে করে সোয়ামী ভেগেছে ধর্না দাও ফুলজান বিবির আঙিনায়। কুমারী মায়ের লজ্জা বাঁচাতে ভরসা ফুলজান বিবির শেকড়বাকরের টোটকা। এ এক অলৌকিক কেরামতি। কালামী সাফল্য। উপকৃত লোকেরা যখন এসে ফুলজানের প্রশস্তি গায় তখন গর্বে তার

বুকটা ভরে ওঠে। পাক কালামের মালিক খোদাতালার কাছে সুকরিয়া আদায় করে। আবেগে অনুচ্চারে মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, 'আল্লা-রসুল-আল-আমিন।' হে ঈশ্বর, তুমি সর্বশক্তিমান। ইচ্ছে করলে সবই করতে পারো। এই একিন প্রগাঢ় ইমান থেকে বেরিয়ে আসে।

গুলাবজান ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ে ছেলের হাত ধরে। অনেকটা পথ। ওরা সূর্য ওঠার আগে পৌছবে বলে দ্রুত হাঁটে। তাগা, তাবিজ যেমন আনবে সেই সঙ্গে ছেলেটাকেও একটু ঝাড়ফুঁক করিয়ে নেবে খালার কাছ থেকে। সেই ইচ্ছেতেই তৈমুরকে সঙ্গে আনা। বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ। চৈত্রের সকালের ফুরফুরে হাওয়ার শরীরে জুড়িয়ে যায়। খালার বাড়ির সামনে দুপাশে ডোবা। সারবন্দি তালগাছের মাঝখান দিয়ে পথ। ওরা উঠোনে এসে দাঁড়ায়। তখনও ফুলজান ঘুম থেকে ওঠেনি। মাটির দেয়াল, খড়ের চালায় অতি উঁচু দাওয়া। ওরা মা-বেটাতে দাওয়ায় অপেক্ষা করে।

বসে থেকে ভাবনায় ডুবে যায় গুলাবজান। নানা কথা মনে আসে। তৈমুর তার পঞ্চম সন্তান। আগের চারটি বাঁচেনি। জন্মের পর পরই মারা গেছে। তখনও গুলাব ফুলজান খালার দ্বারস্থ হয়েছিল। খালা চেষ্টাও করেছিল বিস্তর, কিন্তু সুরাহা করতে পারেনি। হাল ছেড়ে বলেছিল, 'গুলাব আমার মন বলত্যাছে তোর পেটে ছাওয়াল এলি তোরে ডাইন ভর করে। এট্টুস সাবধানে থাকিস দিনি। খোলাচুলে যেখেনে সেখেনে যাবিনি, ঝার তার দেওয়া খাবার খাবিনি, আর খাওয়ার আগে গন্ধ শুঁকে এক চিমটি ফেলে দিবি।' এই ছিল ফুলজান খালার নিদান।

উদ্বিগ্ন গুলাব জিগ্যেস করেছিল, 'তালে ডাইন তাড়াচ্ছ না ক্যানো?'

ফোকলা দাঁতে পাকাচুল ভর্তি মাথা নাড়িয়ে খালা বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, কি করে তাড়াই বল দিনি। তারে ঝে দ্যাকতি পাই না। হাওয়ার সাথে কি নড়াই করা যায়? ঝেদিন দ্যাকতি পাব, আর বলতি হবে না।'

তৈমুর জন্মাবার আগেও গুলাব এসেছিল। ঝাড়ফুঁক, তাবিজ সবই করেছিল, আশ্চর্যভাবে তৈমুর বেঁচে গেছে। তখনও প্রশ্ন রেখেছিল গুলাব, 'খালা, ইবার কি ডাইনরে তুমি দ্যাকতি পেয়েছিলে?'

—না, ঠিক তা লয়, তবে আনজাদ করেছিলাম। একদিন ফজিরে, ত্যাখনও আঁধার কাটেনি, গাঙের ধারে এট্টা বুড়িরে বসি থাকতে দ্যাকেছিলাম। তারে আগে কখুনও এ গেরামে দ্যাকিনি। ত্যাখনি আমার সন্দ হয়েছিল। ব্যাস! ...গুলাবকে অস্বস্তিতে রেখে আর খোলসা করে না ফুলজান।

জন্মের পর পাঁচটা বছর খুব ভুগেছে তৈমুর। আজ সর্দিজ্বর তো কাল পেট খারাপ, পরশু খাওয়ায় অরুচি—এসব লেগেই থাকত। ঐ পাঁচ বছরে গুলাব খালার উঠোনের মাটি ধসিয়ে দিয়েছে। তবুও যাহোক খালার কেরামতিতে পরের কটা বছর, বলতে নেই তৈমুর একরকম নীরোগ হয়েই বেঁচে আছে। এতসব ভাবতে গিয়ে মনটা খালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। মনে মনে তাকে সালাম জানায়।

ঝাঁপ খোলার শব্দে গুলাবের তন্ময়তা ভাঙে। তাকিয়ে দেখে সামনে খালা দাঁড়িয়ে। কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে ফুলজান বলে, 'অনেক বেলা হয়ে গেল রে। কখুন এলিরে গুলাব!'

—এই এট্টুস আগে। তুমি ঘুমুচ্ছিলে।

আসলে তা নয়। ফুলজান ফজরের নামাজ পড়ায় রত ছিল, গুলাব তা বুঝতে পারেনি। কেন এসেছে এ প্রশ্ন অবান্তর। ফুলজান জানে লোকে কেন তার কাছে আসে। সাত সকালে খাস দরগার শুভ সূচনায় মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। সে ওদের বসিয়ে রেখে আপন কাজ সারে।

গুলাব নিজে থেকেই বলে, 'খালা তৈমুরের বাপ বলে পাঠাল বাদশার জন্যি ইট্টুস পানিপড়া দিতি। নিয়ামতপুরি ঘোড়দৌড়ে যাবে।'

ওদের একরকম উপেক্ষা করে ফুলজান প্রথমে হাঁস-মুরগিগুলি খোঁয়ার থেকে ছাড়ে। পরে ছাগলগুলি এনে উঠোনের খুঁটিতে বাঁধে।

দায় জানাতে গুলাব আবার বলে, 'তৈমুরটার জন্যি আমার চিন্তা, তুমি অরে ইট্টুস ভালো করি ঝেইড়ে দাও দিকিন খালা। পানি পড়া ঝা দেবার দ্যাও।'

—ইট্টুস শান্ত হয়ে বস দিনি। আমার দোরে এয়েচিস য্যাখন সব দেবানে। হাতের কাজডা সারতি দে। একে একে ঘর, দাওয়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া হলে ফুলজান গুলাবের উদ্দেশ্যে বলে, 'গেলাস এনেছিস? ইট্টুস তেল?'

একটি কাচের গ্লাস, শিশিতে সামান্য সরষের তেল গুলাব ফুলজান বিবির সামনে রাখে।

—যা দিনি এই গিলাসে করি পুখর থিকে পানি লিয়ে আয়। পুখরে লেবে পশ্চিম দিকি মুখ করি পানি তুলবি।

গুলাব তাই করে।

ফুলজান পাকমনে খাস করে পানি পড়ে। 'বিসমিল্লাহ্' বলে নিজের হাতে তৈমুরকে তিন ঢোক খাইয়ে দেয়। বাদশার জন্যও রাখে। উঠোনে দাঁড় করিয়ে কালাম পাঠের অনুপানে তৈমুরকে বারকয়েক ঝাড়ফুঁক দিয়ে গুলাবকে বলে, 'নে আর চিন্তা নি। এই তেলপড়াটা সারা গায়ে মাখায়ে দিবি, কুনো শয়তান অর উপরি ভর করতি পারবে না।' 'দাঁড়া ইট্টুস' বলে ঘর থেকে একটি প্রকাণ্ড তাবিজ এনে, 'এট্টা কালো কার দিয়ি গলায় বাঁধবি। ব্যস, ইবার বাড়ি যা।'

ফুলজানের আশ্বাসে নির্ভার হয় গুলাবের মাতৃহৃদয়। কালামী কেরামতির সদ্গাস্বরূপ একটি পাঁচটাকার নোট এক আঁচল থেকে আরেক আঁচলে আশ্রয় নেয়। ফুলজানের ফোকলা গালে হাসি ফোটে।

মেলার একদিন আগে বিকেলবেলা আনিস, মকবুল আর তৈমুরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় নিয়ামতপুরে। একসঙ্গে তিনজন বলে সারাটা দিন হেঁটে এসেছে। ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে হাঁটা তো নয় দৌড়ানোর সামিল। তৈমুর অবশ্য ঘোড়ার পিঠেই এসেছে।

মাথার ওপরে গনগনে সূর্য। ভোরে বেরিয়ে নদীর বাঁধে বাঁধে এসেছে চোদ্দ ক্রোশ পথ। পরিচিত মহলে আনিসের একটু নামডাক আছে বলে তার থাকার ব্যবস্থা হয় পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে। যে ঘরটায় আনিসদের থাকার জায়গা করা হয়েছে আসলে সেটা বৈঠকখানা। চারদিক খোলা, খড়ের ছাউনির চৌচালা ঘর। একদিকে কলাবাগান, অন্য পাশে বাঁশঝাড়।

জমাটবাঁধা অন্ধকার নিয়ে রাত বাড়ে। রাতচরা পাখি ডানা ঝাপটায়। বাঁশবাগানে জোনাকিরা আলো ছড়ায়। ঝিঁঝি ডাকে একটানা। হাওয়ার দোলায় বাঁশের গায়ে বাঁশের ঘষায় নিশুতিরাতে বিচিত্র শব্দ ওঠে। মশারির মধ্যে তিনজন। সারাটা দিন যে ধকল গেছে, মাদুরে গা ঠেকাতেই মকবুল আর তৈমুর অচেতন। ঘুম নেই আনিসের চোখে। বাজি জেতার চিন্তা তার ঘুম কেড়েছে। গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা বাদশার দিকে তাকায়। বাদশা পা দাপায়, লেজ আছড়ায়। বাঁশবাগানের মশা ছেঁকে ধরেছে। মশা তাড়ানোর জন্য আনিস আস্তাবলে ধোঁয়া দিত। এখানে সে ব্যবস্থা নেই। মনটা ভার হয়ে আসে। সে নিঃসাড়ে বাদশার কাছে গিয়ে গায়ে, মাথায় স্নেহের হাত বোলায়।

ভোর হতে না হতেই আনিস বেরিয়ে পড়ে ঘোড়া ছোটানোর জন্য নির্দিষ্ট মাঠটি দেখতে। আগেভাগে দেখে রাখলে পরে অসুবিধাগুলির মোকাবিলা করতে বেগ পেতে হয় না। সেখানে পুরনো দোস্তদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যদিও তারা এখন প্রতিদ্বন্দ্বী তবুও কুশল বিনিময়, খবরাখবর আদান-প্রদান হয়। আনিস এখনও ঠিক জানে না প্রতিযোগী কতজন। গতকাল যখন ক্লাবের খাতায় নাম লিখিয়েছিল তখন তার নম্বর ছিল এগার। এখন আজিজ সর্দারের মুখে শোনে তার নম্বর ছাব্বিশ। সে কাকদ্বীপ থেকে এসেছে। আরো যারা এসেছে, তারা কেউ সংগ্রামপুর, দক্ষিণ দুর্গাপুর, মালতিপুর, নূরপুর, সন্দেশখালি, হাড়োয়া এমনকী পলাশী থেকেও।

বেলা একটু বাড়তেই বাদশাকে নিয়ে বাঁশবাগানের গভীরে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায় আনিস। বলা তো যায় না কার মনে কি আছে। দেখে বোঝার যো নেই কে গুণিন আর কে নয়। আনিস জানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদশার খাওয়া শেষ করতে হবে যাতে প্রতিযোগিতার সময় খাদ্যাভারে অসুবিধায় না পড়ে। খাওয়া শেষে বাদশাকে নিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তুলতে। একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে, যতটা জোরে সম্ভব রগড়ে দেয় বাদশার শরীর। বারকয়েক করতেই বাদশা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সামনের দু'পা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন আনিসের ওপরেই ঝাঁপাতে চায়। দড়ি ধরে সামাল দেয় আনিস। বার বার এরকম করে বাদশাকে তাতায়। যখন বোঝে এবার সম্পূর্ণ তৈরি তখন ক্ষান্তি দেয়। আনিস স্নেহের চোখে বাদশার দিকে তাকায়। সাদা রঙে, তেল চুকচুকে বলিষ্ঠ চেহারা। নজর ঠিক্‌রে যায়। অনেক ঘোড়ার মধ্যে শুধু চেহারার জন্যই বাদশা অন্যের দৃষ্টি কাড়ে এ কথা হলপ করে বলা যায়। আনিস পিঠ চাপড়ে সাবাস দেয়। তার কাছে বাদশা তো শুধু এক জানোয়ার নয়, সন্তানতুল্য।

বেলা গড়িয়ে আসার সাথে সাথে মেলাও জমে ওঠে। চিৎকার চেঁচামেচির সঙ্গে

তারস্বরে মাইকে বাজে হিন্দি ছায়াছবির গান। শুধু নিয়ামতপুর নয়, আশপাশের গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ছে ঘোড়দৌড়ের আকর্ষণে। মাইকে ঘোষণা শোনা যায়, 'প্রতিযোগীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে আপনারা ঘোড়া নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসুন।'

একে একে বত্রিশজন প্রতিযোগী মাঠে আসে। এক সঙ্গে এত ঘোড়া এই অঞ্চলের মানুষ আগে দেখেনি। দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। খুঁটি পুঁতে দুপাশে বাঁশ বেঁধে কিছুদূর, বাকি রাস্তাটুকুর দূরে দূরে লাল নিশান পুঁতে দৌড়ের জন্য নির্দিষ্ট। বৃত্তাকার পথ ধুধু মাঠের মধ্য দিয়ে চার-পাঁচটা গ্রামের গা ছুঁয়ে গেছে। জনতা দুধারের বেড়ার গায়ের দখল নিতে দৌড়ায়।

ঘোড়ার সঙ্গে সওয়ারিরাও মাঠে আসে। ওদের বয়স আট থেকে চোদ্দর মধ্যে। প্রত্যেকের পোষাক প্রায় এক। কালো ইজেরের ওপর লাল স্যান্ডো গেঞ্জি, গলায় লাল শালু দড়ির মতো পাকিয়ে পরা। তৈমুরের মতো অনেকের গলায় লাল শালুর আড়ালে কলমাপড়া মাদুলি বাঁধা।

দুহাতে ছিপটি নিয়ে একে একে সওয়ারিরা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। ঘোড়ার লাগাম নেই, জিন নেই, নেই রেকাবও। একটি সাইকেলের টিউব ঘোড়ার গলা দিয়ে পরিয়ে, সামনের পা গলিয়ে অনেক কসরত করে পেটে আনা হয়েছে। দুই থাইয়ের ওপর টিউবটাকে তুলে দিয়ে একটা আলগা বাঁধনের ব্যবস্থা করে ভারসাম্য বজায় রাখে সওয়ারি। সারিবদ্ধ ঘোড়াগুলি নিয়ে সহিসেরা অপেক্ষা করে। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র জ্যা-মুক্ত তিরের মতো পলকে ছুটে বেরিয়ে যায় সুশিক্ষিত ঘোড়াগুলি। উল্লসিত দর্শকরা ধাবমান ঘোড়াগুলির দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না চোখের আড়াল হয়।

দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুহাতে ছিপটির আঘাতে ঘোড়া ছোটায় সওয়ারি। প্রত্যেকেই এগিয়ে যেতে চায়। ঘোড়াগুলি এত নিয়ন্ত্রিত, দেখে মনে হয় যেন ওরাও জানে বাজি তাকেই জিততে হবে। সামর্থ্য অনুযায়ী ছোটায় কেউ শৈথিল্য দেখায় না। তবুও সাদা ঘোড়া একে একে সবাইকে পেছনে ফেলে এগোতে থাকে। তৈমুর তখন উন্মাদ। ঘোড়া ছোটানো ছাড়া অন্য লক্ষ্য নেই। দেখে কে বলবে যে ওর বয়স মাত্র দশ। আনিস মনে মনে পীরের নাম নেয়। প্রত্যাশিত ভাবেই দর্শকের হাততালির মধ্যে সকলের আগেই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে এসে ঢুকে পড়ে তৈমুর। উচ্ছ্বসিত দর্শক আর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে না। বাঁধ ভাঙা জলের মতো ছুটে এসে সাদা ঘোড়ার সওয়ারিকে সাবাস জানাতে চায়।

পনের মিনিটের বিরতির পর দ্বিতীয় পর্বের ছোটা তারপর তৃতীয় পর্বের। এই অবসরে সকলেই ঘোড়াকে জল খাওয়ায়। সকলের অগোচরে আনিস জলের সঙ্গে ফুলজান বিবির দেওয়া পানিপড়া মিশিয়ে বাদশাকে খাওয়ায়।

দ্বিতীয় পর্বেও বাদশাই প্রথম। ঘোড়দৌড়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে ঘোড়া পর পর দুবার প্রথম হয় তাকে আর দৌড়তে হয় না, প্রথম স্থানাধিকারী বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু দর্শকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তৈমুর ঘোড়া ছোটাতে রাজী হয় এবং প্রত্যাশিতভাবে

এবারেও প্রথম হয়। পুরস্কার আনতে গিয়ে মঞ্চে দাঁড়ানো আনিসের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে।

ডেরায় ফেরার মাঝপথে আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। কালবৈশাখীর তাণ্ডব চলে সারারাত।

পরদিন রবিবার—ছুটির দিন। মাঠে উপচানো ভিড়। মেলা প্রাঙ্গন রেলস্টেশনের হাতায় বলে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ রেলযোগে ঘোড়দৌড় দেখতে আসে। রাস্তায় মানুষের বিরামহীন আনাগোনা দেখে আনিসের বুকটা খুশিতে ভরে ওঠে। শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়ায়।

নির্দিষ্ট সময়ে দর্শকদের হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোড়াগুলি ছুটতে শুরু করে। যথারীতি সাদা ঘোড়া এগিয়ে যায়। কিন্তু একি! এক জায়গায় আলগা মাটি গতরাতের বর্ষণে খুব নরম হয়ে গিয়েছিল। কাদাতে পা অনেকখানি ডুবে যায় বাদশার। প্রচণ্ড গতি ব্যাহত হতেই তৈমুর ঘোড়ার পিঠে একটা ঝাঁকুনি খায়। কট করে একটা শব্দ ওঠে। পা টেনে তুলতে যেটুকু সময়, পাশে ছুটতে থাকা ঘোড়াটি বাদশাকে পেছনে ফেলে প্রথম হয়।

উদ্বেগে আনিসের মুখ শুকিয়ে যায়। এমনটা তো হবার কথা ছিল না। তৈমুরের কাছে সব শুনে বলে, 'ঠিকাছে, এখুনও দুরাউন্ড বাকি। আমার মুখটা রাখিস বাপজান। নালে লোকে যে আমারে ছ্যা ছ্যা করবে।'

আনিসের কাতর আবেদন তৈমুরকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সে বাপকে আশ্বাস দেয়, 'তুমি কিছু ভেবোনি তো আব্বা। ইবার দেখ আমি ঠিক ফাস্ট হবানে।'

দ্বিতীয় পর্বের দৌড়ের শুরুতেই সাদা ঘোড়া এগিয়ে যায়। তৈমুর সতর্ক। দ্বিতীয়বার একই ভুল সে আর করবে না। এখন সে অন্য তৈমুর। প্রাণপণে ঘোড়া ছোটায়। বারবার আনিসের বিষাদমাখা মুখটা মনের আয়নায় ভেসে উঠে তাকে আনমনা করে দেয়। তার হাতেই নির্ভর করছে আব্বাজানের মান-সম্মান। সে আব্বাজানকে কথা দিয়েছে ফাস্ট হবে। তার হাতের ছিপটি ঘনঘন ঘোড়ার পিঠে আঘাত করে। একে একে সব ঘোড়া অনেক পেছনে পড়ে থাকে। তৈমুরের মুখে হাসি ফোটে। এক পলক পেছনে তাকায়। নিশ্চিতভাবে সে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভাবতেই একটা স্বস্তি অনুভব করে। বাদশা আরো গতি বাড়াতেই কটাস করে টিউবটা ছিঁড়ে ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ে। মুহূর্তে তৈমুর নিরাপত্তাহিন হয়ে পড়ে। আগের রাউন্ডে কাদায় পা গেঁথে ঝাঁকুনি খাওয়ার সময় টিউবে চির ধরেছিল, বাপ-বেটা কারো নজরেই পড়েনি। দ্বিতীয়পর্বে দৌড়তে গিয়ে ঘষায় ঘষায় ছিঁড়ে যায়। এই মুহূর্তে তৈমুরের অবস্থা অভিমন্যুর মতো। অভিমন্যু ব্যূহে ঢোকার কৌশল জানতেন, বেরোবার নয়। দশ বছরের তৈমুর ঘোড়া ছুটিয়ে কিভাবে বাজি জিততে হয় ভালো জানে, কিন্তু বিপদে নিজেকে কিভাবে বাঁচাতে হয় সে কৌশল অনায়ত্ত। তাছাড়া বাজি জেতার জন্য মরীয়া সওয়ারি ছিপটির আঘাতে ঘোড়ার পায়ে যে গতির সঞ্চার করে সেই প্রচণ্ডতম গতি হঠাৎ রোধ করা বল্গাহীন কোনো কিশোর সওয়ারির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। উপরন্তু হিমশীতল মৃত্যুভীতি তৈমুরকে অসাড় করে দেয়। দিশাহীন

তৈমুর নিজেকে পতনের হাত থেকে বাঁচাতে ছোট্ট হাতে ঘোড়ার বিশাল পেটের বেড় না পেয়ে ঘষটে ঘষটে ঘাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বাদশার কান দুটি টেনে ধরে। পিঠের সওয়ারির ঘাড়ে আসা এবং হঠাৎ কান টেনে ধরা—বিভ্রান্ত বাদশা এক ঝটকায় তৈমুরকে ছিটকে ফেলে এগিয়ে যায়!

দূর থেকে সওয়ারিবিহীন বাদশাকে দেখে অনিসের বুকটা ধক্ করে ওঠে। সে পাগলের মতো ছুটে এসে দেখতে পায় পেছনে ধেয়ে আসা ঘোড়াগুলির খুরের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত তৈমুরের দেহটি নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে একপাশে। 'ইয়া আল্লা' বলে আনিস চেঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৈমুরের উপর। রক্তাক্ত মাথাটা বুকে চেপে ফোঁপায়। কাঁদতে কাঁদতে একসময় চোখের জল শুকিয়ে এলে আনিস তৈমুরের মুখের দিকে তাকায়। সে দৃষ্টিতে পর্যায় ক্রমে ফুটে ওঠে অবিশ্বাস আর হিংস্রতা।

চারপাশে ঘিরে থাকা সমব্যথীরা বিস্ময়ে লক্ষ্য করে আনিসের নজর তৈমুরের মুখের দিকে নয়, সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তৈমুরের গলার দিকে— কালো কারে বাঁধা তাবিজটির দিকে।

কদম ফুলের গন্ধ

আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। মুষলধারে ঢালছে একটানা। যে রকম হলে দিনটা ভারাক্রান্ত, মনটা বিষণ্ণ হয়, সকাল থেকে পরিবেশে তারই ছোঁয়া। সেই বিষণ্ণতা চারিয়েছে শ্রেয়ার মনেও। উদাস দৃষ্টি দোতলার জানলার গরাদ গলে শূন্যে নিবদ্ধ। হাতের নাগালে বৃষ্টিভেজা কদমফুলের গাছ, গাছের ডালে সার বেঁধে কাকেদের ভেজা অথবা রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির জলে শিশুদের কলরব, কোনো কিছুতেই শ্রেয়ার হুঁশ নেই। তার দৃষ্টিতে সব ঝাপসা—বাইরে শ্রাবণের ধারার, চোখে হৃদয়মথিত অশ্রুর। আর চোখের আড়ালে বুকের মধ্যে তরঙ্গায়িত ভাবনার ভাঙচুর।

আজ বাইশে শ্রাবণ। সকাল থেকে কতবার যে বন্ধুদের ফোন, কেউ কেউ সদলে হানাও দিয়েছে, কিন্তু রাজি করাতে পারেনি শ্রেয়াকে। ঠাকুরবাড়িতে কবি প্রণাম করতে যায়নি। কম-বেশি আট বছরের রীতি ভেঙে স্বেচ্ছায় ঘরবন্দি হয়ে রয়েছে।

দরজার বাইরে দাপুটে পায়ের শব্দ কানে আসতেই শ্রেয়া সঙ্কুচিত হয়। ডাকতে ডাকতে জয়ন্তী ঢোকেন, 'কিরে আর কত বেলা করবি? ঠাকুরবাড়ি গেলি না ঠিক আছে, কিন্তু নাওয়া খাওয়াটা তো করবি? নাকি ভেবে ভেবে উপোস দিবি?'

মায়ের উদ্দাম গলা কানে গেলেও শ্রেয়া রা কাড়ে না। গরাদে গাল চেপে আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়ের নীরবতা জয়ন্তীকে বিরক্ত, অসহিষ্ণু করে তোলে। শ্রেয়াকে টেনে জোর করে নিজের দিকে ফেরালে, গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রু চোখে পড়তেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। গলা চড়িয়ে বলেন, 'আ মলো যা, ঢং দেখে আর বাঁচিনে। উনি এখন কাঁদতে বসেছেন। বলি, যার জন্য কাঁদা তিনি তো দিব্যি ঠাকুরবাড়িতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছেন। দেখ শ্রেয়া, ছেদো সেন্টিমেন্ট আমার ভাল্লাগে না। ওসব ভুলে এখন চান করে খেয়ে নিবি চ। আমার খিদে পেয়েছে।'

কয়েকটা কঠিন শব্দ জিভের ডগায় এলেও, শ্রেয়া সামলে নেয়। এই সময় মাকে ঘাটিয়ে পবিবেশ বিষিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে না। করুণ সুরে শুধু বলে, 'মা, প্লিজ আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

জয়ন্তী অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকান। তারপর দুটি হাতের মুদ্রায় পৃথিবীর যাবত তাচ্ছিল্যকে জড়ো করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, 'বুঝি না বাপু, তোদের রকমসকম।' বলে মুখ বাঁকিয়ে যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিলেন তেমনি বেরিয়ে যান।

জয়ন্তী চলে গেলেও রেখে গেলেন খোঁচাটা। 'সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে।' প্রায় বছর দেড়েক একসঙ্গে ঘর করার পর আদিত্য সম্বন্ধে বলা কথাটা শ্রেয়া মেনে নিতে পারে না। বাইরে থেকে দেখে বোঝার জো নেই—রাগ, বিরক্তি বা কষ্ট

সবকিছুই আশ্চর্য নীরবতায় আত্মস্থ করে নির্বিকার থাকার ক্ষমতা আদিত্যর জন্মগত। ও যে কি কষ্ট বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে শ্রেয়া ছাড়া কেউ জানে না। নয় নয় করেও সাতটা মাস সে বাপের বাড়িতে পড়ে আছে। একবারের জন্যও আদিত্য খোঁজ নেয়নি। অথচ আগে বাপের বাড়িতে এসে ফিরতে একদিন দেরি হলেই আদিত্য এসে হাজির এবং কোনো ওজরের অপেক্ষায় না থেকে, একেবারে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরত। এমন মানুষের নীরবতার কারণটা না বোঝার মতো মেয়ে শ্রেয়া নয়। কিন্তু পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে। সত্যি, অপমান-অভিমানে মানুষটা একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে। ভাবতে গিয়ে, বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

অথচ প্রথম প্রথম শ্রেয়ারও খুব রাগ হত আদিত্যর ওপর। ভাবত, না এলো তো বয়েই গেল। দেখি না কতদিন না এসে পারে। মাও বোঝাতেন, 'তুই একদম নরম হবি না। লাটাই তোর হাতে— দেখবি বাছাধন সুড়সুড় করে ঠিক এসে হাজির হবে।'

মা-র কথা মেনে অপেক্ষাই সার। আদিত্য আসেনি, কোনো খবরও নেয়নি।

দিনে দিনে রাগ অভিমানে, অভিমান হতাশায় গড়ালে আড়ালে চোখের জল ফেলে শ্রেয়া। যদিও ভাবনাটা ছেলেমানুষী, তবুও প্রায় সারাটা সকাল স্টেশন লাগোয়া বাড়ির জানালা দিয়ে কাঙালিনীর মতো কলকাতাগামী ট্রেনগুলির ওপর পর্যায়ক্রমে চোখ বোলায়। কেননা আদিত্য এ সময় অফিস যায়। বড় আশায় থাকে, যদি দেখতে পায়? যদি চোখে চোখ পড়ে? কিন্তু একদিনও দেখা হয় না। তবুও মন মানে না, আবার পরদিন, দিনের পর দিন নিয়ম করে জানলায় এসে দাঁড়ায়।

মা-বাবার একমাত্র সন্তান শ্রেয়া—বড় আদরের। বাপ নয়, মায়ের ন্যাওটা। অথচ এখন সে মাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তাঁর খবরদারি শ্রেয়ার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। তার বুক নিংড়ানো চোখের জল মায়ের কাছে ঢং, ছেদো সেন্টিমেন্ট।

কিন্তু মা যতই আজকের দিনটিকে অস্বীকার করে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুক, শ্রেয়া তো হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, এ দিনটিকে ভুলে থাকা যায় না। অস্বীকার করাব তো কথাই ওঠে না। তাহলে যে নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হয়। আর, তা পারছে না বলেই চোখ দুটি ক্ষণে ক্ষণে জলে ভরে উঠছে।

এই দিনটিতেই আদিত্যর সঙ্গে শ্রেয়ার প্রথম আলাপ। বান্ধবীদের সঙ্গে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবার পর একটু জিরিয়ে নেবার অভিপ্রায়ে ঠাকুরবাড়ির দালানের একপাশে সহচরী পরিবৃত হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে খুনসুটিতে মেতে উঠেছিল। শ্রেয়া খেয়াল করেনি, বাসবীই ওকে দেখায়, 'দেখ, দেখ ওই লোকটা কেমন বার বার তোকে দেখছে আর খাতায় কি যেন করছে। মনে হয় তোর ছবি আঁকছে!'

কথাটা শুনে শ্রেয়ার যথেষ্ট রাগ হয়। একি অসভ্যতা। বলা নেই, কওয়া নেই, ছবি আঁকলেই হল। শ্রেয়া বরাবরের একগুঁয়ে। বলে, 'চল তো দেখি।'

বাসবীর অনুমান ঠিক—আদিত্য শ্রেয়ার মুখের স্কেচ করছিল। শ্রেয়া সবাসরি অভিযোগ জানায়, 'এটা কি হচ্ছে? আপনি কোন সাহসে আমার ছবি আঁকছেন? বিনা

অনুমতিতে একজন ভদ্রমহিলার অগোচরে তার ছবি আঁকা কোন্ দেশি ভদ্রতা?' গলায় যতটা জোর দেয়া সম্ভব, সেভাবেই কথাগুলি বলে শ্রেয়া।

আদিত্যর কোনো বিকার নেই। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রেয়ার মুখের দিকে তাকায়। ধীরে সুস্থে তার আঁকার সরঞ্জাম ব্যাগে ভরতে ভরতে ঈষৎ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, 'সুন্দর মুখের ছবি আঁকতে গেলে অনুমতি লাগে নাকি?'

এরকম স্পষ্ট জবাব শ্রেয়া আশা করেনি। বরং সে উল্টোটাই ভেবেছিল যে, ধরা পড়ে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিব্রত হবে এবং কাঁচুমাচু মুখে গড়পড়তা আর পাঁচজনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে দোষ স্খালনের চেষ্টা করবে। ফলে হতভম্ব শ্রেয়ার মুখ থেকে শুধু একটি শব্দই বেরিয়ে আসে, 'মানে?'

—এর কোনো মানে হয় না ম্যাডাম।

সেই শুরু। প্রথম প্রথম বান্ধবীদের নিয়ে, পরে একাই সৌম্যদর্শন বছর তিরিশের আদিত্যর সঙ্গে আজ গঙ্গার পাড় তো কাল বোটানিক্যাল, পরশু বেলুড় মঠ তো পরের দিন কফি হাউস। অবশ্য সবসময় নয়, আদিত্যর আঁকাজোকার বাইরে খবরের কাগজের অফিসে চাকরিও ছিল একটা। সেটা বাঁচিয়ে সময় বের করে তবেই। বছরখানেক এভাবে কাটাবার পর, শ্রেয়া বালিগঞ্জের ঠিকানা ছেড়ে গড়িয়ায় আদিত্যদের ভরা সংসারে ঢোকে বাড়ির ছোট বউ হয়ে।

নতুন পরিবেশে মানাতে পারবে কি পারবে না, কে কি রকম হবে—একটা ভয় ছিলই। কিন্তু বড় তিন জায়ের ব্যবহারে কদিনেই শ্রেয়ার সেই ভয় উধাও। সংসার বড় বউ-এর হাতে। বাতে কাবু শাশুড়ি ঠাকুরঘর আর নাতি-নাতনি নিয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। বড় বউয়ের কর্তৃত্ব নির্বিচারে সবাই মেনে চলে তার ব্যবহারের গুণে। শ্রেয়াও কদিনেই তার বশ হয়ে গেল শুধু নয়, তার মনে হল সে বাইরের নয় এ বাড়িরই মেয়ে। বেড়াতে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য, এবার ফিরে এসেছে। তার কাজ বাড়ির কচিকাঁচাদের পড়ার তদারকি, শাশুড়িকে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনানো আর শ্বশুরের সাথে সকাল সন্ধ্যে গল্প করা।

শ্রেয়া বেশ ছিল। কিন্তু তার সুখের সংসারে অশান্তি সাধ করে ডেকে আনলেন জয়ন্তী—তার গর্ভধারিণী। একে তো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের পছন্দের ছেলেকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছে তার উপর একান্নবর্তী সংসারে মেয়ের অবস্থান তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তার মনে হত আদিত্যর যা রোজগার তাতে দুটি প্রাণির খেয়ে পড়েও উদ্বৃত্ত থাকার কথা। সেটা ভবিষ্যতে যেন সঞ্চয় করে রাখতে পারবে। কিন্তু বড় সংসারে একসঙ্গে থেকে তা সম্ভব নয়। তাই ভাবতেন, মেয়ের একটা আলাদা বাড়ি হোক, আলাদা সংসার হোক। তাছাড়া তার কেন যেন মনে হত অনেক লোকের সংসারে তার মেয়ে সুখী নয়। খেটে খেটে শরীর পাত করে ফেলছে। এই ধারণা থেকেই জামাই-মেয়ে বাড়ি এলে ফাঁক পেলেই কথাটা আদিত্যর কানে তুলতেন, 'জানো তো বাবা, মেয়েটার শরীর দিন দিন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

শশব্যস্তে আদিত্য বলত, 'সেকি! শ্রেয়া তো আমাকে কোনোদিন তার শরীর খারাপের কথা বলেনি।

—সে বলবে কেন বাবা! আমার মেয়ের তো আর কান ভাঙানি স্বভাব নয় যে, অফিস থেকে ফিরলেই স্বামীর কাছে সব ব্যাপারে লাগাবে। আসলে অতবড় সংসারের খাটুনি আমার মেয়ে একা পেরে ওঠে না।

এবার সত্যি সত্যি আদিত্য আকাশ থেকে পড়ে। সবিস্ময়ে বলে, 'এ আপনি কি বলছেন মা? আমি যতদূর জানি ওকে সারাদিনে প্রায় কোনো কাজই করতে হয় না। বৌদিরাই তো সব সামলে নেয়। তা ছাড়া নিজের সংসারে সব মেয়েকেই একটু আধটু কাজ তো করতেই হবে।'

আদিত্যকে সোজা কথায় বাগে আনতে না পেরে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়েন জয়ন্তী। গলা চড়িয়ে বলেন, 'কেন করবে? আমার মেয়ের দায় পড়েনি তোমার সংসারে হাঁড়ি ঠেলার জন্য, বুড়ো মায়ের গু-মুত কাচার জন্য। মেয়েকে এসব করতে লেখাপড়া শেখাইনি।'

মায়ের খোঁটায় আদিত্য আহত হলেও যেহেতু শাশুড়ি গুরুজন, বলতে গেলে মায়ের মতো তাই নিজেকে সংযত রেখে যতটা সম্ভব স্পষ্ট এবং শান্ত স্বরে শ্বশুরের সামনেই বলে, 'আপনাদের যদি এই ইচ্ছাই ছিল তাহলে আর মেয়ের বিয়ে দিলেন কেন? ঘরে রেখে দিলেই তো পারতেন।'

—আমরা তো সেধে মেয়ের বিয়ে দিতে যাইনি। তাছাড়া কি পারতাম আর পারতাম না সেটা তোমার কাছে শিখতে যাব না। আমি চাই না শ্রেয়া রাবণের গুষ্টির হাঁড়ি ঠেলুক। তুমি ওকে নিয়ে আলাদা বাসা করে উঠে যাও।

আদিত্যর কাছে চিত্রটি এবার পরিষ্কার হয়। তার মনে হয়, এই তার শ্রদ্ধার পাত্রী শাশুড়ি? যিনি সংসার গড়তে নন, ভাঙতে উসকানি দিচ্ছেন। ছিঃ ছিঃ! বিতণ্ডায় জড়িয়ে গিয়ে এখন নিজেরই লজ্জা করছে। তবু তার মতামত জানাতে বলে, 'আপনি যা চাইছেন আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। জয়ন্তীও যে পুত্রসম আদিত্যর সঙ্গে কথা বলছেন এ কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করতে মানুষ যেমন ফিকির খোঁজে, মিথ্যা অপবাদে পর্যুদস্ত করতে চায়, তেমনি তিনিও রসিয়ে রসিয়ে বলেন, 'তা সম্ভব হবে কেন? তাহলে যে বৌদিদের ছেড়ে থাকতে হবে—এতদিনের ভাব-ভালোবাসা কি ছেড়ে আসা যায়?'

জয়ন্তী এমন ভঙ্গিতে কথাগুলি বলেন যা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে। লজ্জায় শ্বশুরের সামনে আদিত্যর মাথা হেঁট হয়। সে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। কথা না বাড়িয়ে বলে, 'আমি চললাম, যদি ইচ্ছে হয় মেয়েকে পরে পাঠিয়ে দেবেন।'

শ্রেয়াকে ওঁরা পাঠায়নি। আদিত্যই লজ্জার মাথা খেয়ে দিনসাতেক বাদে নিতে এসেছিল। কিন্তু শাশুড়ি তার অবস্থানে অনড় থেকে পুরনো কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন

এবং শেষ পর্যন্ত আদিত্যকে রাজি করাতে না পেরে চরম কথাটিই বলে দিয়েছেন, 'আমরা মেয়েকে আর তোমাদের কাছে পাঠাবো না।'

রাগের বশে অনেকেই অনেক কিছু বলে। শাশুড়িও হয়তো তাই বলেছেন ভেবে আদিত্য মৃদু হেসে বলে, 'শ্রেয়া তো আর ছোটটি নেই, আপনি না পাঠালেও ও ঠিকই চলে আসবে।'

আদিত্যর ভাবনায় যে ভুল ছিল তা একটু পরেই বুঝতে পারে। তার বলা শেষ হতে না হতেই জয়ন্তী তীব্র স্বরে বলেন, 'তাহলে মেয়ে আমার মরা মুখ দেখবে।'

এরপর আর অপেক্ষা করার কোনো যুক্তি নেই মনে করে আদিত্য এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি, এমনকি শ্রেয়ার সঙ্গেও দেখা করেনি। ধুলো পায়ে বেরিয়ে যেতেই শ্রেয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলেছিল, 'এ তুমি কি করলে মা? এত বড় একটা দিব্যি দিলে?'

পাকা অভিনেত্রীর মতো খোলস পালটে জয়ন্তী হেসে বলেছিলেন, 'তুই এত ভাবছিস কেন বল তো, আমি তো আছি? পুরুষ মানুষদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তোর বাবাকে দেখছিস তো। দুদিন রোখ থাকবে, তারপর দেখবি সুড়সুড় করে তোর পায়ে এসে পড়বে। তুই শক্ত থাকলেই হল।'

এতদিন মায়ের কথায় মন শক্ত করেই শ্রেয়া বাপের বাড়িতে পড়ে রয়েছে। কিন্তু আর পারে না। তারও তো রক্ত মাংসের শরীর, নিদেন মন বলে একটা বস্তু রয়েছে। বাইরে যতই ভাব দেখাক কিছুই হয়নি কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে। সাত মাস ধরে সে একই যন্ত্রণা ভোগ করছে।

শেষ বিকেলে জয়ন্তী আবার শ্রেয়ার ঘরে এসে ঢোকেন। গলায় উদ্বেগ নিয়ে বলেন, 'হ্যাঁরে শ্রেয়া, তোর বাবা তো এখনও অফিস থেকে ফিরলো নারে? কোনোদিন তো এরকম করে না। তোকে কি কিছু বলে গেছে? তুই জানিস কিছু?'

শ্রেয়া নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল এবং বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মনে মনে মাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সকাল থেকে মনটা এমনিতেই মায়ের উপর বিরূপ ছিল। এখন জয়ন্তীর বলা কথাগুলি তার কাছে ন্যাকামি ছাড়া কিছু মনে হয় না। তাছাড়া বাবার জন্য মায়ের এই উদ্বেগ কতটা সত্যি আর কতটা ভান সে ব্যাপারেও শ্রেয়া নিশ্চিত নয়। আর যদি এই উদ্বেগ সত্যিই হয় তাহলে ধরে নিতে হয় তাঁরও সংবেদনশীল একটা মন আছে। একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর জন্য এই উদ্বেগ খুবই স্বাভাবিক। তাহলে এই কমাস ধরে যে মানুষ স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেয়েকে নিজের কাছে একরকম জোর করে আটকে রেখেছেন, সে যে কি নিদারুণ মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছে এটাও তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। যদি পারেন, তবে কি শুধু নিজের জেদ বজায় রাখতে বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। এই কথাটা ভাবতে গিয়ে শ্রেয়া ধৈর্য্য হারায়। উদ্ধত গলায় মায়ের মুখের ওপর বলে, 'আমি কি জ্যোতিষী যে হাত গুনে বলব? খুব যদি চিন্তা হয় রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজে দেখ না গিয়ে, কে বারণ করেছে?'

মনটা ভালো নেই বলে জয়ন্তী কথার মারপ্যাঁচে যান না। তিনি অপ্রস্তুত মুখে শুধু বলেন, 'আহা, কি কথার কি ছিরি!'

কথার মাঝেই ছাতার জল ঝাড়তে ঝাড়তে সত্যব্রত ঘরে ঢোকেন। অপাঙ্গে আপাদমস্তক দেখে স্বভাবসুলভ কর্কশ গলায় জয়ন্তী স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'ফিরতে এত দেরি হল যে! কোন্ চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি?'

দীর্ঘদিন জয়ন্তীকে নিয়ে ঘর করা, পোড়খাওয়া সত্যব্রত স্ত্রীর ঝাঁঝকে গায়ে না মেখে খাটে গিয়ে বসেন। তার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলেন, 'চুলোয় যাব কোন দুঃখে। বলতে পারো অমরাবতী ঘুরে এলাম। গিয়েছিলাম শ্রেয়ার শ্বশুরবাড়ি।'

মাথায় ছাদ ভেঙে পড়লেও জয়ন্তী বোধহয় এতটা চমকাতেন না, শ্রেয়ার শ্বশুরবাড়ি শুনে যত না চমকালেন। তবুও নিজেকে সামলে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'তার মানে? তুমি সেধে সেধে ওখানে গেলে? আচ্ছা আমাদের কি কোনো মান সম্মান নেই? তুমি কি মনে কর আমার মেয়ে ফেলনা?' স্বামীর প্রতি চাপা রাগে কাঁপতে থাকেন জয়ন্তী।

স্পষ্টত বিরক্ত সত্যব্রত বলেন, 'দেখ, মেয়ে ফেলনা আমি কখনই বলিনি। কিন্তু আমি তো মেয়ের বাপ, আমি সেধে যাব না তো কে যাবে? একবারও কি মা হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছো কি কষ্ট বুকে নিয়ে ও দিন কাটাচ্ছে। ওর মুখের দিকে তাকালে আমারই তো কান্না পেয়ে যায়। আমি বাপ হয়ে যদি এটা উপলব্ধি করতে পারি—তুমি তো ওকে পেটে ধরেছো, কেন শুধু শুধু মেয়েটাকে আটকে রেখেছো বলো তো।'

—আটকে রেখেছি মানে? আদিত্যই তো নিতে আসেনি।

—আদিত্য নিতে আসবে কেন? তুমি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছো, সে আর কোন মুখে এ বাড়িতে আসবে। সে তো আমার মতো ভেড়ুয়া নয়। তার আত্মসম্মান বোধ আছে। সে কেন তোমার কথায় মা-ভাই ত্যাগ করে আলাদা হবে। তুমি কি সবাইকে আমার মতো পেয়েছো নাকি? তোমার পাল্লায় পড়ে আমাকেও তো বাড়ি ছেড়ে আলাদা হতে হয়েছিল। বাপের সংসারেও কম জ্বালাওনি। বয়স হয়েছে, এখন একটু শোধরাও। তবে হ্যাঁ, বলতে হবে আদিত্যর বুকের পাটা আছে, তার সাহসকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—হ্যাঁ, এখন তো সব দোষ আমারই। এত কষ্ট করে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালাম, মানুষ করলাম, সেকি আমার ভালোর জন্য। যা করেছি সবই ওর ভবিষ্যৎ ভেবে।

—থাক, অনেক করেছো, অনেক শিখিয়েছো। শুধু শেখাতে পারনি কি করে পাঁচজনকে নিয়ে সংসার করতে হয়। আসলে, তুমি একটি বিকারগ্রস্ত রুগি, চিরকাল একটার পর একটা সংসার ভাঙাভাঙির খেলায় মেতে রয়েছো।

এতদিন ধরে দাপটে সংসার চালিয়ে এসেছেন জয়ন্তী। মেয়ে বা স্বামী কেউই তার কথার উপর কথা বলতে সাহস পায়নি। আজ মেয়ের সামনে সত্যব্রতর বলা কথাগুলি তার অহংবোধে আঘাত করে। চিলচিৎকারে কিছু বলতে যেতেই, আজীবন শান্ত বলে পরিচিত সত্যব্রত স্বভাববিরুদ্ধ রুদ্র মূর্তিতে জয়ন্তীকে থামিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলেন, 'চুপ!

আর একটা কথাও বলবে না। অনেক সহ্য করেছি। আমাকে বাধ্য করবে না এমন কাজ করতে যাতে তোমার সম্মান রাখা না যায়। আমি কালকেই শ্রেয়াকে তার শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।' জয়ন্তীকে আর কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়ে মেয়েকে নিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে যান সত্যব্রত।

ঘটনার আকস্মিকতায় জয়ন্তী থ। বেসামাল। পরাজয়ের মর্মবেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। কলাগাছ যেমন প্রবল ঝড়ের ঝাপটা সামলাতে না পেরে সমূলে উৎপাটিত হয়ে মাটিতে আশ্রয় নেয়, মানসিক অবসাদে আক্রান্ত জয়ন্তীও তেমনি ধপাস করে সোফায় বসে পড়েন। যে মানুষটি ঝগড়া করার সুযোগ পেলে আর কিছু চান না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে গেলেও যার ক্লান্তি আসে না, এই মুহূর্তে বীতকলহ জয়ন্তী নেতিয়ে পড়েন।

বসে বসে কত কথা মনে পড়ে। সেই ছোট্টটি থেকে আজ পর্যন্ত—শ্রেয়ার সব কথা একে একে মনে এসে ভিড় করে। সুখস্মৃতিতে ভরে ওঠে মনটা। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরে ভালোবেসে বিয়ে। সেই মেয়ে কাল চলে যাবে শ্বশুর বাড়ি। কথাটা মনে হতেই জয়ন্তী তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন। তাই তো, অনেক দিন পর মেয়েকে পাঠাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি— তাকে তো তৈরি করে দিতে হবে। এখনো অনেক গোছগাছ করতে হবে ভেবে মনটা খুশিতে ভরে উঠলেও পরক্ষণেই অভিমানে মনটা ছেয়ে যায়। সত্যব্রত তো তাকে একবারও যাওয়ার কথা বললো না। না বলুক। তিনিও যাবেন। তিনি তো মা! না গেলে ভালো দেখায় না। তিনি কারও বলাবলির তোয়াক্কা করেন না। এতসব ভাবতে গিয়ে মনটা ভীষণরকম ভালো লাগায় ভরে ওঠে। তিনি শ্রেয়াকে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরোতে যেতেই কদম ফুলের গন্ধ বাতাস বাহিত হয়ে নাকে এসে লাগে। আগেও এমন হয়েছে। কিন্তু জয়ন্তীর আবদ্ধ চেতনায় তা কোনোদিন এমনভাবে ধরা দেয়নি। তিনি 'আঃ!' বলে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নেন। অনুভব করেন ঘরটাও যেন ক্রমশ ভরে উঠছে কদম ফুলের গন্ধে।

অক্টোপাস

বানে মোড়া বাতাসের গা বেয়ে আকাশ চুঁইয়ে আঁধার নামছে সেনাডাঙার বুকে। জলে জলে বন্যার্ত গোঙানি থম মেরে এসেছে সূর্য ডোবার অনেক আগেই। পলিথিন আর চটের তৈরি তাবুগুলোর ফোঁকর দিয়ে ছিটকে আসা হ্যারিকেন এবং কুপির মৃতপ্রায় আলোগুলো বাইবে ঘন হয়ে জমা আঁধারকে মরণ কামড়ে সাবাড় করতে গিয়ে হা-মুখ অন্ধকারে নিজেরাই অস্তিত্ব হারায়।

সোনাডাঙার সামান্য নাবালে জঙ্গি হানাদারের মতো ধেয়ে আসা, বাঁধ থেকে ছাড়া জল চারদিক ঘিরে ফেলেছে ডাঙার মাটিকে। একটু দূর দিয়ে, অনাচার অবিচারে জর্জরিত, বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা ইছামতী প্রতিকূল পরিবেশে দুকূল ভাসিয়ে ছুটছে আর মানুষের অদূরদর্শিতার মুখে থুথু ছিটিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে যেন বলছে, 'দেখ কেমন লাগে'।

তা দেখছে বৈকি নিরুপায় মানুষগুলি—দেখছে হপ্তা দুয়েক ধরে। বেনো জল আর উত্তাল নদীর মাঝে বিশাল বাঁশবন, কলাবাগান, বসত— জলে থেঁতলে ডুবো জ্বরে কাঁপে থরথর; মাঝে মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ভাসতে থাকে গৃহপালিত জীব জন্তুর পচাগলা মৃতদেহ। অন্ধকার বাঁশবনে পেঁচার ডাক শুনে তাঁবুর মানুষগুলি যখন অনাগত অমঙ্গল আশঙ্কায় দুরু দুরু বুকে প্রহর গোনে, তখন অবিরাম বাতাসের দোলায় বাঁশ পাতার ওপরে অগুনতি জোনাকি দ্বিগুণ উৎসাহে পিদিম জ্বেলে নরকের আরতি করে। মাছের চোখ নিয়ে জলবন্দি বুভুক্ষু মানুষগুলি সকাল থেকে সন্ধ্যে, একবার আকাশ, একবার জলে-ডোবা প্রান্তরে নজর রাখে যদি সাহায্য আসে। শেষে নিরাশ হয়ে পোড়া কপালের দোষ দেয়। আর যারা একটু এগিয়ে ভাবতে ভালোবাসে তারা মনে করে ইছামতীর যদি সারা বছর অবধি গতি থাকত, এখানে সেখানে বাঁধ দিয়ে ভেড়ি তৈরি না হত তবে হয়তো সোনাডাঙার বন্যার্ত মানুষগুলিকে পোহাতে হতো না এতটা দুর্ভোগ।

অনেকক্ষণ থেকেই পাশের তাঁবুতে গোঙানির শব্দ উঠছে। গোঙায় জামালউদ্দিন। নাগাড়ে ঘন্টা তিনেক বমি করছে। পেটে যা ছিল বেরিয়ে গিয়ে এখন পিত্তি উঠছে। যখন পিত্তিও আর নেই তখন শুধু ওয়াক পাড়ে। ওয়াকের তাড়সে জোয়ান তাগড়া শরীরটা পঞ্চমীর চাঁদের মতো বাঁক খায়। খইভাজা উত্তাপে শরীর পোড়ে। তেলবিহীন প্রায় নিভে আসা কুপির আলোয় তাঁবুর মধ্যে বিভিন্ন পরিবারের অনেকগুলি মানুষের সার সার ছায়া কাঁপে তিরতিরানি শিখার সাথে। বমির গন্ধে নাড়ি উল্টে এলেও বাইরে বেরিয়ে আসার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছে সারাদিন ধরে 'খিদেয় মরি গেলাম, মরি গেলাম' করা মানুষগুলি।

গোঙাতে গোঙাতেই একসময় জামাল মেয়ের উদ্দেশে হাঁকে, 'হারে সাবিনা, হালিমরা যে সদরে গিইলো তা কিচু আনিছে? চাল দেছে?

—দেয়নি। দেবে বলেছে।

—কখুন দেবে?

—দেবানে তো বলিছে, কখুন দেবে তা আমি কি হাত গুনে বুলব? দায় পড়লি নিজি যায়ে তালাশ কর। বন্যাবিধ্বস্ত আর পাঁচজনের মতোই উদরের জ্বালা ভোগ করা, দিশাহারা কিশোরীর গলায় ঝাঁঝ।

এত কথা শোনা বা বোঝার মতো মনের অবস্থা নেই জামালের। খিদেতে কাবু নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত। তাই বিপন্ন সুরে, 'ই খুদা, মোর যে খিদেয় জান যায়। মুই যে আর সইতে পারি না।'

খোদায় ভরসা হারিয়ে, যেন পারলে মেয়েই পারবে এমন ভাবনায় জারিত হয়ে জামাল কাতরাতে কাতরাতে বলে, 'ই শালো খুদা বিটা কানা। কিচু দেবে না বুজিচিস। ও সাবিনা, তুই মোরে দুগোন ভাত এনি দে, মরি তো খায়ে মরি।' এবং খানিক পরে ভাত জোগানোর কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝে গিয়ে নিস্তেজ গলায় বলে, 'না পারলি, মোরে পোকা মারার তেল এনি দে, খায়ে বাঁচি'।

না বুঝে মুখ ঝামটা মেরে অনুতাপে পুড়ছিল সাবিনা। বাপের কথায় হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে ভেজা গলায় বলে, 'উরাম কতা বলতি নাই বাপ, গুনাহ্ হয়। মরব ক্যানে? মুল্লাজি কয়, 'জান বাঁচান ফরজ—।' এই কথাটা ভাবতে গিয়েই তার শিরদাঁড়া বেয়ে মৃত্যুশীতল স্রোত নামে। অসুস্থ বাপকে সাহস জোগাতে, আসলে নিজেকেই শক্ত রাখতে বলে, 'খুদা মেহেরবান, তার উপরি ভরসা রাখ বাপ—তালি আমরা বাঁচবানে, সক্কলাই বাঁচবানে।'

সাবিনার চোখ থেকে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়া জল আধো অন্ধকারে জামাল ঠাহর করতে পারে না। অনবরত বমিতে গলা শুকিয়ে এলে তেষ্টা মেটাতে রুক্ষস্বরে বলে, 'ও সাবিনা, তুর মা মাগিটা গেল কুয়ানে? এক গিলাস পানি দিতি বল দিনি।'

এতক্ষণ নীরবে পরিচর্যারিতা, শিয়রে বসা সাবিনার মা ঘোমটার আড়াল সরিয়ে শিরা ওঠা কাঁপা কাঁপা হাতে জল এগিয়ে দেয়। খালি পেটে জল, পলকে পুরো জলটাই হড়হড়িয়ে উগড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে জামাল।

বেশ কিছুক্ষণ নজর করে সাবিনা যখন দেখে যে, জামাল গোঙানোর ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে তখন চুপিসারে বেরিয়ে তাঁবুর পেছনে এসে দাঁড়ায়। সেখানে আঁধারে গা মিশিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল আরও একজন। সাবিনা সামনে যেতে ফিসফিসিয়ে বলে, 'কি রে এত দেরি করলি যে, ঘুমিয়ে গিইলি নাকি?'

সাবিনা উত্তর দেয় না।

প্রশ্নকর্ত্রী অধৈর্য হয়ে বলে, 'কিরে কিচু বলবি তো না কি'।

মোহগ্রস্তের মতো সাবিনা বিড়বিড় আওড়ায়, 'সবিতা, আমাগের সব্বোনাশ হচ্ছে কি না একবার ভাব। বুকে বল পেচিস কি না বল?'

এমন ধরনের কথায় সবিতা কুঁকড়ে যায়। গঞ্জে যাতায়াত করা শেফালি মাসির কাছে খবরটা নিয়ে—একা যেতে সাহসে কুলোয়নি বলে প্রস্তাবটা সেই দিয়েছিল সাবিনাকে। এখন সে কথা ভাবতে গিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কি বলা উচিত বুঝতে না পেরে, উল্টে সাবিনার কাঁধেই দায়টা চাপিয়ে বলে, 'তু বাঁচতি চাস কি না বল দিনি, চাস তো? চাস যদি তাত্তাড়ি চল।'

অনেকক্ষণ থেকে পেটটা মোচড়াচ্ছে খিদেতে। সেই সকালবেলা নামমাত্র খিচুড়ি পেয়েছিল ভাগে- বাকিটা আকণ্ঠ জল টেনে ভরিয়েছিল। তো সে আর কতক্ষণ। পাচন রস এখন ওর নাড়িভুঁড়িগুলিকেই ছিঁড়ে খেতে চায়। সবিতার কথায় সাহস ফিরে এলেও সন্দেহের গলায় বলে, 'উয়ারা চাল দেবে নে তো?'

—হ।

—অষুধ? বাপটা বড় ক্যাতরে পড়েছে সাবিনা।

সাবিনার বারবার জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হলেও চোখের ওপর সাবিনার বাপজানকে কাতরাতে শুনেছে সবিতা। তাছাড়া দুজনেরই প্রয়োজন এক এ কথা ভেবে মনটা নরম হয় এবং অভিভাবকসুলভ কর্তৃত্বে যেন অনুজাকে ভরসা দিচ্ছে এমন কথা বলে—'হ্যাঁরে বাবা দেবেনে। এখুন চল দিনি।'

আশান্বিত সাবিনা বড় বড় চোখে বলে, 'ই বাপ, চাল দেবেনে! অষুধও দেবেনে! উরি কপাল, তালি তো আমরা বাঁচবানে। বলতে বলতে ছল ছল চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলে 'খুদা পাপ লিসনি যেন। দ্যাহটো কেনে লষ্ট হচ্ছে একবার চোখে দ্যাখা করিস।'

সময় বয়ে যায়। সবিতা তাড়া দেয়, 'তুই যাবি লিকিন বল, নালে মুই আগোলাম।'

তল পেটটায় পাঞ্জা বোলাতে বোলাতে সাবিনা শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় উত্তর দেয়, 'যাবোই তো। এট্টুস সবুর কর দিকিন, বাপটোকে দ্যাখে আসি।'

তাঁবুতে ঢুকে সাবিনা দেখে জামাল জ্ঞান হারিয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে, পাশে বসা মা নিঃশব্দে কাঁদছে। সহ্য করতে না পেরে দৌড়ে বাইরে আসে। বাপের খোদোক্তি, মায়ের কান্না—নতুন করে যেন তাকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। বহু কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দুজনে হাত ধরাধরি করে অন্ধকারে মিশে যায়।

তে-রাত্তিরও পার হয়নি, খিদের জ্বালা সইতে না পেরে পাকুড় গাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে সবিতার বাপ। ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু দৃশ্যটাই সবিতার চোখে ভাসে। দূর থেকে তাদের তাঁবুটা নজরে আসে। খোলা দরজায়, হ্যারিকেনের সামনে এলো চুল, সাদা থানে সবিতার মা বসে রয়েছে। মনে হচ্ছে মাঠ-ঘাট মাড়ানো কোনো বাউলা বাতাস যেন খেলাচ্ছলে বলে গেছে, 'ওয়ান, টু, স্ট্যাচু...।' যেতে যেতে সবিতা ফোঁপায়।

এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবুর বাঁধন। ওরা সন্তর্পণে পা ফেলে এগোয়। খিদেয়

নেতিয়ে পড়া শরীরটা এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে ওঠে সবিতার একটি মাত্র আশ্বাস বাক্যে, 'ওরা চাল দেবেনে'। সাবিনা সেই মাহেন্দ্রক্ষণটুকুর জন্য আকুল অপেক্ষা করে। দ্রুত পৌঁছানোর জন্য পা চালাতে গিয়ে কাদামাটিতে হড়কায়। সামাল দিতে সবিতাকে খামচে ধরতে ভারসাম্য হারিয়ে দুজনেই গড়িয়ে পড়ে। পিত্তিজ্বলা রাগ নিয়ে সবিতা অশ্রাব্য গাল দিয়ে বলে, '...হারামজাদি মজা পেইচো?'

ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকায় সাবিনা। অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও স্বরে বোঝা যায় অভিমানের আভাস। ধীরে অথচ স্পষ্ট স্বরে কেটে কেটে বলে, 'মজা হবেনে? উয়ারা তো সব দেবেনে বুলচিস।'

—চুপ কর দিনি বেহায়া কুয়ানের। তুর কি চেতবোধ নাই?

দূর থেকে একটা জটলার আওয়াজ ভেসে আসে। পায়ে পায়ে এগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওরা নিজেদের আড়াল করে উৎকর্ণ হয়। জমায়েত বসেছে করিম মোড়লের তাঁবুর সামনে—আলোচ্য বিষয় সরকারি সাহায্য। আজ সকালেই গৌরাঙ্গ আর আফজল গিয়েছিল সদরে। সেখানে সরকারি ক্যাম্প বসেছে। যা কিছু সাহায্য বন্যার্থীদের জন্য, আসবে ওখানে থেকেই। আসবে, কিন্তু এগার দিন হয়ে গেল কিছুই আসেনি। আসেনি রাজনৈতিক দলাদলির কারণে, বখরার তারতম্যের কারণে। সব দলই তার সমর্থকদের আগে সুবিধাটা পাইয়ে দিতে চায় বলে সামগ্রী বন্টনে জট পাকিয়েছে। মাঝখান থেকে ভোগান্তি বেড়েছে বলির পাঁঠা, সোনাডাঙার মানুষগুলির।

জমায়েতেও বিভিন্ন দলের সমর্থক। পক্ষে-বিপক্ষে চাপান উতোর চলতে থাকায় সমস্যার সমাধান তো দূরস্থান কথা কাটাকাটি চরমে ওঠে এবং বিরক্ত হয়ে যখন যে যার তাঁবুতে ঢুকে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় তখন ক্লান্ত মানুষগুলিকে আধো অন্ধকারে বানের পচা জলে ঘেয়ো কলাগাছের মতো মনে হয়। আর তখুনি হাঁপাতে হাঁপাতে মকবুল আর্জি নিয়ে এসে দাঁড়ায় মোড়লের কাছে—বিকেলে তার বউ মরেছে, এখনও কবরের ব্যবস্থা করা যায়নি।

সোনাডাঙায় এখন মানুষের এক বগ্‌গা কাতরানি আর আর্তনাদ ছাড়া অন্য বোল নেই। রোগে ভুগে, অখাদ্য খেয়ে মরছেও হরদম। এরই মধ্যে দশ-বারোটা কবর খোঁড়া হয়ে গেছে সংকীর্ণ ডাঙাটুকুতে। হরেনের ছেলে, ছিদামের মায়ের মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ইছামতীর জলে—দাহ করার সরঞ্জাম বা যুত মতো জমি নেই। চোখের জল আর বানের জলের মিশেলে মড়াগুলি ভাসতে ভাসতে চলে গেছে কল্পিত স্বর্গের উদ্দেশে।

মকবুলকে দেখে ভাঙা জমায়েত জোড়া লাগে। নিভিয়ে দেওয়া মোমবাতি আবার জ্বেলে যে যার আসন নেয়। কিন্তু উপায়? আসলে এই ডাঙাটুকু হিন্দুদের দেবস্থান। এক কালে মন্দির ছিল, তার নাবালে হিন্দুদের গ্রাম—তারও পরে মুসলমান পাড়া। সব মিলিয়ে ছিল দেড়-দুশো ঘর মানুষের বাস। কিন্তু প্রায় বছর তিরিশ আগে যখন এমনতর আরেকটা ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তখন অন্যান্য গ্রামের মতো এখানেও মড়ক লেগেছিল। গ্রাম সাফ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। এখন মন্দিরও নেই, বসতও কেউ করে না। শুধু, ভেরি আর

যত্রতত্র বাঁধ দেওয়ার ফলে ইছামতী যখন স্বাভাবিক গতি হারিয়ে নিয়ম করে প্রতি বর্ষায় তাণ্ডব চালায় তখনই কাঁঠালবেড়ের মানুষজন সব ভেদাভেদ ভুলে ঠাঁই নেয় এখানে। জল নেমে গেলে তারাও আবার ফিরে যায় গ্রামে। কিন্তু জলে জলে এবার যে রকম উতোল লেগেছে কখন কি হয় বলা মুশকিল। তাছাড়া ইছামতী এবার পাড় ভেঙে ভেঙে যেভাবে গ্রামের দখল নিচ্ছে তাতে এই ডাঙাটুকুর ভরসাই বা কতটুকু, খোদায় মালুম।

এতসব ভাবতে গিয়ে করিম মোড়লের কপালে বিনবিন ঘাম জমে। যেহেতু সে পঞ্চায়েত প্রধান—মাথা ব্যথাও তারই। ডাঙার নাবালে এখন কোমর জল। ওটা হয়তো আগামীকাল বুক ছাড়াবে। ফলে মকবুলের বউয়ের জন্য যে সাড়ে তিন হাত জমি দরকার—তারও আকাল। নিরুপায় মোড়ল পরিস্থিতি সামাল দিতে ভয়ে ভয়ে কথা পাড়ে, 'আমি বলি কি জমিন যখন নাই, তখন মকবুলের বৌটোকে না হয় লদীতেই কবর দুয়া যাক।'

কোন বিকেলে মরেছে, এখনও কবর দেওয়া হয়নি—এই রাগে গুমরে মরছিল মকবুল। করিমের কথায় ফুঁসে ওঠে, 'ইটা ক্যামুন কতা হল। গেরামের আর যারা মরিল তারা সক্কলাই কবরের মাটি পেইল, আর আমার বউ কি বানের পানিতে ভেসি এয়েছে যে মাটি পাবে না?'

জমায়েত একবার ভেঙে শুধু মকবুলের জন্যই আবার বসেছে। অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলি এমনিতেই বিরক্ত, মকবুলের বলার ধরনে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তার কথার খেই ধরে টান মারে হাসেম। সেও পঞ্চায়েত সমিতির লোক। বলে, 'মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিসনি তো মকবুল। করিমদা অল্যায্য কি বলিল, তু যে এত চিল্লাচ্ছিস!'

যত রাগ গিয়ে পড়ে হাসেমের ওপর। চড়া গলায় খেঁকিয়ে ওঠে মকবুল, 'তুয়ার বউ মরলি তু কি করতি রে শালো?'

একটা অশ্রাব্য বুলি ঠোঁটের ডগায় এলেও নিজেকে সামলে হাসেম চুপ থাকে। সদ্য ছেলে হারানো শোকে মুহ্যমান হরেন বলে, 'রাগ করিসনি মকবুল ভাই, কবর দুয়া নিয়ে কথা। জমিন যখন নাই, তা সি লদীতেই হোক আর মাটিতিই—।'

মকবুলের চোখে ভাসে হরেনের মরা ছেলেকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার দৃশ্য। সে শুনেছে হিন্দু শাস্ত্রে জলে মরা ভাসানোর রীতি আছে। এর ভেতর সে অন্য গন্ধ পায়। চেঁচিয়ে বলে, 'তুমাগের মতলব বুঝিচি। আমি কি চদু যে, তোমরা যা বলবা তাই মানতি হবে? সাফ কথা বলি রাখলাম, আমার বউরি লদীতি কবর দুবো না।'

রোখ চাপে হাসেমের। উদ্ধত স্বরে বলে, 'লদীতে কবর দিবি না মানে? তুই দিবি, তুর বাপও দেবে।' সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলে, 'শালোর ত্যাল হইছে, চল দিকি উয়ারে সুদ্দু কবর দিইগা'।

পরিণতি দেখার আশায় না থেকে সবিতা আর সাবিনা আপন পথ দেখে। নিরুপায় অথচ দায়নিষ্ঠ দুই কিশোরীর সামনে শুধু অগাধ রাত আর নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার। এই মুহূর্তে ওদের চোখে আকাশটাও বোধহয় অদৃশ্য। নজর সামনের দিকে। পঞ্চায়েত অফিসের ডাঙা জমিটুকু।

বাস রাস্তার দু-পাশে গ্রাম—ঘরগুলো সব জলে ডোবা। গাছগুলি কোনো রকমে মাথা জাগিয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েতের ডাঙাটুকু ছাড়া, শুধু জল আর জল—জনপ্রাণী নেই আর কোথাও।

দুজনে জল ভেঙে একটু একটু করে এগোয়। পায়ের নিচে, জলের আড়ালে অসমান এবড়ো খেবড়ো জমি। নিশানা একটু ভুল হলেই জলের আবর্তে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আকৈশোর ইছামতীর বুকে লালিত দুই বালিকার কাছে নদী এখন ভয়ঙ্করী—মৃত্যুর দূত। তরাসে বারেকের জন্য সাবিনার মনে হয়, না এলেই হতো।

সোনাডাঙার দিক থেকে একটা কান্নার রোল ভেসে আসতেই সবিতা সাবিনার হাতটি শক্ত করে ধরে ভয়ার্ত গলায় বলে, 'আবার কেউ মরিল বুধায়।'

ভয় সাবিনাকেও পেয়ে বসে। ভয় তার অসুস্থ বাপকে নিয়ে। তবুও, শুধু সাহস সঞ্চয় করতে, নিজেকে শক্ত রাখতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলে, 'উসব বাদ দে দিদি। চল এখুন।'

অর্জুন, ঘোড়ানিম আর অশ্বত্থ গাছের ছায়ার আড়ালে জমাট অন্ধকারে পঞ্চায়েত অফিস ভৌতিক নির্জনতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পেছনে জংলায় ছাওয়া আদ্যিকালের কোনো স্থাপত্যের পোড়ো ভিটে। তারও পেছনে ইছামতী। দূর থেকে জলের শব্দ শোনা যায়।

এতদূর জল ঠেলে ঠেলে ডাঙায় উঠে সাবিনা আর সবিতা সবে জংলাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি পাকা কাঁঠালের গন্ধে যেমন মাছি ভনভনিয়ে আসে তেমনি পোড়ো ভিটের পেট থেকে বেরিয়ে আসে কতগুলি মানুষের অন্ধকার অবয়ব। একজন ফিসফিসিয়ে বলে, 'এত দেরি?'

এতগুলি জীব দেখে সাবিনার গলা শুকিয়ে আসে। সবিতা কোনো রকমে উচ্চারণ করে, 'হ'।

—মাত্র দুজন এলি? প্রশ্নকর্তার গলায় হতাশা।

ওরা চুপ।

অন্ধকার আদলগুলির মধ্যে চাপা গুঞ্জন—কে আগে কে পরে এই নিয়ে বচসা, হাতাহাতি। শেষে, সমঝোতায় এসে সমান ভাগে ভাগ হয়ে সাবিনা আর সবিতাকে টেনে নিয়ে যায় পোড়ো ভিটের অভ্যন্তরস্থ দুই কোণে।

থরথর কেঁপে ওঠে সাবিনা। তার খিদে, ভয় এবং কান্না একযোগে দলা পাকিয়ে এলে চোখ ফেটে জল গড়ায়। অন্ধকারের খাবলা থেকে কোনোমতে মুখটাকে বাঁচিয়ে কান্নাভেজা গলায় বলে, 'তুমরা চাল দেবানে তো?'

—কালকেরে অফিসে আসিস দেবানে।

ঝটিতি বুকে চেপে থাকা অন্ধকারটাকে আসুরিক শক্তিতে ঠেলে দিয়ে সাবিনা বলে ওঠে, 'তালি রাত্তিরে মোরা খাবো কি?'

—হবেনে, হবেনে। বেবোস্থা করে দেবানে।

সাবিনার কচি হাড়গুলো যেন গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। বুক হাঁসফাঁস করে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে গেলে লোমশ হাত সজোরে মুখ চেপে ধরে বুকের ওপর আরো গাঢ় হয়ে আসে।

এত কষ্টের মধ্যেও সাবিনা উপলব্ধি করে মানুষের আদলে গড়া অন্ধকারের এই জীবগুলির অন্তরে ছিঁটেফোঁটাও দয়া-মায়া নেই—এরা স্নেহও বোঝে না, মমতাও বোঝে না, শুধু বোঝে আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অপকৌশল—মানুষের তীব্র অভাব আর হাহাকারের সুযোগে খুঁজে বেড়ায় মাংসল শরীর। নিরুপায় সাবিনা একসময় দেহটাকে আরো সহজ করে সঁপে দেয় হানাদারের হাতে।

এই সময় মুল্লাজির বলা কথাগুলি মনে পড়ে—জান বাঁচান ফরজ অর্থাৎ কিনা পুণ্যের কাজ। এখানে আসার সময় সাবিনা ভাবতেও পারেনি জান বাঁচাতে গিয়ে তাকে এমনভাবে মরতে হবে। বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে যখন পলকের জন্য অনুভব করে তার বুকের ভার হালকা হয়ে গেছে, তক্ষুণি নতুন করে আছড়ে পড়ে আরো অন্ধকার।

অবসাদে অবশ হয়ে আসে শরীর। থিরথির কাঁপতে কাঁপতে বন্যাবিধ্বস্ত মাটির বাড়ির মতোই ঢলে পড়ার আগে পর্যন্তও সাবিনা মানুষের উপর বিশ্বাসে স্থির থেকে স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করে, 'উয়ারা চাল দেবেনে, আমরা বাঁচবানে, আল্লা, আমার বাঁচবানে...।'

নিগড়

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংহিতার মেজাজও চড়ছিল চড়চড় করে । কত আর পারা যায়! সেই কোন সকালে বেরিয়েছে বাপ। এগারোটা বাজতে চলল, এখনও ফেরার নাম নেই। আষাঢ়ের বেলা, ধাপ ধাপ গরমও বাড়ছে। বেলাবেলি গিয়ে যদি না পৌঁছনো যায় তবে জুতমতো বসার জায়গা পাওয়া যাবে না। আর যদি জুতমতো বসার জায়গাই না পাওয়া যায় তবে রথের মেলায় বিকিকিনিরও দফারফা। অথচ এখনও বাপের দেখা নেই। অশান্ত মনে ঘরবার করতে থাকে সংহিতা।

ভজন জ্যাঠার দোকান থেকে মালপত্র আনতে এত সময় লাগার কথা নয়। যদি খুব ভিড়ও থাকে, যেতে আসতে একঘন্টা। মালপত্র গুছিয়ে নিতে আরো বেশি হলে আধ ঘন্টা। মানুষটা তবে গেল কোথায়? কি কি হতে পারে, কোথায় কোথায় যেতে পারে সম্ভাব্য স্থানগুলি মনে মনে খতিয়ে দেখতে গিয়েই আপাদমস্তক জ্বলে যায় সংহিতার। আর দেখতে হবে না। সংহিতা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, এত দেরি মানে নিশ্চয়ই কোনো সাকরেদের পাল্লায় পড়ে মদের ঠেকে গিয়ে বসে পড়েছে। আর ওখানে যাওয়া মানে জিনিসপত্র আনা তো দূরের কথা, হাতের অবশিষ্ট সম্বলটুকুও শেষ করে আসবে। আগেও দু'একবার এমন হয়েছে।

রাগ বশ মানে না। বর্হিপ্রকাশ ঘটে চিল চিৎকারে, 'আসুক আজ ঘরে, বাপ বলে কাউকে খাতির করব না। ঝেটিয়ে যদি না বিদেয় করি তো...!' কঠিন কিছু একটা বলতে গিয়েও সামলে নেয়।

বারো বছরের ভোলা, সংহিতার অনুজ, দিদির খিদমদগার। এতক্ষণ দিদির চোটপাটে কুঁকড়ে ছিল। কি মনে হতে ভয়ে ভয়ে বলে, 'দিদি, আমি একবার দেখে আসব? এক ছুট্টে যাব আর আসব।'

সংহিতার রাগ তখনো কমেনি। সমান তেজে বলে, 'না, কাউকে যেতে হবে না। যার যখন খুশি আসুক, যখন খুশি যাক। আমি আর দেখতে যাব না। এবার থেকে চুপ করে ঘরে বসে থাকব। মেলায় দোকান দেব না। খাওয়া জোটে কোথা থেকে দেখি।'

অবশ্য খুঁজতে কাউকে যেতে হয় না। সংহিতার গজরানি শেষ হতে না হতেই দূর থেকে নজরে আসে রোদ আড়াল করতে গামছা মাথায় অনাদি টলতে টলতে বাড়ির দিকে আসছে। টলতে টলতেই বারান্দায় গিয়ে বসে।

বাপ মেয়ে মুখোমুখি। অনাদি মাথা নিচু করে বসে। মেয়ের মুখের দিকে

তাকানোর সাহসটুকু হারিয়ে ফেলেছে। অপরাধবোধ তাকে যম-তাড়ানো তাড়িয়ে চলেছে।

বাপের খালি হাত লক্ষ্য করে, অতি কষ্টে উদ্গত রাগ চেপে সংহিতা জিগ্যেস করে, 'তেল, বেসন এসব কিছু আনোনি?'

—ভজা তো দোকান খোলেনি, আমি কি করব? মিনমিন করে উত্তর দেয় অনাদি।

ঝাঁঝিয়ে ওঠে সংহিতা! 'দোকান খোলেনি? বললেই হলো। ঠিক আছে খোলেনি তো খোলেনি, আরো তো দোকান ছিল, সেখান থেকে আনতে কে বারণ করেছিল।

অনাদি চুপ। উত্তর দেওয়ার তার কিছু নেই। সে যে মিথ্যে বলেছে এবং সেটা ধরে ফেলবে মেয়ে এটা জানাই ছিল। তবুও খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টায় কিছু বলতে হয় তাই বলা।

অনাদির চুপ করে থাকা আরো অধৈর্য্য করে তোলে সংহিতাকে। সে লঘুগুরু তফাত না রেখে চেঁচায়, 'অন্য দোকান থেকে আনবে কি করে? সব পয়সা তো মালের পেছনে খরচা করে বসে আছে। লজ্জা করে না, একটা ফুটো পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই যার, তার শখ আসে কোত্থেকে মেয়ের রোজগারের পয়সায় মাল খেতে? ঐ মুখ রাস্তার লোককে না দেখিয়ে শাড়ি পড়ে ঘরে বসে থাকো।'

অনাদি যতই নেশা করে আসুক না কেন, সংহিতার কথাগুলি এতটাই শাণিত যে এই অবস্থাতেও তার আত্মসম্মানে লাগে। টালমাটাল অবস্থাতেই সটান উঠে দাঁড়িয়ে মেয়ের কথার জবাবে বলে, 'তাই তো! রোজগার যদি নাই কবতাম তাহলে এত বড় হলি কার খেয়ে? এখন তো বলবিই।' রাগ সামলাতে না পেরে ঘরে ঢুকে একটার পর একটা তৈজসপত্র টেনে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে আর বলে, 'এটা কার রোজগারের টাকায়? এটা কার রোজগারের......।' বেশিক্ষণ পারে না। নেশার ঘোরে মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভাইবোন বিহ্বল। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। বিস্ফারিত চোখে ভোলা বলে, 'দিদি, এখন কি হবে?'

বাস্তববাদী সংহিতা এখন অনেক শান্ত। ভোলাকে বলে, 'ভাই, মনে হয় দোকান এখনও বন্ধ হয়নি। তুই পারবি না জিনিষগুলি আনতে?'

সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে ভোলা।

ভাইকে দোকানে পাঠিয়ে বাপের পরিচর্যায় বসে সংহিতা। আদ্দেক উঠোনে আদ্দেক বারান্দায় ঝুলতে থাকা অনাদির শরীরটাকে কোনোমতে বারান্দায় তুলে চিত করে শুইয়ে দেয়। শক্তিতে না কুলালেও টেনেহিঁচড়ে করতে হয়। মায়ের মৃত্যুর পর অষ্টাদশী সংহিতার সংসারের অভিজ্ঞতায় একলাফে বয়সটা যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। সব কাজই এখন সে ঠাণ্ডা মাথায় গুছিয়ে করতে পারে। এই মুহূর্তে তার মনে হয় সত্যিই সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এতটা উগ্র হওয়া ঠিক হয়নি। আসলে মায়ের না থাকা এবং উপার্জনহীন সংসারের বর্তমান ভাবনাটা তাকেই ভাবতে হয় বলে থেকে থেকে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। আর এটাও তো সত্যি, দিন তো আর এমন ছিল না। জন্মাবধি সে একটি সুখী

সংসারই দেখে এসেছে। সে ভালো স্কুলে পড়ত। ভাইকেও ইংলিশ মিডিয়ামে দেওয়া হয়েছিল। অভাব কাকে বলে ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কোনোদিনই সে বুঝতে পারেনি। অথবা তাদের বুঝতে দেওয়া হয়নি। তবে, সংসারে অভাব না থাকলেও যেটা কখনও কখনও বাবাকে বিমনা করে দিত, সেটা হল মায়ের অসুখ। শুনেছিল রোগটা নাকি খুব কঠিন। পরে জেনেছিল মায়ের ক্যান্সার।

আজ চার বছর কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু অবক্ষয় শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। অনাদি বেকার। অনাদির মতো আরো শয়ে শয়ে মানুষ বেকার। অনেকে স্বেচ্ছা অবসর নিলেও বেশিবভাগ শ্রমিককে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনাদির মতো যারা ঠিকা শ্রমিক তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। কোম্পানি ঠিকা শ্রমিকদের কোনো দায়িত্ব নিতে রাজী হয়নি। একদিন হাজার শ্রমিকের শ্রমে যে কারখানা চলত, রমরমা শিল্পনগরী আজ বেকাবত্বের আগুনে শ্মশানপুরী। কারখানাকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, কাবখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই অর্থনীতি আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। যাদের উপায় ছিল তাবা অন্যত্র চলে গেছে। যাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তারা অসহায় ভারবাহী বলদের মতো নিত্যদিন সংসারের গুঁতো খেয়ে এখানেই পড়ে আছে। উপার্জনের জন্য শ্রম দেবার ইচ্ছে থাকলেও, পরিবেশ প্রতিকূল। অনাদি নিজেও ভারবাহী বলদের একজন। তাব অন্যত্র যাওয়ার জায়গা নেই। এখানেই পড়ে আছে আশায়, যদি বিড়ালেব ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, যদি কোনোদিন কারখানা খোলে।

সব খবরই সংহিতা রাখে। নিজের গরজেই বাখতে হয়। খানিক আগের কৃতকর্মের জন্য সে মরমে মরে যায়। বাবার প্রতি মমতায় মনটা ভরে ওঠে। পুরনো কথা মনে আসতেই চোখ ছলছল করে।

অনাদির পরনের প্যান্টের জায়গায় জায়গায় তাপ্পি। সংহিতাই রিফু করে দিয়েছে। সংহিতার মনে হয় তাপ্পি কি শুধু প্যান্টে? সংসারেও তো তাপ্পি দিতে চেয়েছিল অনাদি। কিন্তু চাইলেই তো সব হয় না।

মুখের কাছটায় মাছি ভনভন করে। বমি করেছে অনাদি। দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে জায়গাটা। সংহিতা বালতির জলে গামছা চুবিয়ে মুখ মোছাতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। আবার পুরানো কথা মনে হতেই বুক টনটনায়।

বেকারত্বের জ্বালা কোনোমতে সামলে চললেও মার মৃত্যুটাই কার্যত বাবাকে শেষ করে দিয়ে গেছে। অনাদি মদ খাওয়া শুরু করেছে সুমনার স্মৃতি ভুলে থাকার জন্য। কেন না সে স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ি করে। কিন্তু সকলেই জানতো, যে কালান্তক রোগে আক্রান্ত ছিল সুমনা, মৃত্যু ছিল অবধারিত। দুদিন আগে বা পরে। কোনো চিকিৎসাই সুমনাকে ধরে রাখতে পারতো না।

সুমনা নিজে তা জানতো না এমন নয়। আর জানতো বলেই স্ত্রীর চিকিৎসার পাহাড়প্রমাণ খরচ জোগাড় করতে না পারার অক্ষমতা, অনাদিকে কুরে কুরে খাওয়ার

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ, আড়ালে স্বামীর চোখের জল ফেলা ইত্যাদি থেকে অনাদিকে রেহাই দিতে একদিন সুমনা গলায় দড়ি দিল।

মেলা বসেছে কারখানার সামনের মাঠে। আগে অফিসটাইমে এই মাঠে অফিসারদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো। এখন নিরুপদ্রবে গরু-মোষ চরে। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে একটি ছাতিম গাছের নিচে সংহিতা দোকান পেতেছে। তোলা উনুনে তেলেভাজার দোকান। এতে সংহিতা অভ্যস্ত। বাবা ছাঁটাই হওয়ার পর থেকে সংসার চালাতে প্রতিদিন বিকেলে রাস্তার ধারে তাকে তেলেভাজা নিয়ে বসতে হয়। একা হাতে সামলায় সংহিতা। ভোলা যত না দিদিকে সাহায্য করে, তার চেয়ে বেশি হা করে তাকিয়ে থাকে দেড়তলা সমান উঁচু বর্ণময় রথের দিকে।

মাঠের গা ঘেঁষে কোম্পানির তৈরি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চটি আজ পরিত্যক্ত। পরিচর্যার অভাবে লোহার দরজায় জং। পাশে বড় বড় ঘাসের জঙ্গল। একটু দূরে টালির চালে ছাওয়া নিবারণের ভাতের হোটেল। কারখানা চালু থাকাকালীন রমরম করে চলত— টিফিনের সময় বেশিরভাগ শ্রমিকই হোটেলে ভাত খেতে আসতো। এখন পরিত্যক্ত, জরাজীর্ণ। অন্যদিন যেখানে নির্জন দুপুরে রোদের হাত থেকে রেহাই পেতে সবৎসা ছাগকূল অলস বিশ্রামে সময় কাটায়, আজ সেখানে বসেছে জুয়ার আসর। চলছে ইস্‌কাপন-রুইতনের খেলা।

হাঁড়িতে রাখা জলে বেসনমাখা হাত ধুয়ে ঝাঝরি দিয়ে কড়াইয়ের তেলে সাঁতরানো চপগুলিকে একটার পর একটা ওলটাতে ওলটাতে অন্য হাতে ওড়নার প্রান্ত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে সংহিতা। কাজে ব্যস্ত থাকলেও থেকে থেকে তার চোখ কাকে যেন খোঁজে।

বেশিক্ষণ নয়, বছর বাইশের সুভাষ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সংহিতার সামনে দাঁড়িয়ে সিনেমার নায়কের কায়দায় বলে, 'আমি কি ম্যাডামকে সাহায্য করতে পারি?'

চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়ে গাঢ় গলায় সংহিতা বলে, 'ঢঙ! করলেই তো হয়, কে বারণ করেছে।'

সুভাষ ভোলারও পূর্ব পরিচিত। সে হালে পানি পায়। 'সুভাষদা একটু বসো তো' বলেই উধাও। তার তখন মন ছুটেছে রথের সামনে দর্শনার্থীদের ছুঁড়ে দেওয়া চিনি-কলা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

এবার সংহিতা আরো সহজ হয়ে অনুযোগের সুরে সুভাষকে বলে, 'এত দেরি করলে যে?'

—আর বলো না, জ্যামে বাস আটকে পড়েছিল। তবে আজ আর বাস নিয়ে ফিরব না। ডিউটি অন্য লোককে দিয়ে এসেছি।

সংহিতা খুশি হয় এই খবরে। বেশ খানিকটা সময় দুজনে একসঙ্গে কাটাতে পারবে ভেবে। সংসারের নানান চাপে, ইচ্ছে থাকলেও যা অন্য সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সুভাষ মিনিবাস ড্রাইভার। সংহিতার সঙ্গে পরিচয় যখন সংহিতা বাসে স্কুলে যাতায়াত করত তখন থেকে। স্কুল ছেড়ে দিলেও সম্পর্ক রয়ে গেছে। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। চার বছর। ইচ্ছে একসঙ্গে ঘর বাঁধার। সে জিগ্যেস করে, 'অনাদিকাকা কেমন আছে? মেলায় আসেনি?'

এই প্রশ্নে সংহিতা বিব্রত বোধ করলেও সকালের ঘটনার কথা গোপন করে উত্তর দেয়, 'ভালোই আছে, এসে যাবে এখুনি।'

দুজনের ভালোবাসা যত গভীরই হোক সুভাষ কিন্তু এখনও যতটা পারে অনাদিকে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করে। কেন না সে এখনও তার মনের নাগাল পায়নি। সে বুঝতে পারে না সত্যিই তিনি তাদের মেলামেশাকে ভালো চোখে দেখেন কি না। তবে তার মনে হয় ঝোঁকটা 'না'-এর দিকে। এর সম্ভাব্য দুটো কারণ সে বড় করে দেখছে। প্রথমত সে মিনিবাস ড্রাইভার, কৌলিন্যে খাটো। দ্বিতীয় কারণ এবং মনে হয় মুখ্য কারণ, তেলেভাজা বিক্রি করে রোজগার যাই হোক না কেন তবুও তো হা-মুখ সংসারে সামাল দিয়ে চলেছে সংহিতা—এমন রোজগেরে মেয়েকে বাপ হাতছাড়া করবে বিশ্বাস হয় না। তবে তার ভরসা, 'বিবি রাজী তো কেয়া করেগা কাজী!'

অন্যদিনের তুলনায় সুভাষ আজ ইস্তিরি করা জামাকাপড় পরে সদ্য গাল কামিয়ে এসেছে। সংহিতার চোখে কল্পনার রাজপুত্র। খদ্দের সামলে অন্যের কান এড়িয়ে চুপিসাড়ে বলে, 'তোমাকে আজ যা দেখাচ্ছে না।'

সুভাষ উপভোগ করে। তরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, 'তাই নাকি? রঞ্জিত মল্লিক না প্রসেনজিৎ?

উত্তর ঠোঁটের ডগায় এলেও প্রকাশের সময় পায় না। দুজনের মুখই পাণ্ডুর। নজর কারো এড়ায়নি। অনাদি মেলায় এসেছে। তারও নজরে পড়েছে সুভাষের অস্তিত্ব। সুভাষ, 'একটু মেলা ঘুরে আসছি' বলে ভিড়ে মিশে যায়।

অনাদি এসে বসে। খানিকক্ষণ এটাসেটা নাড়াচাড়া করে। অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা বলে। সংহিতা টুকটাক উত্তর দিয়ে খদ্দেরের দিকে মন দেয়।

অনাদি উসখুস করে। তার নজর এখন বিক্রির পয়সাভর্তি এনামেলের বাটির দিকে। একসময় বলেই ফেলে, 'বাবলি, দশটা টাকা দে তো।'

সংহিতাকে অনাদি ডাকনামেই ডাকে। বাবার কথা কানে গেলেও না শোনার ভান করে সে নিজের কাজ করে।

গরজ অনাদির। সে আবার বলে, কিরে দিলি না?

টাকার কথায় কঠিন চোখে ঘাড় ঘোরায় সংহিতা। সে জানে এসময় অনাদির টাকার কোন প্রয়োজন। ঐ টাকার পুরোটাই গলায় ঢালবে। মনে মনে বিরক্ত হলেও চেষ্টাকৃত নরম গলায় বলে, 'এখন হবে না। বাড়ি গিয়ে দেব।'

অনাদি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবেই সংহিতার বদান্যতার উপর নির্ভরশীল। এবং তা জানে বলেই গলা চড়াতে পারে না। ইপ্সিত বস্তু না পেয়ে শিশু যেমন মায়ের উপর

অভিমান করে অনুযোগ করে, অনাদিও সেই সুরে বলে, 'হ্যাঁ, আমার এখন লাগবে, উনি বাড়ি গিয়ে দেবেন। দে না বাবলি, দশটা টাকা তো মাত্র।'

অনাদির শিশুসুলভ আকুতিও সংহিতাকে টলাতে পারে না। সে বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'ঘ্যান ঘ্যান করো না তো, ভাল্লাগে না। টাকা পেলে এখুনি তো মাল খেতে ছুটবে। মাতাল হয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকবে। তোমার জন্য লোকের কাছে তো আমার মাথা কাটা যায়।'

সময় বয়ে যায়। টাকা না পেয়ে এমনিতেই সে বিরক্ত হচ্ছিল। তবুও সে নিজেকে সংযত রাখছিল মেয়ের কৃপাপ্রার্থী বলে। কিন্তু এখন মালের খোটা দেওয়ায় পলকে বাপের ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ঝগড়ায় মেতে ওঠে। সেও তেজি গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'থাক থাক, আর সতীপনা দেখাতে হবে না। হুঁ, মাথা কাটা যায়। আর নিজে যে দিনরাত কেষ্টলীলা করে বেড়াস তার বেলা?'

অনাদি যদি অবাধ্য মেয়ের গালে একটা চড় মারত তাও বোধকরি সংহিতাকে মানসিকভাবে এতটা আহত করতো না। কিন্তু একমেলা লোকের মধ্যে বাপ হয়ে অশালীন মন্তব্য তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। চোখ ফেটে জল আসে। খানিকটা থম মেরে থাকার পর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গিয়ে মেলার বাইরে নিরিবিলিতে ঘাসের জঙ্গলে বসে। লোকচক্ষুর আড়ালে প্রাণ খুলে কাঁদে। অনেকক্ষণ কাঁদার পর যখন বুকটা একটু হালকা হয়, তখন ভাবে এখন সে কি করবে? ঘরে ফিরতে মন সায় দেয় না। প্রথমে আত্মহত্যার কথা মনে এলেও সুভাষের মুখটা বারবার মনে পড়ায় সে চিন্তাও বেশিক্ষণ ঠাঁই পায় না। এমতাবস্থায় বেঁচে থাকাটাকেই সে শ্রেয় মনে করে। তার পক্ষে কঠিন হলেও সে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, আত্মহত্যা নয় সে সুভাষের সঙ্গেই চলে যাবে। আগে কয়েকবার সুভাষ বলেছে তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। কিন্তু তখন সংহিতা মত দেয়নি। কিন্তু আজকের ঘটনায় অনাদির প্রতি সংহিতার টান শিথিল হয়ে আসে। তাছাড়া বাপের সংসারে কোন মেয়েইবা চিরকাল থাকে। একদিন না একদিন স্বামীর ঘর করতে তাকে শ্বশুর বাড়ি যেতেই হয়। সেও যাবে এতে অন্যায় কিছু নেই। আর সে না থাকলে অনাদি ঠিকই কোনো না কোনো কাজ জুটিয়ে নেবে। না পেলে, হাতের পাঁচ তেলেভাজার ব্যবসা তো রইলই। বাপ-ভাই দুজনের ঠিক চলে যাবে।

এতক্ষণে সংহিতা যেন একটা দিশা পায়। নতুন করে বুকে সাহস ফিরে আসে। সে সুভাষকে খুঁজতে মেলায় ঢোকে এবং একটু পরে পেয়েও যায়।

মুখ দেখেই সুভাষ আন্দাজ করে কিছু একটা ঘটেছে। পীড়াপীড়িতে সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব কথাই খুলে বলার পর বলে, 'আমি আর এখানে থাকব না। তোমার কাছে নিয়ে চল।'

সুভাষ চমকায় না। সে তো মনে মনে তৈরি হয়েই আছে। এতদিন শুধু সংহিতার হ্যাঁ বলার অপেক্ষায় ছিল। তার মাথার ওপরে বিধবা মা ছাড়া এমন কেউ নেই যে

বাগড়া দেবে। মা সবই জানেন। তিনিই বরং মাঝে মাঝে বায়না করেন, 'কইরে সুভাষ, বউমাকে আনবি কবে?'

সুভাষ বলে, 'এখনই যাবে?'

—না, বাড়ি থেকে আমার জামা-কাপড়গুলি আনতে হবে। তুমি মোড়ে অপেক্ষা করো, আমি বাবা আর ভাইকে রাতের খাবার খাইয়ে চলে আসব।

রাত সাড়ে দশটা। বর্ষার রাত বলে নিঝুম। বাইরে একটানা ঝিঁঝির ডাক। মাঝে মধ্যে ব্যাঙেরও। যদিও পূর্ণিমার রাত, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় পূর্ণ চাঁদ লোকচক্ষুর আড়ালে। বরং বৃষ্টিস্নাত গাছপালার নিচে জমাট বাধা অন্ধকার। বড় রাস্তার ধারে দোকানপাট থাকায় জমজমাট থাকলেও যেহেতু অনাদির বাড়ি নাবালে, একেবারে চাষের জমির কাছাকাছি হওয়ায় নির্জনতা বেশি। খুব দরকার না হলে এত রাতে কার বাড়িতে কি হচ্ছে সে খবর কেউ রাখে না।

অন্যদিনের তুলনায় আজ সকাল সকাল অনাদি আর ভোলাকে খাইয়ে দিয়েছে সংহিতা। দুজনে এক তক্তপোষে ঘুমায়। সংহিতা কিছু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল, গলা দিয়ে নামেনি। পাতে জল ঢেলে রেখে দিয়েছে। একটি ব্যাগে নিজের জামাকাপড় নিয়ে হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে মায়ের ফটোর সামনে এসে দাঁড়ায়। হাসিমাখা মুখটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে সংহিতা বলে, 'মা, তুমি তো স্বর্গ থেকে সবই দেখতে পাচ্ছ। আমাকে ক্ষমা করো।' ভোলার দিকে চোখ ফেরায়। নিষ্পাপ মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। সকালে উঠে আর দিদিকে দেখতে পাবে না বেচারা। দিদি তখন পতিগৃহে। ভাবতে গিয়ে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। ভাইবোনে স্কুল থেকে ফেরার পথে এক বাড়িতে বর-কনে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কনে তখন পতিগৃহে যাত্রা করছে। দিদির তন্ময়তা দেখে ভোলা বলেছিল, 'দিদি, আমিও তোর জন্য এরকম একটা বর এনে দেব।'

সংহিতা চোখ মটকে বলেছিল, 'চল, আর ফচকেমি করতে হবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমন্ত অনাদির মুখে চোখ পড়তেই সংহিতার চোখ মুখ বদলে যায়। শরীরে কেমন একটা অনুভূতি এসে বাসা বাঁধে। সেটা ঘৃণা, না রাগ, না অন্য কিছু সে বুঝতে পারে না। সে চোখ ফিরিয়ে সন্তর্পণে দরজার দিকে এগোয়। কিন্তু যত গোপনীয়তাই অবলম্বন করুক স্খলিত হাতে আগল খুলতে গিয়ে উত্তেজনায় শব্দ করে ফেলে। অনাদি জেগে ওঠে।

অপ্রস্তুত সংহিতা অনাদির সামনে। প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও হাতে জামা-কাপড়ের ব্যাগ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে অনাদি জিগ্যেস করে, 'এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস?'

রাজ্যের আড়ষ্টতা সংহিতার গলা চেপে ধরে। সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।

আবারও একই প্রশ্ন করে অনাদি।

মেঝের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে সংহিতা বলে, 'আমি চলে যাচ্ছি'।

—কোথায়?

একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করে সংহিতা বলে, 'সুভাষের সঙ্গে'।

অনাদি আর কিছু জিগ্যেস করে না। বিছানায় উঠে বসে মেয়ের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ক্রমশ তার চোখে এক শূন্যতা এসে বাসা বাঁধে।

সময় বয়ে যায়। কারো মুখে কথা নেই। এইরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে সংহিতা কল্পনাও করতে পারেনি। সে যতটা মনের জোর নিয়ে বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল, এখন কেন যেন সেই জোর ভেতর থেকে আর পাচ্ছে না। সে ভেবেছিল অনাদি নিশ্চয়ই তাকে যেতে বাধা দেবে এবং সে কিছুতেই শুনবে না। জোর করে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু অনাদির নিস্পৃহ নীরবতাই যে সবকিছু ওলট পালট করে দিচ্ছে। ওদিকে তার আশায় সুভাষ নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছে। যে তির একবার ছুঁড়ে দিয়েছে তা আর ফেরত আনা যাবে না। এখন সে কি করে? ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকা সংহিতা অবশেষে পা বাড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'আমি চললাম।'

অনাদি ওঠে না, বাধাও দেয় না। থেমে থেমে বলে, 'তোর মাও আমাকে ছেড়ে গেছে, তুইও চলে যাবি। বাবলি, আমি তবে কি নিয়ে থাকবো?'

সংসারে প্রথম সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা-মার স্নেহ পুরোটাই বর্ষিত হতো সংহিতার উপর। সময় অনাদিকে কঠিন পরিস্থিতির সামনে এনে ফেললেও এখনও ফল্গুধারার মতো অপত্য স্নেহ তার কোষে কোষে বয়ে চলেছে। তারই প্রতিফলন ঘটে তার কথায়। ফলে অনাদির কথাগুলি সংহিতার কানে করুণ আর্তনাদের মতো শোনায়। সে বিচলিত বোধ করে। সারাদিন ধরে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য মনে মনে যত মহড়াই নিক, এই কথাগুলি তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দেয়। তার মন যেন বাবার কাছ থেকে এই কথাগুলি শোনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল। সংহিতা স্থির থাকতে পারে না। শৈশবে তিরস্কৃত শিশু যেমন তিরস্কারক বাবা বা মার বুকেই মুখ গুঁজে অভিমানে কেঁদে ওঠে, সংহিতাও তেমনি 'বাবা' বলে অনাদির কোলে মুখ গুঁজে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে।

দয়িতের আশ্বাস সাময়িক যত ভরসাই যোগাক, চিরন্তন পিতৃস্নেহের কাছে সে হার মানে। নিগড় ছেঁড়ার চেষ্টা করেও সংহিতা সেই নিগড়েই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়।